প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

নবেন্দু সেন

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১এ এবং ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রক : শ্রীদিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতৃদেব

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ। এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রীডার ড. শিশিরকুমার দাশ এবং পরীক্ষক ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. নীহাররঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী।

ড. শিশিরকুমার দাশের নিকট আমি যে মূল্যবান নির্দেশাদি পেয়েছি তা অপরিসীম। গবেষণার পরিকল্পনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তাঁর সতর্ক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আমাকে এই কঠিন কর্মে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ড. দাশ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের একটি মূল্যবান মুখবন্ধও লিখে দিয়েছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের নিকট থেকেও পেয়েছি অকৃপণ সাহায্য। বহু নূতন বিষয়ের প্রতি তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং একাধিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি ব্যবহার করতে দিয়ে গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করেছেন। এ বিষয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, আমার মধ্যম অগ্রজ ড. নীলরতন সেনের নিকট পেয়েছি অকুণ্ঠ প্রেরণা। বস্তুত এঁদের সম্মিলিত অতি মূল্যবান সাহায্য ও প্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হত না। রীতি অনুযায়ী এঁদের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের সম্পর্ক নয়; আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। পাণ্ডুলিপি রচনাকালে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি শ্রীমতী দীপালী সেন, অধ্যাপিকা তপতী চক্রবর্তী ও ড. মিহিরকুমার দাশের নিকট। নির্দেশিকা তৈরীর কাজে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিণী করবী সেন, ভাইঝি শিপ্রা ও শর্মিষ্ঠা এবং ভাইপো নীলাঞ্জন।

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ডের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রকাশনী সংস্থা হিসাবে 'জিজ্ঞাসা'র স্বতন্ত্র সম্মানের কথা নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বর্তমান বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ের চরম দুর্দিনেও শ্রীশবাবু পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে এ ধরনের গবেষণামূলক বই

যে প্রকাশ করছেন নিঃসন্দেহে তার মূল্য অপরিসীম।) এ প্রসঙ্গে 'জিজ্ঞাসা'র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার নিয়োগীর সাহায্যের কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি ; ভাষাগত বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুদ্রণ-কার্যের পারিপাট্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেল ; গ্রন্থশেষে তাই একটি শুদ্ধিপত্র দিতে হল।

নবেন্দু সেন

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		...	[১১]
ভূমিকা		...	[১৫]
প্রথম অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও ব্যক্তিত্ব	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : গ্রন্থপরিচিতি ও সাহিত্য রচনা	...	৪৫
তৃতীয় অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা	...	৬৮
চতুর্থ অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : নীতিবিষয়ক রচনা	...	৮২
পঞ্চম অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : ঐতিহাসিক রচনা	...	৯৮
ষষ্ঠ অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : ভাষা ও অলঙ্কার	...	১২০
সপ্তম অধ্যায়।	অক্ষয়কুমার : পরিভাষা	...	১৬৭
অষ্টম অধ্যায়।	দেবেন্দ্রনাথ : রচনাপরিচিতি ও ধর্মসাহিত্য	...	১৯২
নবম অধ্যায়।	দেবেন্দ্রনাথ : পত্রাবলী	...	২০৩
দশম অধ্যায়।	দেবেন্দ্রনাথ : আত্মজীবনী	...	২১২
একাদশ অধ্যায়।	দেবেন্দ্রনাথ : ভাষা	...	২৪১
দ্বাদশ অধ্যায়।	দেবেন্দ্রনাথ : অলঙ্কার	...	২৮৪
উপসংহার		...	২৯৯
পরিশিষ্ট		...	৩২৩
নির্ঘণ্ট		...	৩২৮
গ্রন্থপঞ্জী		...	৩৪৩

মুখবন্ধ

গদ্যের সৃষ্টি ও তার সম্ভাবনার আবিষ্কার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের স্মরণীয়তম ঘটনা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। বাংলাসাহিত্যের প্রত্যুষ থেকে সাহিত্যের এই মাধ্যমটি ছিল পরিত্যক্ত, অবহেলিত, কবিতার জাদুশক্তির পাশে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য। কবিতার বহুবিস্তৃত সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যে এই পদাতিকের প্রবেশাধিকার অর্জন করতে হয়েছিল বহু প্রতীক্ষার পর কঠিন পরিশ্রমে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজ-বণিক এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকদের প্রয়োজনে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তার প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত আবির্ভাব। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষে, মাত্র একশ বছরের ব্যবধানে তাকে দেখা গেল দৃঢ়, দীপ্ত, প্রাণোচ্ছল। বিচিত্র ভাবের বাহন, বহু ঐশ্বর্যে দ্যুতিমান। এতদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে তার অন্তর্নিহিত শক্তি, যা প্রাত্যহিকের প্রয়োজন মেটাতে পারে নিজেকে বহু বিচিত্ররূপে আবির্ভূত করে ; আবিষ্কৃত হয়েছে তার ধ্বনিস্পন্দন যা কবিতার ধ্বনিস্পন্দন থেকে স্বতন্ত্র ; আবিষ্কৃত হয়েছে তারও এক জাদুশক্তি যা কবিতা থেকে ভিন্ন, কিন্তু সেই জাদুশক্তি আমাদের পৌঁছে দিতে পারে ভাবের ও আবেগের মায়ালোকে যেখান থেকে কবিতার সাম্রাজ্যের সূচনা। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ক্ষেত্র পেরিয়ে গল্পগুচ্ছ কিংবা ছিন্নপত্রের গদ্য এ যেন জন্মান্তরের ব্যাপার।. ধূলিমলিনা সিনডেরেলা সহসা হয়েছে মোহিনী, তার দারিদ্র্য ঘন অন্ধকার থেকে উপস্থিত হয়েছে আলোকোজ্জ্বল নৃত্যসভায়।

বাংলাগদ্যের এই অভাবনীয় সমৃদ্ধি বিস্ময়কর, সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় অতুলনীয়, ক্ষিপ্রগতি, কিন্তু আকস্মিক নয়। এর পেছনে রয়েছে বহু মানুষের প্রচেষ্টা ও কঠিন সাধনা। বাংলাগদ্যের সূচনায় যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সে সমস্যাগুলি কঠিন, বিচিত্র এবং অসংখ্য। এক পদ্যনির্ভর সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব স্বভাবতই সহজে হতে পারে নি। সমস্যা ছিল শব্দের, শব্দগঠনের, বাক্যপরম্পরার মালা গাঁথা, অনুচ্ছেদ তৈরীর, সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট শিষ্ট গদ্যরীতি গড়ে তোলার। আদি গদ্যরচয়িতাদের সামনে ছিল না বিশেষ কোন আদর্শ। সংস্কৃত, ইংরেজি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ফারসির আদর্শে তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন বাংলাগদ্যকে। তার ফলে বহুক্ষেত্রেই এসেছিল অনাবশ্যক ভার, আড়ষ্টতা এবং বিদেশী রীতিতে বাক্যগঠনের অনিবার্য ফল : মুখের ভাষার সঙ্গে ব্যবধান। তাঁদের মনেও

হয়নি যে ভাষায় তাঁরা কথা বলেন সেই ভাষাই হতে পারত তাঁদের আদর্শ। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও বিদেশীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রাথমিক উদ্যম স্মরণীয় হয়েও তাই পরবর্তীকালের কাছে হল অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় পর্বে বাংলাগদ্য লালিত হল মূলত সংবাদপত্রে। বিচিত্র বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গে তার ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন গদ্য হল মসৃণ ও অবন্ধুর, অন্যদিকে আবিষ্কৃত হল তার বহুভাব প্রকাশের সামর্থ্য এবং বহুভার বহনের ক্ষমতা। সেই সঙ্গে রামমোহন বাংলাগদ্যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে এবং তাঁর ধর্মান্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের প্রধান বাহন করে বাংলাগদ্যকে সম্মানিত করলেন। এই পর্বেই এই আড়ষ্ট, কুণ্ঠিত গদ্য ভরে উঠল নানা শব্দসম্ভারে, নানা বিচিত্র বাক্যগঠনের সম্ভাবনা হল উন্মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে পয়ারের চোদ্দ দলের মধ্যে বাংলাবাক্যের দৈর্ঘ্য ছিল সীমিত। বাংলাবাক্য গদ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট দলসংখ্যার পরিধিকে অতিক্রম করে যেমন দীর্ঘদেহী হতে পারল তেমনই বহু 'ক্লজ'-এ গাঁথা বাক্যের গঠন—যা তাকে দিল বৈচিত্র্য ও এক বিশেষ গঠন-কলার সম্ভাবনা—উন্মুক্ত করল নানা সম্ভাবনা। বাংলা-গদ্যের রূপের গঠনের ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয় তেমনই তাৎপর্যময়।

গঠনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল বিচিত্রশ্রেণীর গদ্যের সম্ভাবনা। বিষয় অনুসারে, প্রসঙ্গ অনুসারে, রীতি বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে এই বিচিত্র শ্রেণীর স্বকীয়তা ফুটে উঠছিল। ধর্মীয় গদ্য, বৈজ্ঞানিক গদ্য, ঐতিহাসিক গদ্য, এবং সাহিত্যিক গদ্য। বলাই বাহুল্য, সাহিত্যিক গদ্য যার শুরু সাধারণত আমরা ধরে থাকি বিদ্যাসাগর থেকে এবং বঙ্কিমের হাতে যার বিপুল সিদ্ধি তার শুরু হয়েছে ঐ প্রথম পর্বের দ্বিধাজড়িত, রীতি-সন্ধানী লেখকদের মধ্যেই। গদ্যে যেদিন সম্ভব হল কাহিনীর সৃষ্টি, চরিত্রের সৃষ্টি অর্থাৎ গদ্য যেদিন কবিতার মতই কল্পনার জগতের প্রকাশ-মাধ্যম হয়ে উঠল সেদিন থেকে গদ্য হল কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী, গদ্য আবিষ্কার করল তার নিজস্ব সাম্রাজ্য। এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই, কবিতা গদ্যেও লেখা যেতে পারে, বঙ্কিমের এই মন্তব্য, উনবিংশশতাব্দী বাংলা গদ্যরচয়িতাদের সবচেয়ে স্পর্ধিত উক্তি।

শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেন তাঁর গ্রন্থে বাংলাগদ্যের বিকাশের ইতিহাসের একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের প্রধান

দুটি চরিত্র : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্মবিশ্বাসে, সমাজ-চিন্তায় এবং সাহিত্যিক রুচিতে বিপরীতধর্মী এই দুই কৃতীপুরুষ ঐতিহাসিক কারণেই একত্রিত হয়েছিলেন মূলত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে আশ্রয় করে। এঁরা যখন বাংলাগদ্য রচনা শুরু করেছেন, তখন বাংলাগদ্য তার প্রাথমিক জড়তা অতিক্রম করেছে, কিন্তু সাহিত্যিক সম্মান অর্জন করে নি। প্রধানত এঁদের দুজনের এবং এঁদের উভয়ের বন্ধু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলায় সাহিত্যিক গদ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অক্ষয়কুমারের রচনার বৈচিত্র্য ছিল কিন্তু তিনি প্রধানত বাংলায় বৈজ্ঞানিক রচনার জন্যে খ্যাত এবং বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী গদ্যের স্রষ্টা। বিজ্ঞানরচনার গদ্যের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর আগে, কিন্তু তিনিই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানকে আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি চেয়েছিলেন এক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টি করতে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর মানবিক ধর্মের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী যে পরিমাণ আকর্ষণ বোধ করেছিল, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি সে উৎসাহ দেখায় নি, ভাবেনি যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমাদের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদান হতে পারে। যে দু-একজন বাঙালী তার ব্যতিক্রম ছিলেন অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল বাংলা বৈজ্ঞানিক গদ্য তথা বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন রচনা।

অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথকে বলতে পারি ধর্মীয় গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। ধর্মের ভাষা নিয়ে তাত্ত্বিকেরা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাত্যহিক ভাষার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছেন—এই স্বাতন্ত্র্য প্রতীক ব্যবহারে, শব্দের অর্থের নতুন তাৎপর্য সংযোজনে। ধর্মীয় ভাষা সাহিত্যিক ভাষারই মত—এই অর্থে যে তা মূলত ভাবের ভাষা, অনুভূতির ভাষা—তার বাক্যগুলি তর্কশাস্ত্রের 'সত্য বা মিথ্যা'-র মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। রামমোহন ধর্মবিষয়ে বাংলায় লিখেছেন, কিন্তু রামমোহনের ভাষা ধর্মতত্ত্ব-আলোচনার ভাষা ; দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ধর্মানুভূতির ভাষা। যে অনুভূতি দেবেন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বরের, সেই অনুভূতিই দেখা দিয়েছে বিদ্যাসাগরে, বঙ্কিমে—শুধু অনুভূতির প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে—দৈবী অনুভূতি থেকে মানবিক অনুভূতি। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই আমাদের সাহিত্যের

স্বল্পালোচিত ও কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত লেখক। শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেন এই দুই লেখকের রচনার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রচনারীতির আলোচনা করেছেন। যে পদ্ধতিতে এই রচনারীতি আলোচিত হয়েছে তা সাধারণ ভাবে গদ্যরীতি-আলোচনার একটি মূল্যবান পদ্ধতি রূপে গৃহীত হবে বলে আশা করি। সাধারণত বহুপ্রচলিত ইউরোপীয় আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে যেভাবে রচনা-রীতি আলোচনা হয়ে থাকে তাকে এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয় নি। কিন্তু তাকেই রচনারীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণের নির্ভুলতম পদ্ধতি রূপে স্বীকার করা হয় নি। সাহিত্যিক রচনা মাত্রেরই মাধ্যম ভাষা, তখন ভাষার আলোচনার মধ্যেই রচনারীতির মূলরহস্য ধরা যেতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাই তাই রীতি-বিচারের অন্যতম পথ। এই আলোচনায় রচনা-রীতির সব রহস্যই ধরা পড়বে এ-রকম কুসংস্কার অবশ্যই মূঢ়তা। কিন্তু লেখকবিশেষের শব্দব্যবহার, শব্দগঠন, বাক্যগঠন, বাক্যসজ্জার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোন কোনরূপ, কোন কোন মানসিক প্রবণতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। উপাদানের মধ্যে পরিণত রূপের বীজ লুকিয়ে আছে। তাই ভাষার আলোচনা রচনারীতির মৌলিক কৌশলগুলির আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু সাহিত্য তার উপাদান-নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও উপাদান-সর্বস্ব নয়, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শুধু ভাষাই সাহিত্য নয়। সেইজন্যই আলঙ্কারিক পদ্ধতি ও ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির সম্মিলিত পথে সম্ভবত সাহিত্যিক রচনারীতি বিশ্লেষণের নতুন পথ পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেন ঐ পথে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছেন। আমার বিশ্বাস এই পদ্ধতিই গদ্যরীতি আলোচনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেনের গ্রন্থের দুটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হলাম। তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। বহু পরিশ্রমে এবং নিষ্ঠায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, বহু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বহু পুরোনো তথ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন এবং বাংলাসাহিত্যের দুই কৃতী লেখককে ভাবালুতাহীন দৃষ্টিতে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমার আশা যে এই গ্রন্থপাঠে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই লাভবান হবেন এবং নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবেন।

শিশিরকুমার দাশ

ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব ও বঙ্কিমের নামের পাশে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের নাম দুটিও চিরস্থায়ী। কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জীবন ও রচনা নিয়ে যেরূপ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে সেরূপ কোন আলোচনা অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হয় নি। যে কয়েকখানি[১] গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হয় অসম্পূর্ণ নতুবা ভ্রমাত্মক মন্তব্যে পূর্ণ। অথচ উভয়ের জীবন ও রচনাবলীর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে নিবিড় সংযোগ তাতে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্যের একটি বিস্তৃত আলোচনা বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একান্ত প্রয়োজন। যদিও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দুজনে দুই বিপরীত কোটির মানুষ তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'কে (১৮৪৩) কেন্দ্র করে উভয়ে দীর্ঘ-কাল ধরে যুক্তভাবে বাংলাসাহিত্যের যে সেবা করে এসেছেন তার ফল-শ্রুতিতে বাংলাগদ্যে বিজ্ঞান রচনা সম্ভব হয়েছে; ধর্মসাহিত্য, পত্রসাহিত্য এবং আত্মজীবনী রচনার একটি ভাব ও ভাষাগত আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখার প্রাঞ্জল পরিচয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর চারুপাঠ (১ ভাগ: ১৮৫৩, ২ ভাগ: ১৮৫৪, ৩ ভাগ: ১৮৫৯) প্রথম বহুজনসমাদৃত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থরচনার আদর্শস্থল। অন্য দিকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশের গ্রন্থগুলি বাংলাসাহিত্যের প্রথম ধর্মসাহিত্য-রচনার নিদর্শন। গদ্যের সঙ্গীতধর্মী প্রথম ভাষানিদর্শন দেবেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি। তাছাড়া পত্রসাহিত্য ও আত্মজীবনী রচনারও প্রথম সফল প্রয়াস হিসাবে দেবেন্দ্র-নাথের পত্রাবলী এবং আত্মজীবনীর মূল্য অপরিসীম।

পূর্বে রচিত গ্রন্থগুলির সকল দোষ-ত্রুটি পরিহার করে উভয়ের রচনার মূলত ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচার বর্তমান প্রসঙ্গে করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখকদ্বয়ের জীবন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ভাষাভিত্তিক মূল্যবিচারের পদ্ধতিটি এখনও প্রায় নূতন। বাংলাসাহিত্যে কোন লেখকের

স্থান নির্ধারণ করতে হলে সাধারণত পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর লেখার মূল্য বিচার করতেই আমরা অভ্যস্ত। (যেমন, রচনার ভাষা বিশ্লেষণ না করেই ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনেক সময়েই বলা হয় মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র (১৮০২) ভাষাটা বড় বেশি সংস্কৃতঘেঁষা বা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য'-এর (১৮০১) ভাষাটা আরবি ফারসির মোজায়েক)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তথ্যসমর্থিত কোন সিদ্ধান্তে এভাবে পৌঁছনো যায় না। ভাষার প্রত্যক্ষ উপাদানগুলির সাহায্যে যখন রচনার রীতিগত স্বভাব-নির্ণয় সম্ভব তখন অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন যুক্তি নেই। সে ক্ষেত্রে বরং রচনার শব্দসম্পদ, বাক্যবিন্যাসপদ্ধতি, যতিচিহ্ন, অনুচ্ছেদ-রচনা, ভাষণকলা, অলঙ্করণ প্রভৃতি ভাষার গঠনমূলক প্রত্যক্ষ উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করে লেখকের রচনারীতির স্বভাব নির্ধারণই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান আলোচনায় ভাষাবিশ্লেষণে syntax-এর বিচারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনস্থলে রূপতত্ত্বের (Morphology) বিশ্লেষণও করা হয়েছে।[২] লেখকদ্বয়ের ভাষা ব্যবহারের ব্যক্তিগত প্রবণতার স্বরূপ এবং রচনায় ব্যাকরণগত বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তার পরিচয় দেবার জন্য প্রচলিত ধারণা ও বর্ণনামূলক মন্তব্য পরিহার করে পরিসংখ্যান-মূলক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। অনিবার্যভাবে সেই জন্যে কিছু পরিসংখ্যানমূলক চিত্র ও রেখাচিত্রের ব্যবহার করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য এখন পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচার-পদ্ধতিতে বাংলাভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। দীনেশচন্দ্র সেনের *Bengali Prose Style* (*1921*) গ্রন্থে সামান্য বাংলা রচনার উদাহরণ আছে, কিন্তু গ্রন্থটি ইংরাজি ভাষায় রচিত। তাছাড়া এ গ্রন্থেও ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচার-পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। যে পদ্ধতিতে রচিত তা বিশ্লেষণমূলক নয়, বর্ণনামূলক। তাছাড়া এত সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে এর থেকে রীতিবোধ সম্পর্কে কোন সাধারণ ধারণাও জন্মে না। শিবরতন মিত্রের *Types of Bengali Prose* (*1922*) গ্রন্থেও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই; গদ্যরীতি সম্পর্কে এখানেও স্পষ্ট আলোচনা নেই। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদকর্তাদের লিখিত কিছু গদ্যের উদাহরণ মাত্র সঙ্কলিত হয়েছে। সেদিক থেকে সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪) বইটিতে বরং ভাষা-বিশ্লেষণমূলক একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও এ গ্রন্থটিও বাংলা গদ্যরীতির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস নয় এবং ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পদ্ধতিতে রচিত একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ নয় তথাপি বাংলাভাষায় রচিত এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে এর যে ঐতিহাসিক মূল্য তা অবশ্যস্বীকার্য। অবশ্য, এ সম্পর্কে বিস্তৃততর পূর্ণতর গ্রন্থ হিসাবে শিশির-কুমার দাশের *Early Bengali Prose ; Carey to Vidyasagar (1966)* গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্যের উদ্ভব থেকে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর পর্যন্ত ধারাবাহিক রচনারীতির এক বিস্তৃত পরিচয় ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পদ্ধতিতে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গ্রন্থপরিকল্পনার বহির্ভূত বিষয় হওয়ায় অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতির বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে করা হয় নি। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী উভয়ের জীবন ও ব্যক্তিত্ব এবং যে যুগপরিবেশে উভয়ের সাহিত্যজীবন গড়ে উঠেছে তার বিস্তৃত পরিচয়সহ দুজনের গদ্যরচনার ভাষাতাত্ত্বিক রীতিবোধ সম্পর্কে স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তাই অবশ্যই রয়ে গেছে।

অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় অন্য যে সকল গ্রন্থ আছে সেগুলির মধ্যে জীবনীগ্রন্থই প্রধান। অল্প কয়েকটি সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা-মূলক এবং গবেষণামূলক গ্রন্থও আছে। জীবনীগ্রন্থ হিসাবে এদিক থেকে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮৫-৮৬) এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' (১৯১৬) গ্রন্থ দুখানির কথা স্বভাবতই মনে আসে। বিদ্যানিধির গ্রন্থখানি অদ্যাপি অক্ষয়-জীবনী রচনা রূপে একমাত্র প্রামাণিক পুস্তক বলা যায়, যদিও অক্ষয়কুমারের জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে যে যুগপরিবেশ কাজ করেছিল তার কোন তথ্য-সমর্থিত পরিচয় গ্রন্থটিতে নেই। অক্ষয়-রচনাবলীর পরিচিতিও অত্যন্ত অল্প। অন্যদিকে অজিতকুমারের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হলেও তাতে মহর্ষির ধর্মজীবনের কথাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে; কিন্তু মহর্ষির সাহিত্যসাধনার নিরপেক্ষ কোন আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পায় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের যে পটভূমিকায় অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্র-নাথের জীবন ও রচনার বিকাশ তার তথ্যনির্ভর বিবরণ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩) এবং 'আত্মচরিত'

('সিগনেট সংস্করণ : ১৯৫২) গ্রন্থ দুটিতে এবং রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' (১৮৭৪) পুস্তিকাটিতে অনেকাংশে পাওয়া যায়। তবে উভয়ের জীবন ও রচনার একত্র মূল্যবিচার এ গ্রন্থগুলিতেও করা হয় নি। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও রচনার মূল্যবিচারের একটি প্রয়াস কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছেন। অক্ষয়কুমারের চারুপাঠের (৩ ভাগ : ৩০ সংস্করণ ; ১৯১৯) ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের জীবন সম্পর্কেও যেমন তথ্যবহ মন্তব্য করেছেন তেমনি তাঁর সাহিত্যজীবনেরও নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন। ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত এবং বলা বাহুল্য অক্ষয়-জীবন ও -সাহিত্যের ক্রটির কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও নয়, তবু সত্যেন্দ্রনাথ এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাতেই অক্ষয়কুমারের জীবন ও রচনা সম্পর্কে নূতন তথ্যে নূতন মূল্য বিচার করেছেন। বিশেষত অক্ষয়কুমারের রচনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি অনেক প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছেন।[৩] অক্ষয়কুমারের গদ্যেও যে একটি 'দুর্নিরীক্ষ্য ছন্দ'-বোধ ছিল সে বিষয়েও সত্যেন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন। অন্যদিকে মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজি সংস্করণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পিতার রচনা ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সংরক্ষণশীল ধর্মীয় মানসিকতা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখেছিলেন—

> My father, though an uncompromising enemy of idolatrous worship, was essentially conservative in his instincts . ... It is singular that the one field of religious inspiration which was foreign to him was the Hebrew Scriptures. He was never known to quote the Bible, nor do we find any allusion to Christ or his teachings in his sermons.[৪]

কিন্তু এ সকল মন্তব্য প্রথমত প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মাত্র দ্বিতীয়ত ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পদ্ধতিতেও রচিত নয়।

বর্তমান আলোচনায় অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার পূর্ণ-পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মুখ্যত এই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের রচনার ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পদ্ধতিতে রীতিরেখা নির্ধারণের চেষ্টাও করা হয়েছে। ভূমিকা, উপসংহার ও পরিশিষ্ট ব্যতীত

সমগ্র গ্রন্থটি বারোটি অধ্যায়ে রচিত। প্রথম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উভয়ের জীবন ও ব্যক্তিত্বের যুগ-পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতকের সমাজ-ধর্মশিক্ষা প্রভৃতির বিশদ ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত অক্ষয়-রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর রচনাকে বিষয় অনুযায়ী সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাস এই চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অক্ষয়-রচনার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার যাথার্থ্য বিচারের জন্য মূল রচনাগুলির সঙ্গে তুলনা করে প্রকৃত তথ্যও উদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তথ্যসহ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে অক্ষয়কুমার-রচিত যে সকল পুস্তক তখনকার দিনে ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রূপে খ্যাত ছিল (যেমন, চা. পা. ১, ২, ৩ বা পদার্থবিদ্যা) সেগুলি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের ভাষা এবং তাঁর রচনার আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রধানত শব্দসম্পদ, বাক্যবিন্যাস, যতি-চিহ্ন, অনুচ্ছেদ রচনা, ভাষণকলা (Rhetoric : Figure of Speech) এবং সামগ্রিক আলঙ্কারিক আবেদন এই ছটি দিক থেকে তাঁর রচনার ভাষা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে রচনার ভাষাগত স্বভাব নিরূপণের জন্য বহু ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানমূলক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল্য বিচার করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহার এবং নূতন সৃষ্টি, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নৈপুণ্য সম্পর্কে অক্ষয়-পূর্ব, সমকালীন এবং পরবর্তীকালীন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিস্তৃত পরিচয় বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ও সেগুলির ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্য বিচার করা হয়েছে। মুখ্যত ধর্মসাহিত্য, পত্রসাহিত্য এবং আত্মজীবনী-সাহিত্য এই তিন বিষয়ক রচনায় দেবেন্দ্র-রচনাবলী সম্পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক রচনাগুলির স্থান কোথায় এবং এই সকল রচনায় বিদেশী প্রভাব সম্পর্কেও বিশদ এবং

তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। নবম এবং দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য এবং আত্মজীবনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে বাংলাসাহিত্যে এই সকল রচনার স্থান নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রনাথের উপর তার প্রভাব কতটা তা দেখানো হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে তাঁর ভাষা বিশ্লেষণ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বিচার করে রচনার স্বভাব নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। দেবেন্দ্র-রচনার ভাষা-বিশ্লেষণেও প্রধানত শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্ন, অনুচ্ছেদ ও অলঙ্করণ প্রভৃতি ভাষার উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে রেখাচিত্র ও পরিসংখ্যান-হিসাবের সাহায্যে তাঁর রীতিগত বৈশিষ্ট্য দেখান হয়েছে।

উপসংহার সিদ্ধান্তমূলক। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে উভয়ের স্থান সম্পর্কে বিশিষ্ট মন্তব্যে উপস্থিত হওয়া গেছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের যুগপৎ নির্মাতা ও স্রষ্টার সম্মান প্রাপ্য। নির্মাণের মধ্যে গঠনের যে অমসৃণতা থেকে যায় সৃষ্টির মধ্যে তার সুষ্ঠু পরিণতি ঘটে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের যে গঠনোন্মুখ অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা তা অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্রনাথের রচনায় প্রায় অতিক্রান্ত। সুতরাং উভয়ের রচনায় ভাষা-নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও যেমন লক্ষিত হয় তেমনি সেগুলি কাটিয়ে ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগগত নৈপুণ্যও লক্ষিত হয়। তাই নূতন শব্দসৃষ্টি এবং তার ব্যবহারও যেমন উভয়ের রচনায় লক্ষিত হয় তেমনি পুরাতন শব্দের নূতন ব্যবহারও তাঁদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। উভয়ের ভাষা-বিশ্লেষণ থেকে বোঝাও যায় যে অক্ষয়কুমারের রচনায় ভাষার নির্মাণ-জনিত এবং ভাষা ব্যবহারের অমসৃণতা যত স্পষ্ট দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তা অনেক কম, অনেকস্থলে তা অতিক্রান্ত এবং রচনার মাধুর্যে ভরা শিল্প-শোভনও। অবশ্য অক্ষয়কুমারের রচনায় গঠনোন্মুখ পর্বের অমসৃণতা থাকলেও তা অতিক্রম করার প্রয়াসও লক্ষিত হয়। বলা চলে তাঁর গদ্য প্রথম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানরচনার আদর্শ, যুক্তিগ্রাহ্য ভাষাদর্শ। এই অধ্যায়ে অক্ষয়-গদ্যের অনুবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে দেবেন্দ্রনাথের গদ্য যে বাংলা ধর্ম-সাহিত্যের আদর্শ তাও প্রমাণ করা হয়েছে।

Stylistics বা রীতিবিজ্ঞানের সাহায্যে এই অধ্যায়ে উভয়ের রচনার

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং উভয়ের বেনামী রচনার ভাষা বিশ্লেষণ করে কোন্ রচনা কার লেখা তা নিরূপিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। উপসংহারের এই পরিচ্ছেদে মর্টনের পরিসংখ্যান চিত্রের সাহায্যে বাক্য-দৈর্ঘ্য-পরিমাপের মতবাদ সাহায্যে ছদ্ম নামে রচিত একটি রচনাংশ অক্ষয়-কুমার কর্তৃক লিখিত এরূপ সিদ্ধান্তে আসার প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। উভয়ের রচনার রীতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে দুজনের স্থান নির্ণীত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মমগ্ন ঋষির মন্ত্র-উচ্চারণে বাংলাসাহিত্যে Religious prose-এর স্রষ্টা আর তথ্য ও তত্ত্বপ্রিয় বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক গদ্য-প্রণেতা। একজনের গদ্যরীতিতে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা, অন্যজনের গদ্যরীতিতে অন্তরোদ্ভূত বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এঁরা উভয়েই অমর শিল্পী ও স্রষ্টা।

১ ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত (১৮৭১)

রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৪)

Dutt, R. C., The Literature of Bengal (1877)

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৮৫-৮৬)

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত (৮৮৭)

ঈশানচন্দ্র বসু, ১. ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম উপাসনা-পদ্ধতি (১৮৯৬)

২. শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০২)

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্র পূজা (১৯০৭)

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ (১৯১০)

অজিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৯১১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি (১৯১২)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চরিতকথা (১৯১৩)

Tagore, S. N. & Devi, Indira, *The Autobiography of Maharsi D. N. Tagore* (1914)

ভবসিন্ধু দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত, (১৯১৪)

অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯১৬)

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯১৮)

De, S. K., *Bengali Literature in the 19th Century*, (1919)

Sen, D. C., *Bengali Prose style* (1921)

সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, (১৯৩৪)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া (১৯৪১)

Sen, P. K, *Biography of a New Faith* (1950)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চরিত্রসংগ্রহ (৮ সং) (১৯৫০)

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সং । ১৯৫২)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫৬)

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলাগদ্যের ক্রমবিকাশ, (১৯৬০)

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান (১৯৬০)

ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী

'চারুপাঠ' ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ =	চা. পা. ১, ২, ৩
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ =	ব. সা. প.
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার =	বাহ্যবস্তু
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১, ২, ভাগ =	ভা. উ. স. ১, ২
রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ =	র. র. বি.
রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ =	র. র. শ. সং
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ =	রামতনু
শিশিরকুমার দাশ =	শি. কু. দা.
শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা =	ডেভিড বক্তৃতা

অনুসৃত বানানপদ্ধতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-স্বীকৃত রাজশেখর বসুর চলন্তিকার বানানপদ্ধতিই সাধারণ ভাবে অনুসৃত হয়েছে। তবে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে মূলের বানানই রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন ও ব্যক্তিত্ব

১৫ জুলাই ১৮২০ অক্ষয়কুমার দত্ত নবদ্বীপের সন্নিকটে চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার টাকীর নিকট গন্ধর্বপুর গ্রামে। প্রপিতামহ রাজবল্লভ দত্ত তাঁদের পৈত্রিক বাস তুলে দিয়ে প্রথম চুপীগ্রামে আসেন। অক্ষয়কুমারের পিতা পীতাম্বর দত্ত কলকাতায় খিদিরপুরে আদিগঙ্গার "কুতঘাটের ক্যাশিয়ার ও দারোগা ছিলেন।"[২]

মৃতবৎসা জননী দয়াময়ীর বড় আদরের সন্তান ছিলেন অক্ষয়কুমার। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির বালক অক্ষয়কুমারের সব কিছু জানবার এক অদম্য কৌতূহল এবং লেখাপড়া শিখে বড় হবার এক প্রবল আগ্রহ ছিল। সাধারণত বালকবয়সে যখন সকলে খেলাধূলায় সময় কাটাতে ভালবাসে, তিনি সে সময় পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশী। কথিত আছে, কাঠাকালির অঙ্ক কষতে কষতে তিনি পৃথিবীর আয়তন কত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন বার বার। বিশ্রাম, গুরুজনের নিষেধ কিছুই তাঁকে তাঁর পড়াশুনোর আগ্রহ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। চাণক্যশ্লোক "বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" শৈশব থেকেই তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে।[৩]

১৮২৫-এ প্রথানুযায়ী 'হাতেখড়ি'র পর অক্ষয়কুমারের বিদ্যারম্ভ হয় চুপী-গ্রামের গুরুচরণ সরকারের পাঠশালায় এবং সরকার মশায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষাও তখন থেকেই আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শিখতেন দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের নিকট এবং ফারসী শিখতেন আমিউদ্দীন মুনশীর কাছে। বছর পাঁচেক এই ভাবে গ্রামে পড়াশুনো করার পর তিনি কলকাতায় আসেন ১৮৩০-এ। ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল সেটি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার পর তিরিশটি বৎসর ধরে যে সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙাগড়া চলছিল তার সব তখনও শেষ হয় নি। ধর্মবোধের অস্থিরতা,

শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলন, সংস্কৃতির নূতন জাগরণ, বণিকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পেষণ পুরাতন জীবনবোধে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে তখন। ভেঙে গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেই কর্মমুখর মুহূর্তের ব্যস্ততায় কলকাতা তখন চঞ্চল।[৪] ভারতের রাজধানী তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পীঠস্থান কলকাতাকে কেন্দ্র করে তখন নানা বিষয়ক আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনা ; সারা কলকাতা জুড়ে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার একটি সংঘর্ষ তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বণিকবেশী ইংরেজ রাজারূপে প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, শাসনকার্যে মনোযোগী। রাজকার্য সুষ্ঠু ভাবে চালনার জন্য তাঁরা শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন, দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮০০)। কিন্তু উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষী রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩) কর্তৃপক্ষকে বোঝালেন যে কেবল সংস্কৃত শিক্ষায় জাতির উন্নতি হবে না, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্য দিতে হলে এদেশে ইংরেজী-শিক্ষা, বিজ্ঞান-শিক্ষার একান্ত দরকার। ১৮২৩-এ রাজা আমহার্স্টকে পত্র লিখলেন—

> "........Sangskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy, with other useful Sciences.........."[৫]

ওদিকে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের চেষ্টায় **১৮১৭'র ২০ জানুয়ারী কলকাতায় হিন্দু কলেজ নামে আরো একটি ইংরেজী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'** দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তৎকালীন যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাও দৃষ্ট হত। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—

"তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর

জয়লাভ করে। কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন, 'গোরু খেতে পারিস? গোরু খেতে পারিস?' এইরূপে প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন।"[৬]

এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, ডিরোজিও'র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদে অন্ধভাবে বিশ্বাসী ছিলেন; সাধারণত এঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নববঙ্গের যুবকদল বলে অভিহিত করা হত। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে যোগ দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় মাস চারেকের জন্য ডিরোজিও'র ছাত্র ছিলেন এ কলেজে।[৭] হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry Vivian Derozio) ফরাসী বিপ্লববাদীদের চিন্তায় প্রভাবিত ছিলেন,[৮] প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের বর্জনে এবং ধর্মের সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে তিনি ছাত্রদের নিয়ত উৎসাহ দিতেন। রসিক মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তখন হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ডিরোজিও'র সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে মধুর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

"তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন; এবং নানা বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি একপক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল।"[৯]

১৮২৮ সালের মধ্যেই অর্থাৎ অক্ষয়কুমার কলকাতায় আসবার মাত্র দু'বৎসর পূর্বে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও'র নেতৃত্বে যুবকগণ 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি সভা স্থাপন করলেন। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি তথ্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"The students of the first, second, and third classes had the

> advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service.... On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age.[১০]

নববঙ্গের এই ডিরোজিও'র ছাত্ররা *Athenium* (1828) নামে একটী ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বের করলেন। মাধবচন্দ্র মল্লিক নামক একটি ছাত্র তাতে লিখলেন, "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."[১১] ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডিরোজিও'র এই বলিষ্ঠ মনোভাব রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) পিতা রামকমল সেনের নেতৃত্বে ডিরোজিও-বিরোধী প্রচারকার্য চলতে থাকলো; ফলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় ডিরোজিও কর্মে ইস্তফা দেন। ঐ বৎসরই ডিরোজিও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 'ডিরোজিয়ান' ভাবটি জেগে রইল। রামমোহনও সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সর্বপ্রকার সংস্কার করতে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে চলেছেন ক্রমাগত।

১৮১৫-তে তিনি 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করলেন। ধর্ম সংস্কারই কেবল নয়, সামাজিক কুসংস্কার

বন্ধ করতেও রাজা পশ্চাদ্‌পদ রইলেন না ; দীর্ঘ দিনের ভয়াবহ কুসংস্কার সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় ব্রতী হলেন। ১৮২৯-এ এই ভয়াবহ সংস্কারকে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক তখন বাংলার গভর্ণর জেনারেল। অক্ষয়কুমার কলকাতায় এলেন ঠিক এই সময়। কলকাতার পথে ঘাটে সদ্যরহিত সতীদাহ-প্রথার প্রতিক্রিয়া তখনো চলছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদচন্দ্রিকা'র (১৮২২) পৃষ্ঠায় রামমোহন-বিরোধী মতবাদ প্রকাশের চেষ্টা তখনো পুরো ছিল। সংরক্ষণশীল, সংস্কারবিরোধী গোঁড়া হিন্দু নেতাদের প্ররোচনায় রামমোহন-বিরোধী গান গেয়ে বালক-বালিকারা তখনো পথপরিক্রমা করে বেড়াতো। যেমন—

"সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল ;
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।"[১২]

১৮৩০-এই রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ও 'ব্রাহ্মসমাজে'র (১৮২৮) বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মসভা' স্থাপন করলেন। স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী আলেক্‌জান্‌ডার ডাফ্‌ও এই বৎসর ২৭ মে কলকাতায় এলেন ; এবং রামমোহনের সাহায্যে তিনি কমললোচন বসুর বাড়ীতেই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন (১৩ জুলাই, ১৮৩০)। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে ১৮৩০'র ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সংঘর্ষের দ্বন্দ্ব-চঞ্চল মুহূর্তে বালক অক্ষয়কুমার খিদিরপুরে তাঁর পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্তের বাসায় এসে উঠলেন। কলকাতায় এসে অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন ; জে. ডি. পিয়ার্সনের 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ-বিষয়ক কথোপকথন' (১৮২৪) বইটি তাঁকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আরো আগ্রহী করে তুলেছিল।[১৩] ইংরেজী ও বাংলা দ্বিভাষিক এই বইটি পড়েই তিনি চন্দ্রগ্রহণ, সৌরজগৎ, জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতি বিশ্বকার্যের কারণগুলি বিজ্ঞানসম্মত রূপে প্রথম জানতে পারেন। ইতিপূর্বে এ-বিষয়গুলির পৌরাণিক, লোকপ্রচলিত অল

ব্যাখ্যাগুলিই মাত্র তাঁর জানা ছিল। খিদিরপুরের এই বাসায় তাঁর ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়, জয়কৃষ্ণ সরকার নামক একজন গৃহশিক্ষকের নিকট। অক্ষয়কুমার কিন্তু সরকারমশায়ের পড়ানোতে সন্তুষ্ট হতেন না, তাই পরে নিজের চেষ্টাতেই খিদিরপুরেরই একটি খ্রীষ্টান মিশনারী-পরিচালিত বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হন। এই সময় মিশনারী বিদ্যালয়গুলি খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই অক্ষয়কুমারের অভিভাবকেরাও ভীত হয়ে তাঁকে ঐ স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন, এবং তাঁর ইংরেজী পড়ার জন্য বাড়ীতেই হরমোহন বাবু তাঁর অফিসের কেরাণী হরিহর মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করলেন; তাছাড়া, অবসর সময়ে তিনি নিজেও অক্ষয়কুমারকে নিয়ে বসতেন। কিন্তু হরিহর বাবুর জ্ঞানাভাব এবং হরমোহন বাবুর সময়াভাবে ইংরেজীচর্চা তেমন আর হত না। অবশেষে হরমোহন বাবু, অক্ষয়কুমারের একান্ত আগ্রহে তাঁকে গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'তে ভর্তি করে দেন। অক্ষয়কুমার 'ফিফ্‌থ ক্লাশে' ভর্তি হন। খিদিরপুর থেকে চিৎপুরে সে যুগে প্রত্যহ যাতায়াত করা খুব কষ্টকর ছিল। নিত্য পদব্রজে অতটা পথ অতিক্রম করে পাঠাভ্যাস করাও যেমন অসম্ভব ছিল, তেমনি প্রত্যহ তখনকার রাস্তার প্রায় একমাত্র যান, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করাও সম্ভব ছিল না; অতএব অক্ষয়কুমারকে খিদিরপুরের বাসা ছেড়ে উত্তর কলকাতায় দর্জিপাড়ায় তাঁর পিসতুতো দাদা রামধন বসুর বাসায় এসে থাকতে হল।[১৪] সে-সময় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি ছিলেন জেফ্রয় হার্ডম্যান। তাঁর নিকট ইংরেজী ছাড়াও অক্ষয়কুমার ইলিয়ড, ওডেসী, ইংরেজী সাহিত্যের আরো ভাল ভাল পুস্তক, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১৫] অক্ষয়কুমারের পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন "অক্ষয়কুমারের রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা এই আরম্ভ।"[১৬] ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ছিলেন, ডাব্‌ল প্রমোশন পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছিলেন; তখন তাঁর বয়স প্রায় উনিশ। কিন্তু হঠাৎ পীতাম্বর দত্তের মৃত্যুতে সংসারের সব ভার নিজের নিতে হল, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের পড়া ছাড়তে হল তাঁকে; কিন্তু অক্ষয়কুমারের অদম্য পঠনেচ্ছা তাতে হ্রাস পেল না, বরং নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর বাইরে

স্বাধীন পড়াশুনোর সুযোগ পেলেন এবার; একদিকে 'অর্থাগম' অন্যদিকে জ্ঞানার্জন দুইই চলতে থাকলো। হরমোহন দত্ত অবশ্য এসময় অক্ষয়কুমারকে আইন পড়তে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি পরিবর্তনশীল আইন-বিদ্যা বৈজ্ঞানিক সত্যের মত স্থায়ী নয় বলে সে অনুরোধ রাখেন নি। অবশ্যই আইন বদলায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যও চিরস্থায়ী নয়, নূতন নূতন আবিষ্কারে তাও পরিবর্তিত হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আশৈশব আগ্রহবোধই তাঁকে আইন-বিমুখ করেছিল। পরবর্তী কালেও বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর দিন কেটেছে, একাধিক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন। অবশ্য অক্ষয়কুমারের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থখানি কাব্যের; 'অনঙ্গমোহন' ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য সে সময়টাতে কাব্যচর্চাই হত বেশি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর অভিভাবকত্বে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি একাধিক ব্যক্তি সে সময় 'সংবাদপ্রভাকরে'র (১৮৩০) পৃষ্ঠায় কাব্যানুশীলন করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরও কবিতার বই 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার সারাজীবনে আর কোন কাব্যগ্রন্থ লেখেন নি। তাঁর 'অনঙ্গমোহন'ও এখন দুষ্প্রাপ্য। তবু এই গ্রন্থরচনার মাধ্যমেই অক্ষয়কুমারের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল। প্রথম রচনার মূল্য চিরকালের। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের সারস্বত সাধনার প্রথম নিদর্শন 'অনঙ্গমোহনে'র ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। এই গ্রন্থখানির প্রকাশকালের এক বৎসর পূর্বে (১৮৩৩) বা এক বৎসর পরে (১৮৩৫) চব্বিশ পরগণার আগরপাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামলমণি দেবীর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়।[১৭]

২

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভ অক্ষয়-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'সংবাদপ্রভাকর' (১৮৩০) পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে গুপ্ত-কবি প্রায়ই হরমোহন দত্তের বাসায় যেতেন। এই উপলক্ষেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয় নিবিড় হয়েছিল দর্জিপাড়ার 'বাংলা ভাষানুশীলন সভা'কে কেন্দ্র করে। রামধন বসুর প্রতিবেশী নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে উক্ত সভায় উভয়ের

স্নেহ ও শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বরাহনগরের বাড়ীতে 'নীতিরঞ্জিনী সভা'য় বলিষ্ঠতর হয়েছিল। 'নীতিরঞ্জিনী সভা'য় মূলত নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করা হত, এবং নৈতিক উন্নতিসাধনই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। অক্ষয়কুমারের কয়েকটি নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হয়েছিল। গুপ্ত-কবির 'সংবাদপ্রভাকরে' পরে এই প্রবন্ধগুলির কোন-কোনটি প্রকাশিতও হয়েছিল।[১৮] 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় সে-যুগে বহু বিখ্যাত লেখকের রচনাদিও যেমন প্রকাশিত হত, তেমনি নতুন লেখকের রচনা ছেপেও উৎসাহ দেওয়া হত। অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনার নৈপুণ্য যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত নিত্য অনুপ্রেরণা দিতেন, এবং তাঁরই সনির্বন্ধ অনুরোধে অক্ষয়কুমার প্রথম *Englishman* পত্রিকার কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ করেন। এই ঘটনা সাধারণভাবে তুচ্ছ হলেও অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনার প্রকৃত চর্চা এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়। বাংলা সাহিত্য ও গদ্যরচনা সম্পর্কে তাঁকে গুপ্ত-কবি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, একথা বলা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত এ-সম্পর্কে বলেছেন—

"Iswar Chandra Gupta was then the king of the literary-world in Bengal, and Akhay Kumar became acquainted with him. On one occasion, Iswar Chandra asked Akhay to translate an article which had appeared in an English daily paper. 'But I have never composed anything in Bengali prose', said young Akhay, 'how can I translate this ?' With his usual kindness for talented young men, the veteran Iswar Chandra encouraged him in the task, and admired his performance when it was done. Such was Akhay Kumar's initiation into the Status of a Bengali writer, and henceforth he began to compose articles for the *Probhakar*."[১৯]

অক্ষয়কুমার ইংরেজী গদ্যের বাংলা গদ্যানুবাদ করেছিলেন। অনূদিত সে অংশ আজ সহজলভ্য নয়। তবু সে অনুবাদের যে-সকল প্রশংসামূলক

সমালোচনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে অক্ষয়কুমার ইংরেজী ও বাংলা গদ্যের ভাষাতাত্ত্বিক, ব্যাকরণগত মৌল প্রভেদগুলি অবশ্যই জানতেন। বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্য যে দুটি ভাষারই স্বতন্ত্র তাও জানতেন; নতুবা অনুবাদটিকে অত প্রশংসা করা যেত না, তা বহুলাংশেই অস্বাভাবিক থেকে যেত। ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয় দত্তের পারস্পরিক হৃদ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল; অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও উভয়ের সম্পর্ক অটুট ছিল। গুপ্ত-কবির 'সংবাদপ্রভাকরে'র সংবাদের জন্য বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে অনুরোধ করে পত্রও লিখেছেন—

"প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাবেন।"[২০]—(১২৫৭, চৈত্র)।

উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কটি বড় মধুর ছিল। স্নেহবশত গুপ্তকবি অক্ষয়কুমারকে কখনো কখনো অল্প-স্বল্প পরিহাসও করতেন। অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারে' (১ খণ্ড ১৮৫১, ২ খণ্ড ১৮৫৩) জর্জ কুমের *The Constitution of Man* (1858) গ্রন্থের অনুকরণে 'আমিষ অবিধি' প্রচার করে নিজেও আমিষ আহার বর্জন করলে বুদ্ধিজীবি মহলে বেশ একটা আলোড়ন পড়ে যায়। বর্ধমানের মহারাজাও আমিষ আহার ত্যাগ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য দত্ত মহাশয়কে ডাক্তারী উপদেশ অনুযায়ী আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দেওয়া হল এখানে—

"আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল।

... ...

কোথা তার 'বাহ্যবস্তু' মানব প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায়, বিষম বিকৃতি॥

... ...

কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখেছেন যাহা।
'কুম্' ধোরে একা কেন, কাট তুমি তাহা?"[২১]

১৮৩৯-এ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের যে সাক্ষাৎ হয় তাও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহযোগিতাতেই সম্ভব হয়েছিল। মহর্ষি এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।"[২২]

৩

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ধনী দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তান দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সুখৈশ্বর্যে লালিত হয়েছিলেন। ১৮২৬-১৮৩০ অর্থাৎ নয় থেকে তের বৎসর পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের 'এ্যাঙ্গলো হিন্দু স্কুলে' (১৮২২) পড়াশুনো করেছিলেন।[২৩] ১৮৩১-এ দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ যখন ভর্তি হন তখন ডিরোজিও সবে মাত্র পদত্যাগ করেছেন।[২৪]

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ তিন বৎসরের কিছু অধিক কাল অধ্যয়ন করেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দু কলেজে পড়ছেন অক্ষয়কুমার তখনো পড়াশুনোর একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন সতের-আঠারো, আর অক্ষয়কুমারের বয়স তখন চোদ্দ-পনরো। হিন্দু কলেজের পাঠ দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পারেন নি। দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্রকে বিষয়কর্মে মনোযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'কার-ঠাকুর কোম্পানী' (১৮৩৪) থেকে দ্বারকানাথের অর্থাগম হত প্রচুর। সতেরো বৎসর বয়সে (১৮৩৪) দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়; বয়সের তারুণ্যে এবং সম্পদের প্রাচুর্যে দেবেন্দ্রনাথ এ-সময় বিলাসে বিভোর ছিলেন। পুত্রকে কোন বিষয়কর্মে নিযুক্ত রেখে সেই সর্বনাশা বিলাসিতার হাত থেকে রক্ষা করতে মনস্থ করেন দ্বারকানাথ। ফলে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের (১৮২৯) সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদে দেবেন্দ্রনাথ কাজ করতে থাকেন। ১৮৩৪-৩৮, এই চার বৎসরে দেবেন্দ্রনাথ পড়াশুনোর কাজেও নিজেকে মগ্ন রাখেন। তাঁর রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ এবং একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়।[২৫]

১৮৩৮-এ এই বিলাসবহুল আবহাওয়ার মধ্যেই পুত্রকে বাড়ীর সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে দ্বারকানাথ উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণে যান। কিন্তু সে সময়েই হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্তন এল।—

"আমার চারিদিকে কেবল বিলাসের ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহার পরে সেই আনন্দময়, স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন।"[২৬]

দেবেন্দ্র-জীবনে এই বৈরাগ্যের অনুভূতি তাঁর দিদিমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়। তিনি লিখেছেন—

"দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি 'হরি-বোল' বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন, 'ঐ ঈশ্বর ও পরকাল'। দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।"[২৭]

দিদিমা, অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পূর্বদিন জ্যোৎস্নারাতে শ্মশানের নির্জনতায় দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ জেগেছিল। আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে লিখেছেন—

"ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সংকীর্তন হইতেছিল…। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই।…। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।"[২৮]

এই অভূতপূর্ব আনন্দই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবন ধ'রে খুঁজেছেন। "কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না"।[২৯] এই আনন্দম্-রূপম্-অমৃতম-এর জিজ্ঞাসায় অস্থির হয়ে উপনিষদের জ্ঞানাহরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সংস্কৃত

শিক্ষা করেছেন, 'কল্পতরু' হয়ে বিষয়-আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে বিশ্বকর্তার পরম শক্তি সম্পর্কে প্রতীতি হয়েছে। ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং॥" শ্লোকটির ব্যাখ্যা শুনে তাঁর মনে হল, "আমি চিরদিন যাহা চাহিতেছি, ইহা তাহাই বলে।" উপনিষদে তাঁর অভিপ্রেত 'আনন্দস্বরূপে'র কথা দেখতে পেয়ে—"এই সত্যধর্ম প্রচার" করবার ইচ্ছা হল। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তখন একটি সভা স্থাপন করলেন। সভায় কঠোপনিষদের শ্লোক পাঠ করলেন দেবেন্দ্রনাথ নিজে, সে শ্লোকের 'ব্যাখ্যান'ও দিলেন; সভার নাম রাখা হল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ' এ-সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে 'সায়ংকালে' এই সভার অধিবেশনের সময় ঠিক করা হয়। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে সভার আচার্যপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী'র পরিবর্তে 'তত্ত্ববোধিনী' রাখেন। এই ভাবে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর, 'রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে' **'তত্ত্ববোধিনী সভা'** স্থাপিত হয়।

৪

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রথমে কোন সংশ্রব ছিল না। ৬ অক্টোবর ১৮৩৯-এ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র 'প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব' ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪১-এ মহাসমারোহের সঙ্গে পালিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারও এ-সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। ১৮৪১-এ দেবেন্দ্রনাথ প্রথম রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজে' গিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রামমোহনের সাহচর্যে এসেছিলেন, রাজা স্নেহ করে মহর্ষিকে 'বেরাদর' বলে ডাকতেন। ১৮৩৯-৪২'র মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ যখন উপনিষদের ধর্মচিন্তায় নিবিষ্ট তখন রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর নিজের ধর্মচিন্তার ঐক্য দেখতে পান, এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর (১৮৪২) মে-জুন মাসেই এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়।[৩০] এরপর থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের সময় ভাদ্রমাসের পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজের

গৃহপ্রবেশের দিন, ১১ মাঘ নির্দিষ্ট করা হয়; এবং ব্রাহ্মসমাজের সব কাজ-কর্ম 'তত্ত্ববোধিনী সভা'ই করতো। ১৮৩৯-৪২ তিন বৎসরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যসংখ্যা দশ থেকে বেড়ে একশ' আটত্রিশে দাঁড়ায়, এবং সভার ষষ্ঠ বর্ষে সভ্যসংখ্যা আরো দ্রুত বেড়ে আটশ' পর্যন্ত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখ্য উদ্দেশ্য হল "…সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"[৩১] 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করবার জন্য একটি যন্ত্রালয় ও একখানি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ প্রয়োজন অনুসারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কথা ঘোষণা করে সভ্যদের মধ্যে থেকেই একজন পত্রিকা-সম্পাদক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই পদের জন্য একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং অক্ষয়কুমার সেই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেন। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—

> "অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ সন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।"[৩২]

তত্ত্বসভার পত্রিকার ব্যবস্থা করে যন্ত্রালয়ের ব্যবস্থাও করা হল। রামমোহন রায়ের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল-বাড়ীতে হেদুয়ায় যন্ত্রালয়টি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪৩-এর ১৬ আগষ্ট অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঐ যন্ত্রালয় থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল।[৩৩] পত্রিকা-সম্পাদকের বেতন তখন মাত্র ৩০৲ টাকা। ১৮৪৩—১৮৫৫, একাদিক্রমে বারো বৎসর দক্ষতার সঙ্গে অক্ষয়কুমার এ-পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁর বেতন ৩০৲ থেকে ৪৫৲, ৪৫৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। পত্রিকার কাজকর্ম

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পত্রিকা-অফিসও ছিল। 'অক্ষয়চরিত'কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়াটিক স্যোসাইটি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পেপার কমিটি (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধনির্বাচনী সভা সংস্থাপন করেন। কমিটির পাঁচজনের অধিক সভ্য সংখ্যা ছিলনা; অন্যান্য সভাসমিতির যেরূপ নিয়ম ইহারও সেইরূপ ছিল— একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ, কি অপর কোন ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধনির্বাচনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে।"[৩৪]

মূলত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উদ্দেশ্য হলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান, সমাজ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের রচনাও স্থান পেত। স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্তের এই সকল বিষয়ক বহু রচনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক সামাজিক রচনাও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৮-১৮৫৫ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী'র স্থান স্বতন্ত্র। কেবল গ্রাহক-সংখ্যাই যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, রচনার বিষয়-গৌরবে এবং রস-সম্ভোগেও 'তত্ত্বকোধিনী পত্রিকা'র কৌলীন্য সর্ববাদী-স্বীকৃত। অক্ষয়কুমারের নিঃস্বার্থ প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গৌরব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন,—

"Young Akhoy Kumar, then only a youth of 23, became the editor of the paper which soon became a power in the land. It is scarcely possible in the present day, when journals have multiplied all over the country, to adequately describe how eagerly the moral instructions and earnest teachings of Akhoy Kumar, conveyed in that famous paper, were perused by a large circle of thinking and enlightened

readers. People, all over Bengal, awaited every issue of that paper with eagerness, and the silent and sickly but indefatigable worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal."[৩৫]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই বিপুল সৌভাগ্যের ইতিহাস সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন—

"প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তথাপি গ্রাহক-সংখ্যা সাতশত দাঁড়াইল। বন্ধুবৎসল বিদ্যাসাগর (১৮২০) অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ঠিকঠাক করিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার সে কর্ম গ্রহণ করিলেন না।"[৩৬]

হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের যুবকেরাও **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** (১৮৪৩) রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামগোপাল ঘোষের (১৮১৫) মত স্বদেশীয় পত্র-পত্রিকার প্রতি উন্নাসিক ব্যক্তিও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনাপাঠ করে রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩)-কে বলেছিলেন, "রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ।"[৩৭]

অক্ষয়কুমারের বার বৎসর-ব্যাপী সম্পাদনার গুরু দায়িত্বে গঠিত তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার এই বিপুল গৌরবের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও দিয়েছেন—

"ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"[৩৮]

১৮৪৩—১৮৫৫ এই বার বৎসর সময়ের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের রচিত 'চারুপাঠ' ১ ভাগ (১৮৫৩), ২ ভাগ (১৮৫৪); 'বাষ্পীয় রথারোহী'

(১৮৫৫); 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার[৩৯] ১ম ভাগ' (১৮৫১), ২য় ভাগ (১৮৫৩), 'ডেভিড সভার বক্তৃতা' (১৮৪৫), গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের বহু অংশ রচনাকারে তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম প্রকাশিতও হয়েছিল। অক্ষয়কুমার যখন 'ডেভিড সভার বক্তৃতা'র বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, দেবেন্দ্রনাথ তখন স্কচ্ মিশনারি ডাফের বেদান্ত আক্রমণের প্রতিবাদ করায় ব্যস্ত। অক্ষয়কুমার যখন চারুপাঠের ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতি, ও সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলি লেখায় মগ্ন, দেবেন্দ্রনাথ তখন 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের (১৮৫১—'৫২) বঙ্গানুবাদ সহ মূল উপনিষদের শ্লোকগুলি ব্যাখ্যায় বিভোর।

তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) মুখপত্র যেমন **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** (১৮৪৩) ছিল, তেমনি '**তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা**' (১৮৪০) ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম কার্যকরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে (১৩ জুন) হিন্দু কলেজ-পাঠশালার (১৮৩৯—'৪০) আদর্শে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অধীনে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কলকাতার সিমলা পল্লীর (অধুনা রামদুলাল সরকার স্ট্রীট) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর বৈঠকখানাটি ভাড়া নিয়ে প্রথম পাঠশালার কাজ আরম্ভ হয়। অক্ষরকুমার দত্ত প্রথমাবধিই এই পাঠশালার শিক্ষকতা কাজে ব্রতী হন। অক্ষয়কুমারের রচিত 'ভূগোল' (১৮৪১) এই পাঠশালার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার উদাহরণ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (ভাদ্র সংখ্যা) দেবেন্দ্রনাথ এই পাঠশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> "সধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।" (পৃঃ ৬)।

ধর্মশিক্ষা পাঠশালার পাঠ্যবিষয়ভুক্ত ছিল। এবং প্রতিটি বিষয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। সকাল ৬টা হতে ৯টা পর্যন্ত পাঠশালা বসত। দুপুরে অন্য বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ইংরেজী শিখতে পারতো। ইংরেজী পড়তে দুপুরে অন্য বিদ্যালয়ে যেতে হত, এজন্য ছাত্রদের পরিশ্রম হত খুব। অথচ তখন ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ প্রচলনও ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার

ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকলো এই কারণেই। পাঠশালার কর্তৃপক্ষগণ অবশেষে তাঁদের পাঠশালাতে ইংরেজী পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কলকাতায় প্রথম থেকেই স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেশী। দেবেন্দ্রনাথ ভাবলেন গ্রামাঞ্চলে যদি তাঁদের বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা যায় তবে বিদ্যালয়টি চলতে পারে এবং দেশবাসীরও উপকার হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ভাবনার বাস্তব রূপও দিলেন। বিদ্যালয়টি হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে স্থানান্তরিত করা হল। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অক্ষয়কুমার বংশবাটী যেতে চাইলেন না। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০৲ টাকা বেতনে প্রধানশিক্ষক রূপে বংশবাটিতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল এই উপলক্ষে বংশবাটিতে একটি সভা হয়। এ সভায় অক্ষয়কুমার বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—

"ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন্ ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেক? এবং স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাবসত্ত্বে কোন ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, এবং তাহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫

শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।”[৪০]

১৮৪৫—’৪৬’র Council of Education-এর রিপোর্টে বিদ্যালয়টির উচ্চ প্রশংসা করা হয়। কিন্তু ১৮৪৮-এ কার-ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে একা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ আর্থিক ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। মূলত অর্থের অভাবে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেল।[৪১]

৫

উনবিংশ শতকের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। প্রধানত ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হত তত্ত্ববোধিনী সভায়, আর জনসাধারণকে সে বিষয়ে ব্যাপক ভাবে অবহিত করানোর জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হত ঐ ধর্মবিষয়ক রচনাদি। অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত এই পত্রিকার প্রথম বারোটি বৎসরকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। উনবিংশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনগুলির সঙ্গে এ যুগের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় ছিলেন এই সকল আন্দোলনের প্রথম শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনিই প্রথম ‘বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম’-র (ব্রাহ্মধর্ম) ‘ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮২৮) প্রতিষ্ঠিত করেন, সতীদাহ প্রথা রোধের চেষ্টায় সফল হন (১৮২৯) এবং এ দেশীয় ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন (১৮২২)। উইলিয়ম এ্যাডাম এই বিদ্যালয়টিরই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।[৪২] রামমোহনের এই সকল সৃষ্টিশীল কর্মধারায় নিত্য সহযোগী ছিলেন এ্যাডাম। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামি আর অর্থহীন শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের অভিমান থেকে জাতির মুক্তিকামনা ছিল এঁদের কর্মের উদ্দেশ্য। ১৮১৭-তে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ১৮২৮-এ কলকাতার শিক্ষিত ‘নব্য যুবক’দের আদর্শপুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন। দেশের সর্বপ্রকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম ও সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ালো ; প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে নূতনদের জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে উপস্থিত হল অনিবার্য বিরোধ। লর্ড বেন্টিঙ্ক তখন বাংলাদেশের বড়লাট হয়ে এসেছেন

(১৮২৮)। হিন্দু কলেজ, রামমোহনের ইংরেজী স্কুল ও সমকালীন অন্যান্য ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করে কলকাতা জুড়ে চলছে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা। বেন্টিঙ্কের ঠগীদমন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, এই উত্তেজনার অন্যতম ইন্ধন জুগিয়েছে। খ্রীষ্টীয় ধর্মের গোঁড়ামি আর রামমোহনের যুক্তিবাদ তখন বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। *Appeals to Christian Public, Precept of Jesus, Brahminical Magazine* প্রভৃতি তখন মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে লাগলো, এবং এই সূত্রে এ্যাডামের সঙ্গে রামমোহনের সখ্যতা আরো দৃঢ় হল; এ্যাডাম 'ত্রি-ঈশ্বরবাদ' পরিত্যাগ করে রামমোহনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেন (১৮২১)।[৪৩] রামমোহনের আন্দোলন ছিল দ্বৈতমুখীন, যেমন প্রাচ্যের তেমনি পাশ্চাত্যের। প্রাচ্যের হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাম্রাজ্যবাদী ধর্মপ্রচার— এই দু'য়ের হাত থেকে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করে জাতির মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। পাদ্রীদের সঙ্গে তাই ধর্মের বিচার তাঁকে করতে হয়েছে আবার হিন্দু-ধর্মের ব্যর্থ আবর্জনা সরিয়ে কিভাবে তাকে উজ্জীবিত করে তোলা যায় তার পথও তাঁকে খুঁজতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে কখনো কিছু তিনি লেখেন নি। এ বিষয়ে রামমোহন নিজেই লিখেছেন—

> "আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।"[৪৪]

হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে যখন খ্রীষ্টান মিশনারিগণ নানারূপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে থাকলো তখনও রামমোহন খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসঙ্গতি ও কুসংস্কার-গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পৌরাণিক হিন্দুগণের 'গরুড়' ও 'মৎস্য'রূপ ঈশ্বরত্ব নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বিদ্রূপ করলে রামমোহন স্পষ্টই বলেছিলেন—

> "পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। তজ্জন্য পাদ্রীসাহেবরা তাঁহাদিগকে উপহাস করেন। এ উপহাসের কারণ কি? মৎস্য কি

কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে? গরুড় কি পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আসে না।"[৪৫]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় নব্যশিক্ষিত যুবকদের চোখে এতদিনকার অবহেলিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের রূপটি রামমোহন এমনি করে তুলে ধরলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করলো তাদের। সমাজে তার প্রতিক্রিয়া তীব্র আকার ধারণ করলো। প্রাচীনপন্থীরা (যেমন, রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) সনাতন ধর্ম বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। নূতনেরা জোর করে সে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ওদিকে ইসলাম ধর্মের প্রতাপ ইংরেজ শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে লাগল। পক্ষান্তরে দেশীয় জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে মিশনারিদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ বিনা পয়সায় জনসাধারণের মধ্যে বিতরণও করা হত। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের যে বাধাবিহীন চেষ্টা তখন করা হত সে সম্পর্কে স্বয়ং রামমোহনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।—

"ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিয়া ত্রিংশৎ বৎসরের পর, এদেশীয় লোককে খ্রীষ্টীয়ান্ করিবার উদ্দেশ্যে তিনপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার। উহা হিন্দু দেবতা ও ঋষিদিগের কুৎসা, এবং মুসলমান ধর্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ এবং অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ দান। তৃতীয়, সামান্য দুঃখী লোককে চাকুরী দিয়া এবং প্রতিপালন করিবার লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টীয়ান করা।"[৪৬]

হিন্দু অভিভাবকগণের একটা খ্রীষ্টান-ভীতি পর্যন্ত জন্মেছিল, তাঁরা মিশনারি বিদ্যালয়গুলিতে সন্তানদের পড়াশুনোর জন্য পাঠাতে চাইতেন না। অক্ষয়কুমারের পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্ত মশায় অক্ষয়কুমারকে খ্রীষ্টান-পরিচালিত বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন, পাছে তাঁদের ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে যায়, এই ভয়ে। (রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।) সমাজে খ্রীষ্টান ধর্মের এই

ভীতির কথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর একটি কবিতায় সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন ; কবিতাটিতে লিখছেন—

মূর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্মপথ ধ'রে।
কার্য্য নাই ইস্কুলেতে লেখাপড়া ক'রে॥
হাদেরে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার মিশনরি যত।
আমাদের পক্ষে তারা দয়াধর্ম্ম হত॥
পিতার সুখের নিধি তনয় রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন॥
শূন্য করি জননীর হৃদয় ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
বাক্যের কুহক যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে॥
কামিনীর কোল শূন্য ক্ষুন্ন মন তায়।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ডব্।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব্॥[৪৭]

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৬৭ শক) দেবেন্দ্রনাথের হাউস-সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ভ্রাতা উমেশচন্দ্র সরকারকে তাঁর স্ত্রী সহ আলেকজ্যাণ্ডার ডাফ্ জোর করে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন। দেবেন্দ্রনাথ তার কঠোর প্রতিবাদ করেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমারকে প্রতিবাদ লিখতে বলেন ; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সে লেখা প্রকাশিত হয়। হিন্দু বালকদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য খ্রীষ্টান পাদরীদের পাঠশালায় যাতে যেতে না হয় তার জন্য দেশীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার আশায় দেবেন্দ্রনাথ চাঁদার খাতা হাতে রাস্তায় বেরুলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ১ মার্চ, ১৮৪৬-এ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন।

জাতিকে সর্ববিধ বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে যেমন রামমোহন সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি দেবেন্দ্রনাথও সচেষ্ট ছিলেন। অক্ষয়কুমার আর বিদ্যাসাগরও

এই মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত ছিলেন। অন্ধসংস্কার-শাসিত ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে ১৮১৫-তে রামমোহন আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; ১৮২৮-এ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা আত্মীয়সভারই (১৮১৫) প্রসারিত এবং পরিণত রূপকেই চিহ্নিত করেছিল। পৌত্তলিকতার উর্দ্ধে, নিরাকার একেশ্বরবাদ যে হিন্দুধর্মাশ্রিত সত্য, তার পূর্ণ স্বীকৃতি দেবেন্দ্রনাথও যখন তাঁর ধর্ম-চিন্তার মধ্যে দেখতে পেলেন, তখন তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ও ব্রাহ্ম-সমাজের (১৮২৮) মিলন সংঘটিত করে ব্রহ্ম-উপাসনাকে আরো ব্যাপকতর করতে উদ্যোগী হন। ১৮৪২-এ এই মিলন সংগঠিত হয়। উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম-বিশ্বাসের ফলশ্রুতি ব্রাহ্মধর্ম নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

'ব্রাহ্মধর্মে'র ব্রাহ্ম শব্দটি 'ধর্ম' শব্দটির পূর্বে ব্যবহারের রীতি সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই শুরু হয়। তৎপূর্বে রামমোহন নিজে 'ব্রাহ্ম-সমাজ', 'ব্রহ্মসভা' শব্দ-দু'টির ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৩২-এর ১২ সেপ্টেম্বর রাধাপ্রসাদ রায়কে লিখিত রামমোহনের পত্রে উল্লেখ আছে "ব্রাহ্মসভার কিরূপ নির্বাহ হইতেছে," এবং "এই অবকাশে ব্রাহ্মসমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি।"[৪৮] ১৮২৮-এ রামমোহন রায় চিৎপুর রোডের কমল বসুর বাড়ী ভাড়া নিয়ে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন সে সময়ে (২০ আগষ্ট ১৮২৮) **জন বিল** নামক একটি পত্রিকায় নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়ের উপাসনার বর্ণনা ছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির কোন নাম প্রকাশিত হয় নি। ১৮২৯-এ 'সতীদাহ-রোধ আইন' পাশ হবার পরে নামটি আসে। এই সময় সংবাদপত্রগুলিতে 'ব্রাহ্মসমাজ' 'ব্রাহ্ম্যসমাজ', 'ব্রহ্মসমাজ' 'ব্রাহ্ম্যসভা' প্রভৃতি একাধিক নাম ও বানানে সভার পরিচয় ও সংবাদ প্রকাশিত হত। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, "ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাবাগীশের ১৭টি ব্যাখ্যান এই পুস্তকে স্থান পায়। ব্যাখ্যানটির প্রথম মুদ্রণ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। 'ব্রাহ্মসমাজ' শব্দটি তখনও এ-পুস্তকের আখ্যাপত্রে লিখিত ছিল। কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি সম্ভবত রামমোহন রায়ের সময়ে সৃষ্ট হয় নি। তার সময়ে ঐ ধর্মের প্রচলিত নাম ছিল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম'। ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের যোগদানের পর 'ব্রাহ্ম' শব্দটির প্রচলন হয়েছিল

বেশি। 'ধর্মে'র পূর্বে 'ব্রাহ্ম' শব্দটির ব্যবহারও সম্ভবত তখন থেকে চলতে থাকে। "ইহাও অসম্ভব নহে যে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি।"[৪৯] তত্ত্ববোধিনীসভা ও ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলিত কর্মধারায় ব্রাহ্মধর্মের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত তাতে রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য দেবেন্দ্রনাথই মূল পুরোহিত, তাঁর সহায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং পরে কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মের পত্তন সম্পর্কে প্রশান্তকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন—

> "Before he went on his fateful visit to Europe in 1830, he (Rammohan) established and opened the first Temple of Catholic worship of the Ekamevadvitiyam (The One without a second) in spirit and in truth—to be open to all without distinction of creed, caste or colour. This was the beginning of the Brahmo Samaj".[৫০]

১৮২৮-এ রামমোহন, ১৮১৫-তে প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'কে যে 'ব্রাহ্মসমাজে' রূপ দিয়েছিলেন তাতে ব্রাহ্মধর্মের কাজ তখনো মনোমত ব্যাপ্তি লাভ করে নি; ১৮৩০-এ রাজা বিলাত যাত্রা করলেন; যাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসার যাতে ঠিক মত চলতে পারে তার জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) মহাশয়কে সমাজের প্রধান আচার্য নিযুক্ত করে যান। বেদপাঠ, এবং আচার্য'র বেদের ব্যাখ্যান, ও ব্রহ্মসঙ্গীত নিয়মিতভাবে চলতে থাকল। সমাজে উপস্থিত সকল ব্যক্তিই অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন থেকে ব্রহ্মজ্ঞানচর্চার জন্য আসতেন এমন নয়, অনেকেই আসতেন নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য।[৫১] রামমোহনের বিলাতগমন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়টা (১৮৩০-১৮৪৯) ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মের ইতিহাসে একটা অন্ধকার যুগ। প্রশান্তকুমার সেনের ভাষায় এই দশটি বৎসরে—

> "Many of them were passers-by who just came in to see what was happening. There was no enthusiasm for the cause save and except in the solitary individual, the minister, who with faith undimmed and with exemplary zeal and steadfastness kept up the dying embers till Debendranath was called to infuse fresh fire into the Brahmo Samaj."[৫১]

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনে 'ব্রাহ্মসমাজে'র যে অবস্থা ছিল, তার বর্ণনায় মহর্ষি নিজেই লিখেছেন—

"ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ হইত। যখন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা—যখন ট্রস্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল।"[৫২]

তত্ত্বোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ে তৎকালীন প্রধান আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামের অবতারত্ব প্রকাশ করতেন বেদীতে বসে। দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে বসে অবতারত্ববাদের বর্ণনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঠিকমত বেদপাঠ করতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিতে পারে, এমন সুবিজ্ঞ লোকের অভাব ঘোচাতে দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত-শিক্ষিত ছাত্র সংগ্রহে মনোযোগ দেন। তিনি লিখছেন—

"বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র এবং তারকনাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই দুইজনকেই খুব ভালবাসিতাম। আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাহাকে আদরের সহিত 'সুকেশা' বলিয়া ডাকিতাম।"[৫৩]

১৮৪৩-এ দেবেন্দ্রনাথ সমাজের কাজকর্মের অধিকতর সুষ্ঠু নির্বাহের জন্য "ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র" রচনা করেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্রানুযায়ী ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বিদ্যাবাগীশের বেদীতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।[৫৪] দীক্ষা গ্রহণান্তে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তাঁরা ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই প্রচারকার্যে রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত ব্যতীত আরো একজন দেবেন্দ্রনাথকে প্রাণপাত সাহায্য করেছিলেন। বৃন্দাবনের পথের-ছেলে, হাজারিলাল তাঁর নাম। বালক হাজারিলালকে দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসে ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয়

দিয়েছিলেন। কলকাতার পাপসঙ্গে, হাজারিলাল প্রথম কিছুদিন বিপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই "Having weathered many storms, his vessel came to harbour in Brahmoism. He became a devoted disciple of Devendranath and threw himself whole-heartedly into the work of propagating the Brahmo faith."[৫৫] শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজ বাংলা দেশের বহু জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো; ঢাকা, মেদিনীপুর, রঙপুর, কুমিল্লা, বাঁশবেড়িয়া, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। একদিকে এই ধর্মপ্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল নানা স্থানে, অন্যদিকে অক্ষয়কুমারের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য বিবিধ বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে লাগলো। ১৮৪৫-এ ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্মের আক্রমণ শুরু হল। রামমোহনের সময়, কেরী ও মার্শম্যানের সঙ্গে রামমোহনকে খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে বোঝাপাড়া করতে হয়েছিল, গোঁড়া মিশনারিদের হিন্দুধর্ম-আক্রমণ রামমোহন যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন; ঊনবিংশ শতকে ধর্মীয় অস্থিরতার মধ্যে যখন রামমোহন ইসলাম ধর্মের একেশ্বর বিশ্বাস, উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম্, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের Unitarianism,-এর ভিত্তিতে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫), এবং পরে 'ব্রাহ্মসমাজ'(১৮২৮) স্থাপিত করে ১৮৩০-এ বিলাত যাত্রা করলেন, ঠিক তার পূর্বে স্কটল্যাণ্ড্ থেকে এলেন Alexzander Duff, (1806-78) স্কচ্ মিশনারি। ডাফ্, ২৭ মে, ১৮৩০-এ কলকাতায় এলেন। রামমোহন ভেবেছিলেন ডাফ্ ইউরোপের অন্যান্য মিশনারিদের মত গোঁড়া হবেন না; ডাফ্‌কে নানাভাবে সাহায্য করলেন রামমোহন; কমলোচন বসুর যে বাড়ী ভাড়া নিয়ে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮২৮-এ, সেই বাড়ীতেই ডাফ্‌কে তাঁর মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন, নিজের স্কুল থেকে ছাত্র ডাফের স্কুলে পাঠালেন। "কিন্তু তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, যাঁহাকে তিনি তাঁহার 'গদি' দিয়া গিয়াছিলেন, ডাফ্ সেই দেবেন্দ্রনাথেরই মহা-প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবেন।"[৫৬]

১৮৩০-১৮৬৩, এই ৩৩ বৎসর ডাফ্ এদেশে মিশনের কাজে ছিলেন। এর মধ্যে দু'বার তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে মিশনের কাজের জন্য টাকার

জোগাড় করে আসেন। প্রথম বার স্বদেশ থেকে ফিরে এসে *India and India's Missions* (১৮৩৪) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ; এই পুস্তকে তিনি হিন্দুধর্মকে, বিশেষভাবে বেদান্তকে, খুব কড়া রকমে আক্রমণ করে নিতান্ত অর্থহীন ও নীতিহীন একটা ধর্ম বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তিনটি প্রস্তাবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডাফের এই ভ্রান্ত হিন্দুধর্ম-সম্পর্কীয় মতবাদের প্রতিবাদ করেন, ১৮৪৫-এ দেবেন্দ্রনাথের প্রতিবাদগুলি একত্রে একটি পুস্তিকাকারে '*Vedantic Doctrines Vindicated*' নামে প্রকাশিত হয়। বইটি রচনায় রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন বলে শিবনাথ শাস্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমাণ সহ তা অস্বীকার করে লিখেছেন—

> "কিন্তু যে সময়ে ডফ্ সাহেবের বইয়ের সমালোচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সে সময়ে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম হন ও তার পরের বছরে তিনি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম কাজ। অতএব ডফ্ সাহেবের বই লইয়া বাদানুবাদের লেখায় কোন ক্রমেই তাঁহার হাত থাকিতেই পারে না।"

লেওনার্ড সাহেব তাঁহার '*A History of the Brahmo Samaj*' বইটিতে লিখিয়াছেন যে—

> "বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্ ভিণ্ডিকেটেড্' রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের রচনা। চন্দ্রশেখর দেবের ইংরাজী লেখার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। সুতরাং তাঁহাকে দিয়া যে দেবেন্দ্রনাথ এই সকল বাদপ্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। রচনার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় 'আমরা' কথাটার বিশেষভাবে ব্যবহার আছে। দেবেন্দ্রনাথের সাহায্য লইয়া চন্দ্রশেখর এই বাদপ্রতিবাদগুলি লিখিয়াছেন।—এ প্রবন্ধগুলির রচয়িতা দুজনেই।"[৫৮]

ধর্মবোধ নিয়ে ডাফের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যে বিরোধ তা ডাফের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাফ্ মনে করেন, (ক) 'ব্রহ্মের ধারণা হয় না।' কারণ 'মানুষের মন নিজের বস্তুত্ব ও গুণ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা

গুণের ধারণা করিতেই পারে না।' (খ) 'বেদান্তে নীতির কোন কথা নাই', সুতরাং 'এ ধর্মে মানুষকে নীতিমান করে না'।[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম যে নির্গুণ, ডাফ্‌কে এই সত্য বোঝাতে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ; "মানুষের মধ্যে যে গুণ, প্রকৃতির মধ্যে যে সবগুণ দেখা যায়, সেগুলি অনির্দ্দিষ্ট, পরিবর্ত্তনশীল ও বিকারশীল বলিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না—সেই অর্থেই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়।" বেদান্তে নীতির কথা নেই বলে ডাফ্‌ যে অভিযোগ করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী তার জবাবে বলেন, "তদেতৎ সত্ত্বং, পরমং পরস্তাং, রসোবৈসঃ", "বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মনঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করে দেখান যে বেদান্তে নীতির কথা যথেষ্ট আছে।[৬০] খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এই অপপ্রচার কর্মের জগতেও দেবন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাউস সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ভাই উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে ডাফ্‌ সাহেব জোর করে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা দেন তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারকে দিয়ে প্রতিবাদ লেখালেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ নিজে লিখছেন, "আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।"[৬১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার লিখলেন—

> "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদিগের চৈতন্য হয় না? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহি-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশ যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।...১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ধর্ম্ম বিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহারদিগকে ধর্ম্মচ্যুত (ভ্রু) করা কি ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে?...তাহারদিগের (খৃষ্টান মিশনারীদিগের) কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে, যে উপায় দ্বারা হোক্ হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেক।...আমরা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছি এবং এখনও অনুরোধ করিতেছি যে,

ইহার প্রতিকারের জন্য আপামর সাধারণ সকলে যত্নবন্ত হও। দাবাগ্নি চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে, এখনও যদি না নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে অবিলম্বে সমুদায় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবে।·· অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, তবে মিশনারীদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রীদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খৃষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্রতরঙ্গকে তুচ্ছ করতঃ আপনারদিগের ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে, নগরে, গ্রামে, গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমারদিগের, দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?···অতএব স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! হিন্দুমধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এবিষয়ে সকলের একতা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"[৬২]

অক্ষয়কুমারের এই জ্বালাময়ী প্রবন্ধ এবং দেবেন্দ্রনাথের আবেদনে কলকাতার জনগণ এক ডাকে সেদিন সাড়া দিয়েছিলেন; এমন কি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী 'ধর্মসভা'র সমর্থকগণ, গোঁড়া হিন্দুগণও (যেমন, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, এবং রামগোপাল ঘোষ) সেদিন খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতি এতদূর বিরক্ত ছিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ থেকে যে একতাবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অনাচারের প্রতিবাদ করতে অনুরোধ এসেছিল তাতে তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন—

"They joined their forces against the common enemy and did their best to prevent children going to christian schools, and missionaries making christian converts".[৬৩]

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মদ্বন্দ্ব প্রথমে ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে, কিন্তু পরে

সেই দ্বন্দ্ব দেখা গেল তাঁর নিজের সমাজের সঙ্গে। আর প্রথমাবধি, সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মের মূল্যবোধ নিয়ে সংঘাত তো চলছিলই। এই ত্রিমুখীন সমস্যা ছিল দেবেন্দ্রনাথের। রামমোহনের ধর্মসংঘাত ছিল দ্বিমুখীন, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে ও সনাতন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির সঙ্গে, নিজ দলের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না।

তর্কে খ্রীষ্টানধর্ম-প্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে পরাস্ত করার পরই তাঁর বিরোধ বাধলো নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, এমন কি আত্মীয়দের সঙ্গেও। ১ আগস্ট, ১৮৪৬-এ দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়, এবং ২২ অক্টোবর ১৮৪৬-এ তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য জ্ঞাতিভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর *Englishman* (22 oct. 1846) পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথকে কঠোর সমালোচনা করে 'পৌত্তলিক' বলেন। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাশীল ছিলেন তাঁরা বললেন, শালগ্রামশিলা সাক্ষী করে শ্রাদ্ধ না করলে স্বজনপরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। দেবেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা এ সময় অস্থিরতায় বিক্ষুব্ধ ; বলছেন—

"কাহারো কাছে একটি আশ্বাসবাক্য পাই না, সাহসের কথা পাই না।"—এই দারুণ নিঃসহায় অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের একটি মাত্র বন্ধু "প্রাণের কথা" বলেছিলেন—

> "লোকভয় আবার ভয়! 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়', তাঁহাকে ভয় কর। ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায় ; তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম ছাড়িব না।" "ইনি কে? ইনি লালা হাজারীলাল।"[৬৪]

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ফেল করে ; 'কার ঠাকুর কোম্পানী'ও উঠে যায়। ১৮৪৮-এ দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনা করেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য হল—

> "আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে ;" এবং "ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্মগ্রন্থ চাই।"[৬৫]

'বীজমন্ত্র' অর্থে" দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যপ্রকাশক সংক্ষিপ্ত অথচ সরল বাক্য।"[৬৬] 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ (১৮৪৭—'৪৮) রচনায়

দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রিয় অন্তরঙ্গ অক্ষয়কুমার বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। মহর্ষি নিজে সে কথার স্বীকৃতি দিয়ে বলছেন,—

"এখন আমি ভাবিতে লাগিলাম. ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্মগ্রন্থ চাই। তখন আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, 'তুমি কাগজ কলম লইয়া বসো, এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক।" "...নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম, এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।"[৬৭]

দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের নিত্যসহচর অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ধর্মবোধ নিয়ে কিছুকাল থেকেই তাঁর মতবিরোধ চলছিল; ১৮৪৫-এ আলেকজ্যাণ্ডার ডাফের বেদান্ত'র অভ্রান্তবাদ-বিরোধী আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তার উত্তরে মহর্ষির মতবহ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৫) সাক্ষ্য দেয়—

"We will not deny that the reviewer (Dr. Duff) is correct in remarking that we consider the Vedas and the Vedas alone, as the authorized rule of Hindu theology. They are the sole foundation of all our beliefs, and the truths of all other **sastras** must be judged of according to their agreement with them; What we consider as revelation is contained in the Vedas alone; and the last part of our holy scriptures treating of the final dispensation of Hindusim, forms what is called the Vedanta."[৬৮]

কিন্তু এই অভ্রান্ত বেদান্ত-বিশ্বাসের প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও শীঘ্রই দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সকল সভ্য তাঁর সমর্থক নন। একমাত্র রাজনারায়ণ বসু ছিলেন দেবেন্দ্র-সমর্থক।—

"Most of the articles which appeared in the Patrika in defence of Vedic infallibility came, it is believed, from the pen of Rajnarain Bose who had joined the Brahmo Samaj in 1845, and was a patriotic advocate of indigenous religion". "The editor, Akshay Kumar Dutt, himself was no believer of Vedic infallibility, and he and his friends made no secret of their heterodox opinions."[৬৯]

এ যাবৎ দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি বেদ 'ঈশ্বর-

প্রত্যাদৃষ্ট' সৃষ্টি, অপৌরুষেয়। ১৮৪৮—১৮৫০-এর মধ্যে অক্ষয়কুমার এই ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানলেন; বললেন, "'বেদ' নামক গ্রন্থ, অপৌরুষেয়, ঈশ্বর-প্রত্যাদৃষ্ট হতে পারে না, মানুষের রচনা। অতএব তা অভ্রান্ত হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমানও নন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।"[১০]

দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেছেন, ছাত্র পাঠিয়ে (১৮৪৫)[১১], নিজে ১৮৪৭ সালে কাশীতে গিয়ে বেদচর্চা করে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি 'বেদ' অপৌরুষেয় নয় এই সত্যে উপনীত হন, এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের সমর্থনমূলক সম্মতি নিয়ে তত্ত্ববোধিনী সভায় ব্রাহ্মধর্মে বেদের অভ্রান্তবাদ নেই, এবং বেদ অপৌরুষেয় নয়—এই সত্য ঘোষণা করেন।[১২] মহর্ষির পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলছেন—

> "Finally, after much discussion, my father formally renounced the doctrine of verbal inspiration. At a general meeting of the Brahmas, it was agreed that the Vedas, Upanishads, and other ancient writings were not to be accepted as infallible guides, that Reason and Conscience were to be the supreme authority, and the teachings of the Scriptures were to be accepted only in so far as they harmonised with the light within us."[১৩]

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে **'আত্মীয় সভা'** প্রতিষ্ঠিত হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার। এই সভায় সামাজিক কল্যাণসাধন বিষয়ে আলোচনা হত, তবে প্রাধান্য ছিল ঈশ্বর-বিষয়ক আলোচনার। এই 'আত্মীয় সভা' সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁর মন্তব্য থেকে এই মনোভাব এবং সভার কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু জানা যায়। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—

> "ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন; তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা?' যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।" "কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না।"[১৪]

মার্চ, ১৮৫৪-তে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রেও মহর্ষির মনোক্ষোভ এই ধারণাকেই সমর্থিত করে। লিখছেন—

> "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"[৭৫] [পত্রসংখ্যা : ১০]।

এই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার (১৮৪৩—১৮৫৫)। প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সভ্যও ছিলেন অক্ষয়কুমার। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফেরেন। ১৮৫৬-৫৮ এই দু'বৎসরে তিনি আগ্রা, দিল্লী, সিমলা, কালকা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৮৫৭-র দুর্যোগময় রাজনৈতিক পরিবেশে সমগ্র দেশ যখন বিপ্লব ও বিরোধে কম্পিত, তিনি সিমলাতে নির্জনে দর্শনজিজ্ঞাসায় তখন মগ্নচিত্ত। Kent, Fichte, Victor Cousion, Scottish Intuitionist (প্রজ্ঞাবাদী) দার্শনিকগণ ও Francis Newman'র গ্রন্থাবলী তখন তাঁর নিত্য সহচর।[৭৬] অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), এবং 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫) এ সময়ের মধ্যে (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়ে গেছে।

১৮৫৭ সালটি সারা ভারতের ইতিহাসেও যেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও সমগুরুত্বপূর্ণ। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এই বিদ্রোহের বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ তখনো প্রবাসে। ১৮৫৯-এ ফিরে এসে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দিলেন ; এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে সিংহল ভ্রমণে যান। ফিরে এসে ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৮৬৪'তে কেশব সেন কর্তৃক 'প্রতিনিধি সভা' স্থাপন ও আন্তর্ভারত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হন। কেশব সেনের প্রস্তাবে তিনি সায় দিতে পারলেন না ; কেশব সেন ১৮৬৫'র শেষে 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন এবং কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব থেকে দূরে থাকলেন। ১৮৬৬'র ১৪ ফেব্রুয়ারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে 'Jesus Christ : Europe and Asia' বক্তৃতা দিলেন ; ইংরেজেরা তাঁকে স্বদলীয় বলে মনে করলো। ১১ নভেম্বর ১৮৬৬'তে কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করলেন। ১৮৭৮'এ সে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও ভেঙ্গে যায়, গঠিত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। কেশব সেনের বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রীতি নিয়ে মতান্তর হয়; শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি আর কেশব সেনের সঙ্গে ধর্ম-কর্ম করতে চাইলেন না। কেশবচন্দ্র 'নববিধান' নাম দিয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে ব্রাহ্মধর্ম রক্ষার প্রয়াস পেলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ব্রাহ্ম-ধর্মে এই ভাঙন সম্ভব হয়েছিল।

৬

ধর্মচিন্তায় অক্ষয়কুমার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বিপরীত। একজন ছিলেন বুদ্ধিবাদী মানবপ্রেমিক, অন্য জন ছিলেন তদ্গত সাধক। বিশ্বকার্যের মূল শক্তিতে অক্ষয়কুমারের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাস ছিল, আর দেবেন্দ্রনাথের ছিল হৃদয়ানুভাব।—মানুষ পার্থিব জীব, তার যা কিছু সম্পর্ক সব পৃথিবীর সঙ্গে, পার্থিব জীব ও জগতের সঙ্গে, সেখানেই তার যত নিয়ম-আচার, ধর্ম ও আচরণ; এই তার প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্যত্র নেই।—দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের এই মেটিরিয়ালিস্টিক জীবন ও ধর্মবোধ সম্পর্কে অন্য মত পোষণ করতেন। বিশ্বের কার্যকারণের মূল ঈশ্বর, মানব গৌণ—এই ছিল তাঁর জীবন ও ধর্ম-বোধের গোড়ার কথা। দত্ত মশায়ের 'র‍্যাশানাল হিউম্যানিস্‌ম্' সম্পর্কে মহর্ষি কিন্তু সচেতন ছিলেন; তিনি উক্তি করেছেন—

> " ..., আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ।"[৭৭]

একজন মরমী সাধক, অন্তরমুখীন জিজ্ঞাসায় স্থিত মুনির মত; অন্য জন বাস্তববাদী, বুদ্ধিগ্রাহ্য বহির্জগতের মানবকল্যাণ-কামনায় রত, সাধারণের সুখ-দুঃখের অংশীদার। 'বাহ্যবস্তু' (১৮৫১) গ্রন্থে অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

> "দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যকরূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্মপ্রযোজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তর

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এ বিষয়ের যাহা কি হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রচার করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতি বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েও প্রার্থনার অনাবশ্যকতায় বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে প্রার্থনার নিষ্ফলতা প্রমাণ করে সমীকরণ দাঁড় করাতেও তাঁর দ্বিধা নেই। অনায়াসেই লিখলেন—

১। পরিশ্রম = শস্য

২। প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

∴ প্রার্থনা = ০।

আনুমানিক ন' দশ বৎসর বয়সে তাঁকে খিদিরপুরের মিশনারি স্কুল ছাড়তে হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভয়ে। অভিভাবকদের ইচ্ছায় মিশনারি স্কুল তিনি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু তাতে তাঁর সনাতন হিন্দুধর্ম-প্রীতি সম্ভবত জাগ্রত হয় নি। এই স্কুলেই অক্ষয়কুমার প্রথম বিশ্বকার্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লাভ করেছিলেন।[৭৮] অভিভাবকদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম-ভীতিতে বালকের মনে সম্ভবত হিন্দুধর্ম সম্পর্কেই একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা হিন্দুধর্ম তাঁকে দেয় নি, খৃষ্টান পাদ্রী-পরিচালিত ঐ স্কুলটিই এই জ্ঞানের আলো প্রথম আনে। অথচ একটা ধর্ম-ভয়ের অজুহাতে তাঁর জ্ঞানের জগতের দুয়ার জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হল, এটা সেদিনকার বালকমনের প্রসন্ন স্বভাবিকতা সৃষ্টি না করারই কথা ছিল। কিন্তু তাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রীতি তাঁর জন্মায় নি। সেদিনকার ঐ ঘটনায় পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা তাঁর ভাল লাগে নি। এ ভালো না লাগা তাঁর সাধারণ ভাবে ধর্মের ক্ষেত্রেই ছিল। ১৮৪৫'এ, উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রীর খৃষ্টীয় ধর্মান্তরের ঘটনায় ঐ ধর্মের সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন রূপই প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর নিকট। ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিবাদের মধ্যে হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্মের বাড়াবাড়ি থাকবে না, মানবকল্যাণমুখীন এক ধর্মবোধ হয় তো গড়ে উঠবে, এরূপ আশা পোষণ করে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণও করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মিস্টিক ধর্মচেতনায় মানবকল্যাণ-সাধনের অপরিহা

অঙ্গ বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য ছিল না। বেদের অভ্রান্তবাদ অসত্য প্রমাণ করার পরও তাই তাঁর চিত্তে শান্তি ছিল না। দেবেন্দ্রনাথও যেমন হৃদয়ের অনুভবে ঈশ্বরের শক্তি, করুণা উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, বাধা পেয়ে অন্তরে অন্তরে অশান্ত হয়েছিলেন, অক্ষয়কুমারও তেমনি মানব-ধর্মাচরণে দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ সহযোগিতা না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৮৫২'র 'আত্মীয় সভা'য় হাত তুলে ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষয়কুমারের বুদ্ধিবাদের বাড়াবাড়িটা সম্ভবত বাহ্য; অন্তরে সেই "র‍্যাশান্যালিজমে'র কষ্টিপাথরে জীবনের দর্শন বিচারের প্রয়াসই ছিল জাগ্রত।—তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল মানবপ্রীতির নামান্তর।

বাস্তবজীবন-সম্পৃক্ত মানবধর্ম ছিল তাঁর জীবনবেদ। ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বেদ অভ্রান্ত, ধর্মের মূলে এই বেদ একমাত্র গ্রাহ্য প্রামাণিক ভিত্তি,—'মেটিরিয়ালিস্টিক হিউম্যানিস্ট' অক্ষয়কুমারের পক্ষে মানা অসম্ভব ছিল। তাঁর শেষ জীবনে লেখা চিঠিপত্রগুলির মধ্যে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রগুলির শিরোভাগে 'বিশ্ববীজ' লেখা দেখা যেত। বিশ্ব-কাজের মূলে বেদ একমাত্র গ্রাহ্য-ভিত্তি বলে তিনি মানতেন না সত্য, কিন্তু একটা শক্তিকে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর চূড়ান্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও (যেমন, 'আগ্নেয়গিরি', 'জলপ্রপাত', 'গ্রহণ') সৃষ্টিকাজের পশ্চাতে পরম ঈশ্বরের শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেবল স্বীকৃতি নয়, স্পষ্টতই লিখেছেন, "তাঁহার করুণা বিশ্বব্যাপিনী।" কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য—

> "অসংখ্য জীবের জীবনরক্ষা, শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সমুন্নতি এবং সুখসম্ভোগ-সংবর্দ্ধনই তাঁহার সকল কৌশলের উদ্দেশ্য।" [১৯]

অক্ষয়কুমারের এই ধর্মচিন্তা তাঁর জগৎ ও জীবন-ধারণার বহির্ভূত অধ্যাত্ম-সাধনার ফলশ্রুতি নয়। জীবন ও ধর্মকে তিনি এক করে বিচার করেছেন। আজন্ম জ্ঞানপিপাসু ও 'মেটিরিয়ালিস্টিক' চেতনায় বিশ্বাসী অক্ষয়-কুমার আমৃত্যু বিজ্ঞানবিশ্বাসী ছিলেন। জীবনসায়াহ্নেও তাই বিজ্ঞানের নিকটেই শ্রদ্ধানতি জানিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক-মাস পূর্বে রাজনারায়ণ বসুকে নিজ মরদেহ সম্পর্কে সৎকারের নির্দেশ দিয়ে এক পত্রে লিখছেন—"......আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটি কথা আছে,

আমার মৃত্যু সংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে, যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সংকার হইবে না। ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সংকারের আদেশ দিবে, কিন্তু মৃত্যুর পর অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা সংকার হইবে না।" [৮০]

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ধর্মবোধের মিল ও অমিল এখানে। বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে উভয়ের ধর্মবোধের একটি তুলনামূলক বিন্যাস-চিত্র থেকে। যেমন—

		দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	অক্ষয়কুমার দত্ত
১	ঈশ্বর	আছেন।[১]	আছেন।[১ক]
২	তাঁর রূপ	নিরাকার।[২]	নিরাকার।[২ক]
৩	তিনি	একটি ইচ্ছা।[৩]	একটি শক্তি।[৩ক]
৪	তিনি	সর্বশক্তিমান. সর্বত্র বিরাজমান।[৪]	বিচিত্র শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান।[৪ক]
৫	তিনি	হৃদয়ে অনুভব্য।[৫]	বুদ্ধিতে জ্ঞেয়।[৫ক]
৬	ঈশ্বরের নিকট	প্রার্থনা আবশ্যক।[৬]	প্রার্থনা নিষ্ফল।[৬ক]
৭	ধর্মাচরণের লক্ষ্য	হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতির অনুভব ও তাতেই সুখ।[৭]	মানব-কল্যাণসাধন ও তাতেই সার্থকতা।[৭ক]

১। দেবন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী, ১-২৪২। ১ ক। অক্ষয়কুমার, চা. পা. (৩), ১৩২-'৩৩, ধৰ্ম্মনীতি। ২। তদেব। ২ ক। তদেব, ভূমিকা, ১৵০। ৩। Sen, P. K., *op cit*, উপহার। ৩ ক। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস,পূর্বে উল্লিখিত, ৩০। ৪। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, ৩০। ৪ ক। তদেব। ৫। দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী ১১০-'১৪, ১৬৯-'৭৪। ৫ ক। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী, ১১০-১১৪। ৬। তদেব, ৯৪। ৬ ক। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বউল্লিখিত, ৯৪। ৭। দেবন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী ১১০-১৭৪। ৭ ক। ধৰ্ম্মনীতি (১৮৫৬) বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ভাগঃ ১৮৫১; ২ভাগ ১৮৫৩)।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার কর্মভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষকতার ভার নেন। বিদ্যাসাগর দ্বিধাশূন্য মনে অক্ষয়কুমারের যোগ্যতা সম্পর্কে তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার কাছে লিখলেন—

> For the post of Headmaster of the Normal classes, I would recommend Babu Akshoy kumar Dutt, the well-known editor of the Tatwabodhini Patrika. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time.[৮১]

কিন্তু রোগজীর্ণ অক্ষয়কুমার ২ বৎসরের মধ্যে সে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তত্ত্বোধিনী পত্রিকার ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করে অক্ষয়কুমার দারিদ্র্য ও শারীরিক রোগের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে থাকেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি থেকে যে আর্থিক আয় হয়েছিল তারই উপর নির্ভর করে 'তত্ত্বোধিনী সভার' (১৮৩৯) বৃত্তি আর গ্রহণ করেন নি।[৮২] অক্ষয়কুমার রোগজর্জর দেহ নিয়ে হাওড়া জেলার বালি গ্রামে গঙ্গার ধারে শেষ জীবনটা কাটান। নানা সৌখীন লতাপাতা, গাছ-গাছড়ায় সাজানো তাঁর বাড়ীটির নাম দিয়েছিলেন 'শোভনোদ্যান'। লোকে বলতো "কনিষ্ঠ বোটানিক্যাল গার্ডেন"। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়।

১৮৫৫'র পর দেবেন্দ্রনাথও আর শান্তি পান নি। ১৮৫২'র 'আত্মীয় সভা'র গণতান্ত্রিক উপায়ে ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্ধারণ, দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের বেদানুগত্যের প্রতি অক্ষয়কুমারের অপ্রসন্ন মনোভাব, দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য, ১৮৫৮তে নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৮৫৯এ 'তত্ত্বোধিনী সভা'র অবসান, কেশব সেনের সঙ্গে মতবিরোধ; ১৮৬৫তে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙ্গে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' করা, প্রভৃতি কারণে দেবেন্দ্রনাথও জীবনের শেষ দিকটাতে মানসিক অশান্তি বেশী পেয়েছেন। ১৮৩৯—১৮৫৫ পর্যন্ত ষোলটি বৎসরই উভয়ের জীবনের মোটামুটি শান্তিপূর্ণ কাল। এর পর থেকে অক্ষয়কুমারেরও দেহে রোগযন্ত্রণা শুরু হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের মনেও অশান্তি, অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষয়কুমার তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনে অসুস্থতার জন্য কাজ করতে

অক্ষম হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কর্মভার পরিত্যাগ করে নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতার কাজ নিয়েছেন, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় সে কাজও করতে পারেন নি ; বৃত্তির টাকায় জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে ; এবং সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে বালি'র 'শোভনাদ্যানে' ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথও অস্থির হয়েছেন যখন আঘাত পেয়েছেন তাঁরই আপন-জনপ্রতিম কর্মক্ষেত্রের সহযোগীরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আপন ভ্রাতা, বিশ্বস্ততম বন্ধু, সকলের কাছ থেকেই মনোদুঃখ পেয়েছেন। তাই পরমব্রহ্মের আস্বাদনে জাগতিক তুচ্ছ মনোমালিন্য অগ্রাহ্য করতে ছুটে গেছেন একবার হিমালয়ে, একবার সিমলায়, একবার পদ্মা নদীতে, কখনও বা বরানগরের গোপালঠাকুরের নির্জন বাগানবাড়ীতে, কখনও বা বীরভূমের জঙ্গল-ঢাকা সেই অতি নির্জন ভুবনডাঙ্গার মাঠে।

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের চেয়ে দীর্ঘজীবি ছিলেন। অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খৃঃ এ।[৮৩] তখন তিনি দেখে গেছেন বাংলাগদ্যের বিপুল বিকাশ ও প্রসার। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথের করস্পর্শে বাংলাগদ্য তখন ঐশ্বর্যপূর্ণ। ধর্মান্দোলনে নানা নূতন শক্তি যোজিত হয়েছে। সেই পাশ্চাত্য-মুখিনতা তখন কমে গেছে। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে হিন্দু সমাজের প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গিয়ে এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমন্বয়ের আবহাওয়া গড়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন ব্রাহ্মসমাজের ভাঙ্গন—একবার কেশবচন্দ্র, পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর নায়কত্বে। তিনি দেখেছেন ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং নূতন করে হিন্দুধর্মের জাগরণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দুজনের সঙ্গেই তিনি পরিচিত ছিলেন এবং পৃথিবীতে বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের যথার্থ স্থান প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও তিনি দেখে গেছেন। তিনি আরো দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যে নূতন বাংলাসাহিত্য, তার নায়ক তাঁর পুত্র, রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ, এবং অক্ষয়কুমারের মধ্যে অনৈক্যই চোখে পড়ে বেশী। একজন ধনীপুত্র, ধনী ; অন্যজন সাধারণ বাঙালীর সন্তান, স্বল্পবিত্ত লেখক। একজন বিরাট পরিবারে মানুষ। অন্যজন সাধারণ পরিবারের সন্তান মাত্র। দেবেন্দ্র-নাথের বাল্যযৌবন কেটেছে বিলাসে, শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন প্রচুর ; সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, আজীবন বড় বড় সংগীতজ্ঞদের সাহচর্য করেছেন,

ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের জীবন দারিদ্র্যেই কেটেছে, শিক্ষার সুযোগ বেশী হয় নি, তবে নিজ চেষ্টায় শিখেছেন অনেক। সুকুমার কলা এবং বিলাস-চর্চার কোন সুযোগ তাঁর ঘটে নি। সংগীত শিক্ষা বা ভ্রমণ তাঁর হয় নি। দেবেন্দ্রনাথের মূল জিজ্ঞাসা ছিল ধর্মের। তার জন্য ত্যাগ ও সাধনা তিনি করেছেন। দেশ তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দিয়েছে। অক্ষয়কুমারের ধর্মে কৌতূহল ছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত ঈশ্বরচিন্তায় তিনি অতিবাহিত করেন নি। এত বাইরের অমিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অন্তরে ঐক্য ছিল। দুজনেই বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন। দেশ এবং ধর্মকে ভালবাসতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

১। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরও জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে উভয়ের পারস্পরিক পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা. সা. চ. (১ খণ্ড : ১২ সংখ্যা), ৫।

৩। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বাবু অক্ষয়কুমার, ৪-৬।

অক্ষয়কুমার সম্পর্কে প্রচলিত এই সকল ঘটনা সত্য হোক বা না হোক, আশৈশব তাঁর যে বিদ্যাচর্চার একটি প্রবল আগ্রহ ছিল সে বিষয়ে একটা ধারণা অন্তত জন্মায়।

৪। তদেব, ৪-৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, ৬।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চা. পা. (৩), ভূমিকা, ।৶৹—৷৷৶৹।

৫। *The English Works of Raja Rammohon Roy*, Allahabad, 1906, 497.

৬। রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, (১৮৭৪) ১৯৫৬, ৩২-৩৩।

৭। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার প্রায় চার মাস পরে ডিরোজিও এই পদে ইস্তফা দেন। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৮। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী : পরিশিষ্ট, ৪ সংস্করণ, ১৯৬২, ২৩।

৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু, ৮৫।

১০। তদেব, ১০০—১০১।

১১। তদেব, ৮৭।

১২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ১৯২৮, ৬৯৩।

শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বে উল্লিখিত, ৬৬।

১৩। In 1824 Pearson published Bhugol ebung Jyotish, A. B., pp. 311.

dialogues on geography and astronomy, which gave a general description of the earth, the zillahs of Bengal, general History of Hindusthan, description of other countries in Asia, general geography of Europe and America—the solar system, comets, eclipses, tides lightening, rainbows, compass, meteores :—J. Long. '*A Descriptive Catalogue of Bengali Works*' (*1855*)

রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতিভা, ৪৫।

১। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, ৯।

১৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বাবু অক্ষয়কুমার, ৭।

১৬। সত্যেন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, ॥/•।

১৭। অক্ষয়কুমারের বিবাহকাল সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় (পূর্বে উল্লিখিত) এবং অক্ষয়চরিতে 'পোনের বৎসর বয়সে' এবং 'অনুমান পঞ্চদশ বৎসর মাত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতে "তের বৎসর" বয়সে এই বিবাহ হয়। (পূর্বে উল্লিখিত)।

১৮। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, ১৩—১৮।

১৯। Dutt, R. C., *Cultural Heritage of Bengal*, 106—107

২০। বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ২ খণ্ড, ৬৫২।

২১। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, ১২৪—২৫।

২২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, ২৬।

২৩। তদেব : পরিশিষ্ট, ২৬২—৬৩, ২৭৩।

২৪। যোগেশচন্দ্র বাগল, সা. সা. চ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩ খণ্ড, ৪৫ সংখ্যা, ৯।

"............Tagore Debendranath ; Maharshi

Entered Hiudu College, shottly after the resignation of Derozio, 1831 ; left while in the second class."

ডিরোজিও কলকাতায়, 'ইটালী পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলা.........দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।' জন্মকাল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ। "ইনি জাতিতে পোর্ত্তুগীস্ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী।" ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হন ; ইনি 'ছাত্র দরদী', ও 'ছাত্রবন্ধু' শিক্ষক ছিলেন এবং যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন ; উনবিংশ শতকের হিন্দু কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁর এই মুক্ত মনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। সে সময়কার 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের নেতৃত্ব করতেন এই ডিরোজিও।—তদেব।

২৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, ২৬৬, সা. সা. চ. ৩ (৪৫), ১৩—১৫।

২৬। তদেব, ৮।

২৭। তদেব, ৫—৬।

২৮। তদেব, ৩—৪।

২৯। আত্মজীবনী', ৬।

৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯১৫ সেপ্টেম্বর—অক্টোবর (১৮৩৭ শক, আশ্বিন), ১০৬।

৩১। দেবেন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, ২৬।

৩২। দেবেন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, ৩৬।

৩৩। টাকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার 'বিদ্যাদর্শন' (জুন, ১৮৪২) নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল—, "...যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপিবিদ্যায় বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্বক নীতি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানাপ্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদি লিখনে এক এক প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।" ছ'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। —সা. সা. চ. ১ (১২), ১৬—১৮।

৩৪। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পূর্বে উল্লিখিত, ১৯—২১।

৩৫। Dutt., R. C.. *The Literature of Bengal*, 163—164.

৩৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বে উল্লিখিত, ॥৴০।

৩৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বে উল্লিখিত, ১৮১।

৩৮। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, ৩৭।

৩৯। স্মর্তব্য, ১৮৫০-এ বঙ্গানুবাদ-বিহীন 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৪০। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার জনশিক্ষা', কলকাতা, ১৯৪৯, ৬৩—৬৬।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠশালাটির ছাত্রসংখ্যা হয় ১২৭ জন; এবং ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত পাঠশালাটির পাঠ্যসূচি ছিল নিম্নরূপ—

প্রথম শ্রেণী: ছাত্রসংখ্যা ৪ জন। বাংলা—কঠোপনিষৎ, (রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চুম্বক), তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা; ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, ইংরাজী—Reader No. 4, Poetical Reader No. 2, Grammar, History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী: ছাত্র সংখ্যা ১৪ জন। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ: ব্যাকরণ, জ্ঞানার্ণব, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরাজী—Reader No. 3, Poetical Reader No. 1, Grammar, History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী: ছাত্র সংখ্যা ২৪ জন। বাংলা—বর্ণমালা ২য় ভাগ, মনোরঞ্জন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ইংরাজী—Reader No. 1, Spelling No. 2.

চতুর্থ শ্রেণী: ছাত্র সংখ্যা ২০ জন। বাংলা—নীতিকথা (২য় ভাগ), বর্ণমালা (২য় ভাগ), অঙ্ক, ইংরাজী—Reader No. 1, Spelling No. 2.

পঞ্চম শ্রেণী: ছাত্র সংখ্যা ২৯ জন। বাংলা—নীতিকথা (১ম ভাগ), বর্ণমালা (১ম ভাগ), অঙ্ক, ইংরাজী—Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী : ছাত্র সংখ্যা ৩৬ জন। বাংলা—বর্ণমালা (১ম ভাগ), অঙ্ক, ইংরাজী—Easy Primer.

৪১। যোগেশচন্দ্র বাগল, পূর্বে উল্লিখিত, ৬৬।

৪২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ৫ সংস্করণ এলাহাবাদ ১৯২৮, ৩৯৬।

৪৩। Sen, P. K., *Biography of New Faith*, Vol. 1. Calcutta, 1950, 28—29.

৪৪। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, ২১৮।

৪৫। তদেব, উপক্রমণিকা, ৭, ১৯৬।

"আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে? কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না।"—'ব্রাহ্মণ সেবধি'; ১৮২১, ২৬—২৭।

৪৬। ব্রাহ্মণ সেবধি; দ্রঃ রামমোহন গ্রন্থাবলী (ব্রজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত) ৫—৬।

৪৭। Dutt., R. C., *Op. cit.*, 155.

সে সময় কত দ্রুত এবং কত ব্যাপকভাবে দেশীয় হিন্দুদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে তোলা হচ্ছিল তার সামান্য কটি পরিসংখ্যান দেখলেই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়: "কাটোয়াতে ১৫৭ জন। কৃষ্ণনগরে ৩১০ জন। টালিগঞ্জে ৫৪৪ জন। ঢাকায় ১৮ জন। বরিশালে ৭০ জন। বর্দ্ধমানে ১৮৬ জন। যশোহরে ৩২২ জন। কার্পাসডাঙাতে ৯৬০ জন। বারুইপুরে ১৩২১ জন। সবসুদ্ধ এক বাংলা দেশেই প্রায় ৮০০০ লোক খৃষ্টান হইয়াছিল।" [অজিতকুমার চক্রবর্তী, তদেব, ১৪১]

৪৮। তত্ত্বকৌমুদী, ৩-৪ সংখ্যা ৮৮ : বর্ষ, ১৯৬৫, ৪৬।

৪৯। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট : ৩১১-১৮।

৫০। Sen, P. K., *Op. cit*, 137.

৫১। *Ibid*, 137.

৫২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, ৪১।

৫৩। তদেব, ৪২—৪৩।

৫৪। (১৭৬৫ শক, ৭ পৌষ) এই দিনটি স্মরণ করে রাখবার জন্য অদ্যাবধি শান্তিনিকেতনে প্রতিবৎসর সাতই পৌষ পৌষ-উৎসবের আরম্ভ হয়। ৭ই পৌষের মাহাত্ম্যনির্ণয়ে অজিত চক্রবর্তী বলেছেন: "মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত-ভবিষ্যতের যিনি ঈশান, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, এই জন্যে সেই দীক্ষার ভিতর থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এই সেই ৭ই পৌষ, এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলচে।" [অজিত চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১৯]।

৫৫। Sen, P. K., *Op. Cit.*, 154—155.

৫৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০।

৫৭। অজিতকুমার চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, ১৩১।

৫৮। তদেব, ১৩১—১৩২।

৫৯। তদেব, ১৩২—'৩৩।

৬০। তদেব।

৬১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বে উল্লিখিত, ৬২।

৬২। তদেব, ৬৩। অজিতকুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১৩৯।

৬৩। P. K. Sen. *Op. Cit.*, 158—159.

৬৪। দেবেন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত ; ৭৭—৭৮।

৬৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্ম : ১ম ও ২য় খণ্ড, (১০ম সংস্করণ ; ১৯৪৯) ৩৫১—৩৫২। ১ম সংস্করণ, ১৮৪৮ ; কলিকাতা।

৬৬। দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্ম ৩৫২।

৬৭। তদেব, আত্মজীবনী, ১৩১—'৩২।

৬৮। Sen, P. K., *Op. Cit.*, 159.

৬৯। *Ibid*, 159—'60।

৭০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, ২২।

৭১। ১৮৪৫-এ আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, রমানাথ ও বাণেশ্বর এই চারজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠান। —দ্রষ্টব্য : 'আত্মজীবনী', ৬৭।

৭২। শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু', ১৮১।

৭৩। Tagore S. N., *Introduction to Autobiography of Maharshi Debendranath Tagore* ; London, 1914. 5.

৭৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' ; ১৭০—'৭১।

৭৫। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী—সম্পাদিত, দেবেন্দ্রনাথের 'পত্রাবলী' ১১।

৭৬। আত্মজীবনী, ৪০।

৭৭। দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী, ৩৭।

৭৮। জে. ডি. পিয়ারসন্, ভূগোল এবং জ্যোতিষবিষয়ক প্রস্তাব, ১৮২৪।

৭৯। চারুপাঠ (৩) : ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, ১৮৫৯, ১৩২।

৮০। সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত : বঙ্গদর্শন ১৯০৫-৬।

৮১। সা. সা. চ. ১(১২), ২৭।

৮২। তদেব, ৩০।

৮৩। "১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ মে (বাঙ্গালা ১২৯৩ অব্দে ১৪ জ্যৈষ্ঠ) তিনি অন্যান্য দিনের মত প্রাতঃকালে বেড়াইয়া আসিলেন—দিনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকলও যথারীতি শেষ করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল। অন্যান্য দিন রাত্রিতে তিনি যে সময়ে আহার করেন—আজ তাহার ব্যতিক্রম হইল, তিনি একটু বিলম্ব করিয়াই খাইলেন। আহারের পর মুখশুদ্ধি করিবার জন্য

বড় বড় সুপারির টুকরা চিবাইতে লাগিলেন। হঠাৎ উহার একটা কণা গলায় আটকাইয়া ভয়ানক বিষম লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বঙ্গবাসীর নয়নমণি অক্ষয়কুমার চিরতরে চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার সকল কষ্টের সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।" —রাজকুমার চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৯২৫, ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়

অক্ষয়কুমার : গ্রন্থ-পরিচিতি ও সাহিত্য-রচনা

বিষয়বৈচিত্র্যে অক্ষয়কুমারের রচনা বিপুল। নীতি, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে লিখিত তাঁর গদ্যরচনার কাল ১৮৪১-১৮৮৩ পর্যন্ত প্রসারিত। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে রচিত আটখানি গ্রন্থের প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১৮৪১ ভূগোল, ১৮৪৫ ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা, ১৮৫১ (১ম ভাগ), ১৮৫৩ (২য় ভাগ) বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১৮৫৫ বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ, ১৮৫৫ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৫৬ ধর্ম্মনীতি, ১৮৫৬ পদার্থবিদ্যা, এবং ১৮৭০ (১ম ভাগ) ও ১৮৮৩ (২য় ভাগ) ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।[১] দেখা যাচ্ছে গ্রন্থগুলি বস্তুত তিনটি পর্বে রচিত। যথা—

১। ১৮৪১—১৮৫৬'র পর্ব।

২। ১৮৫৭—১৮৬৯'র পর্ব।

৩। ১৮৭০—১৮৮৩'র পর্ব।

প্রথম পর্বে অক্ষয়কুমারের রচনাসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তাঁর ব্যক্তিজীবনও বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতির জাগরণে এই সময় সর্বাধিক কর্মচঞ্চল। দু' খণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর দুটি ভাগই এ সময়ে রচিত; কিন্তু ১৮৪১-এ ভূগোল প্রকাশিত হবার পর তিন বৎসরের মধ্যে অক্ষয়কুমারের অন্য কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নি। অথচ ১৮৫৫-'৫৬'র মধ্যে তাঁর ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বাষ্পীয় রথারোহী (১৮৫৫), ধর্ম্মনীতি (১৮৫৬) এবং পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) প্রভৃতি চারখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে অক্ষয়কুমারের সাহিত্যজীবনের বারোটি বৎসরে (১৮৫৭-১৮৬৯) পূর্বের একমাত্র চারুপাঠের তৃতীয় ভাগটি ব্যতীত অন্য কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নি। তাও এই ভাগটি বস্তুত পূর্ব পর্বে রচিত গ্রন্থগুলির থেকে গৃহীত বিভিন্ন রচনার সংকলন মাত্র।[২] আলোচ্য পর্বে লেখকের রচনা-স্বল্পতার কারণ সম্ভবত তাঁর শারীরিক অসুস্থতা, যার জন্য তিনি এ সময় 'তত্ত্ববোধিনী'র

সম্পাদনা ছেড়েছেন, নর্মাল স্কুলের কাজ ত্যাগ করেছেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার বৃত্তির টাকায় কোনমতে দিনাতিপাত করছিলেন।

রচনার সংখ্যাল্পতা তৃতীয় পর্বেও ; কিন্তু অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (১৮৭০, ১৮৮৩) এই সময়ে প্রকাশিত হয়। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি কেবল ভারতীয় ধর্মের একটি ইতিহাস নয়, এটি বহু ধর্মসম্প্রদায়ের জীবনাচরণের বিশদ বিশ্লেষণমূলক মৌলিক গবেষণাও। H. H. Wilson'র '*The Hindu Religious Sects*'র প্রত্যক্ষ অনুসরণে এই গ্রন্থটি রচিত বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে তা সর্বতোভাবে স্বীকার্য নয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে তথ্যসহ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

২

ভূগোল (১৮৪১) অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্য গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থ এ সময়ে প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি আরও দু'বৎসর পরে ১৮৪৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ, ডেভিড্ সাহেবের বক্তৃতাও (১৮৪৫) তার আগে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালী-রচিত বাংলাভাষায় লিখিত ভূগোল বই সম্ভবত অক্ষয়কুমারের পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি, সেদিক থেকে ১৮৪১-র অক্ষয়কুমারের ভূগোল গ্রন্থই এই ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী।[৩] এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> "বহুক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"[৪]

অর্থাভাবে ছাপা না হয়ে বইটি পড়ে ছিল কিছুদিন। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা'র অর্থানুকূল্যে ১৮৪১-এ বইটি প্রকাশিত হয়। লেখক 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে এই উপকারের স্বীকৃতিও জানিয়েছেন।

> "অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।"[৫]

ভূগোল (১৮৪১) প্রকাশিত হবার পর তিন বৎসরের মধ্যে অক্ষয়কুমারের কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এই সময়ের মধ্যে (১৮৪২-৪৪) তিনি 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কিছু কিছু

রচনা এ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় লিখেছেন—

> "কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয় লইয়া যে সমুদায় সমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রীবিদ্যার সপক্ষ বিপক্ষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র······করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে যে-সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায়দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এ পর্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই।"[৬]

আরও এক বৎসর পরে, ১৮৪৩-এ তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) প্রকাশিত হল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে অক্ষয়কুমার লিখলেন—

> "কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকায় সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।"[৭]

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ, ডেভিড্ সাহেবের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মাত্র আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অক্ষয়কুমারের রচিত, এবং প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এই বইটিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। বইটি রচনার উৎস এবং বস্তুবিষয় সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা' সংবাদ দিয়েছেন—

> "Babu Ukhoy coomar Dutta then rose to deliver a discourse, which was in the Bengali language. The subject of it was the changes effected by the agency of Education in the Hindu mind."[৮]

অক্ষয়কুমারের তৃতীয় গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তু' (১ ভাগ, ১৮৫১; ২ ভাগ, ১৮৫৩), ১৮৪১-'৫১ এই দশ বৎসরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভূগোল (১৮৪১) এবং ডেভিড্ বক্তৃতার (১৮৪৫) মাঝে চার বৎসরের ব্যবধান। আর 'বাহ্যবস্তু' রচিত হয় আরও ছ' বৎসর পরে। এই ছ' বৎসরের মধ্যে

বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), বোধোদয় বা শিশুশিক্ষা (১৮৫১) প্রকাশিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থই তখনো প্রকাশিত হয় নি।

'বাহ্যবস্তু' George Combe'র *The Constitution of Man* (1828) নামক গ্রন্থের পরিকল্পনায় রচিত বলে প্রচলিত ধারণা আছে। (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা নীতি-বিষয়ক আলোচনায় দ্রষ্টব্য)। George Combe স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। জগতে বিখ্যাত ছিলেন বড় নরকোটি-বিদ্ (Phrenologist) রূপে। আমিষ খাদ্যের অপকারিতার সমর্থন এবং বহির্জগতের সঙ্গে মানবজীবনের পারস্পরিক প্রাকৃতিক সম্পর্কের বিশদ বিশ্লেষণই মূলত বইটির উপজীব্য। গ্রন্থটির প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে একটি মন্তব্য করে অক্ষয়কুমার নিজেই গ্রন্থের মৌলিকত্ব সম্পর্কে লিখেছেন—

> "ইহা ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।"[৯]

অক্ষয়কুমারের পরবর্তী পুস্তক চারুপাঠ (১ ভাগ ১৮৫৩, ২ ভাগ ১৮৫৪, ৩ ভাগ ১৮৫৯) সমগ্র অক্ষয়-রচনাবলীতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর একমাত্র সাহিত্যবিষয়ক রচনাটি-সহ নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি বিচিত্রবিষয়ক সঙ্কলনগ্রন্থ এবং উনিশ শতকের অন্যতম বহুল প্রচলিত ও শ্রেষ্ঠ ছাত্র-পাঠ্য পুস্তকরূপে 'চারুপাঠে'র মূল্য বিশেষভাবে বিচার্য। অবশ্য কেবল উনিশ শতকের মধ্যেই 'চারুপাঠে'র সীমা প্রসারিত নয়, বিশ শতকেও তার বিস্তার লক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই পুস্তক পাঠ করেছেন। আত্মকথায় শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়িকাকেও অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ পড়তে দেখা গেছে।[১১] এই পুস্তক সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন—

"ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজী গ্রন্থ হইতেই ঐ সকল বিষয় সংকলন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত।"[১২]

চারুপাঠ (৩) সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন কোন মন্তব্য প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। তৃতীয় ভাগ সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

"স্থায়ী সাহিত্যে চারুপাঠের স্থান আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া, কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন: এরূপ তর্ক উঠিবার বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নানারূপ অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্বেও পুরাতন পঞ্চতন্ত্র যদি সংস্কৃত সাহিত্যে বহুযুগ ব্যাপিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ গভীর মনোহারিতা, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিত্ত-বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারুপাঠও যুগযুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক-কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কতদূর যে মনোরম হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ।

(১৮৫৫'য় প্রায় একসঙ্গে **ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব এবং বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ** নামক গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়।[১৩]

প্রথম গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমারের নীতি ও ধর্মবোধের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বইটিতে লেখক ধর্মের গড্ডলিকা প্রবাহের ঊর্ধ্বে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মানবকল্যাণকর ধর্মীয়বোধে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। বইটি প্রকাশের পূর্বে ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে শ্রীবাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক পঠিত হয়েছিল। পরে ১৮৫৫-তে তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪] ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থটির কিন্তু একটি স্থায়ী মূল্য আছে। রচনার সাবলীলতার জন্যই শুধু নয়, সে মূল্য গ্রন্থটির বক্তব্য বস্তুতেও। উত্তরকালে, অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন হিসাবে যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র উল্লেখ করা হয় তার সম্ভাবনার বীজও যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির মধ্যেই নিহিত। ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দিয়ে যেন ভারতীয় ধর্মের কথা বলেছেন, এই গ্রন্থে।—'পূর্বকালীন পারসীকেরাও', 'মিশর দেশীয় লেকেরাও' কিরূপে ধর্মাচরণ করতো তার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি "আরব ও য়িহুদিদিগেরও পুরাবৃত্ত" পাঠ করে তাদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বলেছেন। এই সর্বদেশীয় উপাসনা-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—

> "ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রদেব, তৎপরে বোধ হয় ব্রহ্মা, পরিশেষে শিব ও বিষ্ণু সর্ব্বদেবের অধীশ্বর ও অগ্রগণ্য বলিয়া অর্চ্চিত হইয়া আসিয়াছেন"[১৫]

'বাষ্পীয় রথারোহী' (১৮৫৫) বইটিও ছোট। মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তিকা। নামপৃষ্ঠায় ইংরেজিতে লেখা আছে 'Directions for a Railway Traveller', বাংলায় লেখা আছে 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' 'অর্থাৎ যাঁহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাঁহাদের তৎসংক্রান্ত বিঘ্ননিবারণের উপায় প্রদর্শন।' গ্রন্থখানির শেষে হাওড়া বালীগঞ্জ 'আপ' 'ডাউনে'র গাড়ী যাতায়াতের সময় ও গাড়ী ভাড়ার উল্লেখসহ একটি চার্টও প্রস্তুত করে দিয়েছেন। গাড়ীভাড়া গাড়ীর 'কামরা'র শ্রেণী অনুযায়ী; যেমন, হাওড়া থেকে বর্দ্ধমানের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৮।০ আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৲ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৲। এই পুস্তিকাতে স্টেশন, এই ইংরেজি শব্দের পরিবর্তে 'আড্ডা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমান পর্বের আলোচ্য শেষ দুটি বই 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। 'ধর্ম্মনীতি'র ভূমিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"ধর্ম্মনীতির প্রথমভাগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।"[১৬]

লেখকের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে 'ধর্ম্মনীতির' পরিকল্পনা লেখকের বেশ বড়ই ছিল, এবং একাধিক খণ্ডাকারে তা প্রকাশও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'ধর্ম্মনীতি'র দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ আর দেখা যায় নি। সম্ভবত শারীরিক অসুস্থতার জন্য একাজ তিনি শেষ করতে পারেন নি। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেনও—

"এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি ইহার প্রচার বিষয়ে একেবারেই নিরস্ত ছিলাম পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল। ইহা যেরূপ সংশুদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার মানস ছিল, শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত তাহা কোনরূপেই হইয়া উঠিল না।"[১৭]

এই পর্যায়ের শেষ আলোচ্য পুস্তক 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬)। অক্ষয়কুমারের জীবৎকালেই বইটির চতুর্দশ মুদ্রণ হয়েছিল। বইটির প্রথম প্রকাশের ঠিক একবৎসর পরে গ্রন্থখানির ভূমিকায় লেখা হয়েছে, "এক্ষনে উহা অষ্টমবার মুদ্রিত হইল।" ছাত্রপাঠ্য পুস্তক হিসাবে এ গৌরব কম নয়। "'পদার্থ বিদ্যা' নানা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত" হয়েছে একথা সত্য। উইলিয়ম ইয়েট্সের 'পদার্থ বিদ্যার সার' (১৮২৫) বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। 'কৃমি', 'মৎস্য', 'পুষ্প' ইত্যাদি পদার্থ বিদ্যার বহির্গত বিষয়ও এ গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। জন্ ম্যাক রচিত 'কিমিয়া-বিদ্যার সার' (১৮৩৪) বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য রসায়ন-শাস্ত্রের গ্রন্থ; কিন্তু বাঙ্গালী-রচিত প্রথম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই অক্ষয়কুমারের 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬)। 'জড় ও পদার্থ', 'পরমাণু', বিভিন্ন প্রকার 'আকর্ষণ', 'প্রবাহ' প্রভৃতি পদার্থবিদ্যাবিষয়ক একাধিক আলোচনা ও তার সংজ্ঞা ও

ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এ গ্রন্থে বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

পদার্থ বিদ্যার পর দীর্ঘদিন অক্ষয়কুমার আর কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। ১৮৫৬-র পর ১৮৫৯-এ 'চারুপাঠে'র তৃতীয় ভাগটি কেবলমাত্র প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডটিতে অক্ষয়কুমারের রচনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্য ও তথ্যের একনিষ্ঠ লেখক অক্ষয়কুমার আলোচ্য গ্রন্থ-ভাগে সাহিত্যবিষয়ক একটি দীর্ঘ রচনা তিনটি 'প্রস্তাবে' লেখেন। রচনাটির লিখনভঙ্গীতে এবং একটি প্রস্তাবের বিষয়-পরিকল্পনায় বিদেশী লেখকের প্রভাব লক্ষিত হয়। 'স্বপ্নদর্শন' এই সাহিত্যবিষয়ক রচনাটি ব্যতীত এ গ্রন্থের অন্য সব কটি রচনাই পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি থেকে ছাত্রবোধ্য করে সম্পাদিত করা মাত্র।[১৮] 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগের 'গ্রহণ', 'উল্কাপিণ্ড', 'মেঘ ও বৃষ্টি', ও পৃথিবীর আকার রচনা-চারটি অক্ষয়কুমারের 'ভূগোল' গ্রন্থের অন্তর্গত বলে মনে হয়। 'মিত্রতা', 'বিহঙ্গমদেহ', 'বায়ুসেবন ও গৃহপরিমার্জন', 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য' প্রভৃতি রচনাগুলি আবার 'ধর্ম্মনীতি' ও 'বাহ্যবস্তু'র অন্তর্গত রচনা।

অক্ষয়কুমারের রচনার তৃতীয় পর্বের শুরু আরো দশ এগার বৎসর পরে ১৮৭০-এ। (১৮৫৯-১৮৭০-র কালগত ব্যবধান দশ বৎসরের)। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় আরো তের বৎসর পর ১৮৮৩-তে। এইচ. এইচ উইলসনের 'হিন্দু রিলিজিয়াস সেক্টস' অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থ পরিকল্পনার মূলে ছিল বলে একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। উইলসনের 'হিন্দু রিলিজিয়াস সেক্টস' যে সকল প্রবন্ধ-সূত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত, অক্ষয়কুমার সেই সমস্ত আকর-প্রবন্ধগুলিও পাঠ করেছিলেন ; উইলসন উক্ত বিষয়ে মূলত দুটি প্রবন্ধ 'এসিয়াটিক রিসার্চে'র ১৬, এবং ১৭ সংখ্যায় লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধ-দুটি পরে '**রিলিজিয়াস সেক্টস্ অফ দি হিন্দুস্**' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৯] কিন্তু এ গ্রন্থটি উইলসনেরও নিজ চিন্তার মৌলিক কোন রচনার নিদর্শন নয়। ঐ বিষয়ক বিভিন্ন সূত্রাদি অবলম্বনে (যেমন কাশীর রাজা শীতল সিংহ এবং কাশী কলেজের অধ্যক্ষ মথুরানাথ

ফারসী ভাষায় এ বিষয়ে দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন) রচিত। হিন্দী 'ভক্তমাল' ও তার টীকার কথাও এ প্রসঙ্গে মনে করা যায়। অক্ষয়কুমার এই মূল সূত্রগুলিও দেখেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়কুমার নিজের চেষ্টায় আরও নূতন সূত্র, নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র প্রথম ভাগের বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ তিনি যে ভাবে সংগ্রহ করেন সে সম্পর্কে লিখেছেন—

> "বিথ্বল ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী, প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগ্রহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।"[২০]

উইলসন ও অক্ষয়কুমারের রচনার পারস্পরিক প্রভাব, মিল বা স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের ইতিহাসবিষয়ক রচনার পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তবে উভয় লেখকেরই কৃতিত্ব এই যে, শাস্ত্রীয় সীমার বাইরে মানবজীবনরসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মেরও যে একটি জীবন্ত রূপ আছে তার একটি সর্বজনবোধ্য পরিচিতি তাঁরা দিতে পেরেছেন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, বেদ পুরাণের স্থান নির্দেশ করার মত শাস্ত্রীয় আলোচনা নয়, ভারতীয় জনজীবনের মধ্যে আচরিত যে ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র পরিচিতি এ গ্রন্থের উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অক্ষয়কুমার প্রথম বাঙ্গালী লেখক যিনি বাংলা-ভাষায় প্রথম এই জীবনাশ্রয়ী ধর্মবোধের বিশদ বিবরণ উদ্ধার করে এক মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ-গ্রন্থ তাঁর জীবন-ভর জ্ঞানতৃষ্ণার ফলশ্রুতি। বিশেষ কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি প্রেম নয়, ভারতীয় ধর্মজীবনে আচরিত সত্যগুলির উপরেই তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,' ধর্মময় ভারতের গবেষণালব্ধ ইতিহাস। ১৮৭০-'৮৩ তের বৎসরে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডও রচনার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু মৃত্যুর অমোঘত্বে সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।[২১] অসমাপ্ত ইতিহাসের 'ভারতপথিক' অক্ষয়কুমার। এই অসমাপ্তির মধ্যেও তিনি উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা রূপে স্থান পাবার যোগ্য।

বিষয় অনুযায়ী অক্ষয়-রচনাবলীর নিম্নলিখিত বিন্যাস সম্ভব।

	বিষয়	গ্রন্থ
১	নীতি	ধর্মনীতি, ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব, বাহ্য-বস্তু, চারুপাঠ (১, ২, ৩ ভাগ)
২	সাহিত্য	ডেভিড্‌ বক্তৃতা, চারুপাঠ (৩) : স্বপ্নদর্শন বিষয়ক রচনা।
৩	বিজ্ঞান	ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, চা· পা. (১, ২, ৩), বাষ্পীয় রথ।
৪	ইতিহাস	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার।

এই বিভাগ অনুসারে চারুপাঠের স্থান প্রথম তিনটিতেই আছে। বহুবিষয়ক রচনার একক গ্রন্থ হল চারুপাঠ। তিনটি খণ্ডে রচিত এই পুস্তকের মোট রচনা সংখ্যা ৫৭টি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি, এই তিন প্রধান শ্রেণীর মধ্যে কোন রচনা ক'টি এবং কোন শ্রেণীর অন্তর্গত এবারে তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল।

গ্রন্থভাগ	নীতি	বিজ্ঞান	সাহিত্য	মোট
১ম	৯	১৫	×	২৪
২য়	১০	১০	×	২০
৩য়	৩	৯	১	১৩
১, ২, ৩, একত্রে	২২	৩৪	১	৫৭

চারুপাঠের সমস্ত রচনা কোনটি কোন শ্রেণীতে বিভক্ত তারও বিস্তৃত পরিচয় পাদটীকায় দেওয়া গেল।[২২]

দেখা যাচ্ছে 'চারুপাঠে'র সমস্ত রচনার মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা সর্বাপেক্ষা বেশী। নীতিবিষয়ক রচনার সংখ্যা এর পরেই। সাহিত্যবিষয়ক রচনার সংখ্যা সব চেয়ে কম—তিনটি প্রস্তাবে বিভক্ত দীর্ঘ একটি রচনামাত্র। অক্ষয়কুমারের মানসিকতার পরিচয় সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত এই সংখ্যা থেকেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-অনিসন্ধিৎসু মানসিকতায় তিনি সাহিত্য-অনুশীলনে বোধহয় খুব বেশী উৎসুক ছিলেন না।[২৩] বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা বলতে 'চারুপাঠে'র (৩য় ভাগ) 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক 'কীর্তি', 'ন্যায়' এবং 'বিদ্যা' এই তিন প্রস্তাবে যে দীর্ঘ রচনাটি, একমাত্র সেটিকেই বোঝায়। 'ডেভিড্ সাহেবের-বক্তৃতা'য় (১৮৪৫) ভাষণকলার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সাহিত্যিক রচনার গভীরতা এবং সাহিত্যিক অভিমত, বা আলোচনা বিশেষ নেই। অক্ষয়কুমারের একমাত্র সাহিত্যিক রচনা প্রকৃতপক্ষে তাই, 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক 'চারুপাঠে'র (৩য় ভাগ) রচনাটি। কিন্তু এ রচনাটিও আগাগোড়া মৌলিক রচনা নয়, জোসেপ্ এ্যাডিসনের (১৬৭২-১৭১৯) '**ভিসন্ অফ্ মির্জা**'র আদর্শে রচিত; এবং বিশেষত 'স্বপ্নদর্শন : ন্যায় বিষয়ক' প্রস্তাবটির সঙ্গে 'ভিসন অফ্ জাস্টিস্' অধ্যায়ের সাদৃশ্য খুবই চোখে পড়ে। এ বিষয়ে ক্রমশ বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। '**স্পেক্টেটর**' (১৭০৯) পত্রিকায় এ্যাডিসনের '**ভিসন্ অফ্ মির্জা**' প্রকাশিত হত।

রচনা-পরিকল্পনার দিক থেকে 'স্বপ্নদর্শন' এবং 'ভিসন অফ্ মির্জা' উভয়ত এক। উত্তমপুরুষ একবচনে আরম্ভ এ্যাডিসনের '**এ ভিসন্ অফ্ জাস্টিস**' অধ্যায়ের পাশে অক্ষয়কুমারে 'স্বপ্নদর্শন : ন্যায় বিষয়ক' প্রস্তাবের তুলনা করলে দেখা যায়, রচনা-দুটিতেই স্বপ্নদর্শক তাঁদের স্বপ্নদর্শনের একটি পূর্ব পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিকার না থাকায় উভয়েই বেদনাক্লিষ্ট হয়েছেন, এবং সে সম্পর্কে গভীর ভাবে ভেবেছেন। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। 'এ্যাডিসনে'র স্বপ্নদর্শনের পূর্বেকার পরিবেশ-বর্ণনায় লেখক লিখছেন—

> "I was last week taking a solitary walk in the garden of Lincoln's Inn......"

অক্ষয়কুমার স্বপ্নদর্শনের পূর্বে যে পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা হল—

> "গত দিবস যামিনী-যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্তী গৃহে কতক-

গুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক অগ্নি-সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কাল-যাপন করিতেছিলাম।"

লিঙ্কনের পান্থশালার বাগানের নির্জনতা আর যোগমায়ার মন্দিরের কাছে নিশীথ নির্জনতার পারিপার্শ্বিক দূরত্ব আরো হ্রাস হয়েছে উভয়ের অন্যায়-বিরোধী মানসিকতার সমতাবোধে। Addision'র স্বপ্নদর্শক বলেছেন—

"I was repining at the suddden rise of many persons who are my juniors, and indeed, at the unequal distribution of wealth, honours, and all other blessings of life. I was lost in this thought."

অক্ষয়কুমারের স্বপ্নদর্শনে বলা হচ্ছে—

"এই সমুদয় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলাম,…। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়-আচরণ ভাবিতে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দর রূপে নিদ্রা হইল না।"

অক্ষয়কুমারের স্বপ্নদর্শনের বর্ণনা এক প্রতারিত গরীব বাঙালী ব্রাহ্মণ এবং রাজরোষে পতিত, কর্মচ্যুত, লাঞ্ছিত দুটি তরুণের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী শোনাতে বিকশিত। Addison'র ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিকারের ভাবনা জেগেছে তাঁর স্বপ্নদর্শকের অযোগ্য, পরিচিত ব্যক্তিদের ভাগ্যোন্নতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে। উভয়েই কিন্তু জগৎ জুড়ে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকারহীন বিস্তারে সংক্ষুব্ধ হয়েছেন।

Addison ও অক্ষয়কুমার, উভয়েরই স্বপ্নের শুরু নক্ষত্রখচিত আকাশ আর সেই আকাশোদ্ভূত এক অলৌকিক মূর্তি-কল্পনায়। Addison লিখেছেন,

It happend to be a freezing light, which had purified the whole body of air into such a bright transparent ether, as made evry constellation visible, and at the same time, gave such a particuler glowing to the stars, that I thought it the ichest sky I had ever seen.

Me thought I saw the same azure sky diversified with the same glorious luminaries which had entertained me a

little before I fell asleep. I was a looking very attentively on that sign in the heavens which is called by the name of balance, when on a sudden, there appeared in it an extraordinary light, as if the sun should rise at midnight, By its increasing in breadth and lusture, I soon found that it approached towards the earth ; and at length could discern something like a shadow hovering in the midst of a gret glory, which, in a little time after, I distinctly percieved to be the figure of a women.

আর অক্ষয়কুমার ?

"আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ-তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই আশ্চর্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে লাগিল। অনুভব হইল, যেন সূর্য্য-মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল।"

উভয়ের অবলোকনে পার্থক্যটি শুধু দর্শিত মূর্তি-পরিকল্পনায়। Addison'র স্বপ্নের মূর্তিটি নারীর (figure of a woman), আর অক্ষয়কুমারের স্বপ্নের মূর্তিটি পুরুষের ('পুরুষছায়া'র)।—Addison ও অক্ষয়কুমারের স্বপ্নে দর্শিত মূর্তি-দুটির পরিচয় ও রূপবর্ণনায়ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। Addison বলেছেন—

"I fancied at first, it might have been the angel, or intelligence that guided the constellation from which it descended, but upon a nearer view, I saw about her all the emblems with which the Goddess of justice is usually described," "She held in her hand a mirror, endowed with the same qualities as that which the painters put into the hand of truth."

অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট দেখিলাম, শুভ্রকান্তি, শুভ্রমাল্যাদি-বিশিষ্ট শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ড হস্তে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল।"

Addison বলছেন—

Her countenance was unspeakably awful and majestic, but exquisitely beautiful to those whose eyes were strong enough to behold it;

অক্ষয়কুমারও লিখছেন—

"অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করতে না পারিয়া, ভীতচিত্ত হইল; আর যিনি যিনি সহিষ্ণুতা প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দর-রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয়রূপে প্রকাশিত হইলেন।"

উভয়ের রচনার কোন কোন ক্ষেত্রে পংক্তি অনুযায়ী মিল পর্যন্ত লক্ষিত হয়, যেমন: অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"যখন তিনি ভূমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তারদ্বারা আপনার মহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানা বর্ণভূষিত ও সর্বলোকের সুখদৃশ্য করিয়া বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল।"

Addison লিখছেন—

"When she had descended so low as to be seen and heard by mortals, to make the pomp of her appearance more supportable, she through darkness and clouds about her that tempered the light into a thousand beautiful shades and colours, and multiplied that lustures which was before too strong and dazzling, into a variety of milder glories."

আবার,

"The handsome, the strong, and the wealthy immediately pressed forward; but not being able to bear the splendour of the mirror, which played upon their faces, they immediately fell back among the crowd,"

অক্ষয়কুমারের বর্ণনা—

"রূপবান, বলবান ও ধনবান মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে পরাঙ্মুখ হইলেন।"

Addison এবং অক্ষয়কুমার উভয়ের স্বপ্নদর্শনে মানবজীবন ও জগতের অন্যায়-অবিচারের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। সমাজজীবনের এই অন্যায় অবিচার প্রতিরোধের জন্য উভয়েই সমাজের সকল মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। Addison লিখেছেন—

"They were drawn up in three bodies : in the first, were the men of virtue, in the sceond, men of knowledge; and in the third, the men of business.''

আর অক্ষয়কুমার বলেছেন—

"সেই সকল মহাত্মারা পর্যায়ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডয়মান হইলেন। পরম হিতৈষী পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও বিষয়-নিপুণ ব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন।"

Joseph Addison'র '*Vision of Mirzah*'র সঙ্গে অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ তৃতীয় খণ্ডের (১৮৫৯) অন্তর্গত স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অক্ষয়কুমার Addison'র রচিত *Vison of Mirzah*'র অবিকল অনুবাদ ও অনুসরণ করেন নি, তাঁর 'স্বপ্নদর্শন' অনেক স্থলে তাঁরই। যেমন—

১. "আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষযুক্ত মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি

বাঙ্গালা দেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোকযাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া, তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে।" —(চা. পা. (৩): স্বপ্নদর্শন, ৮৩-৮৪)।

২. "কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থকর্তা এই শ্রেণীভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।" —(তদেব, ৯০)

৩. "আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব। তাঁহারা নিরুপবীত হীন জাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয়, সন্তপ্ত হইলেন।" —(তদেব, ৯১)।

৪. "কতিপয় ইংরাজ-জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায়-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মপুরুষের ন্যায়রূপ দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।" —(তদেব, ৯৩)।

বিভিন্ন আলোচকই অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন' প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে Addison-এর *The Vision of Mirzah*-র প্রভাব বা ঐক্যের কথা বলেছেন; কিন্তু এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেন। (ভূমিকা, চা. পা. ৩)। প্রকৃতপক্ষে Addison'র অন্যান্য কোন রচনার সঙ্গে স্বপ্নদর্শনের ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকলেও (যথা, *Vision of Justice*) *The Vision of Mirzah*'র সঙ্গে পার্থক্যটিই লক্ষ্য করার মত। অক্ষয়কুমারের কাহিনী স্বপ্নের মধ্যে। Mirzah'র Vision সম্পূর্ণ অন্য। কাইরোতে লেখক বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন, তার একটির নাম *The Vision of Mirzah*। সেই পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ তিনি অনুবাদ করে দিয়েছেন। মার্জা বাগদাদ পাহাড়ের ওপরে যখন ঈশ্বরচিন্তায় সময় কাটাচ্ছিলেন তখন জীবনের অসারতার চিন্তা তাঁকে গভীর ভাবে অবসন্ন করে তুলল। সেই সময় স্বর্গীয় বাদক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে এই জীবনের অসারতার প্রকৃত কারণ ও রূপ তাঁকে দেখালেন।—অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ঐক্য আছে রূপক

নির্মাণের দিক থেকে। এখানে দুঃখের উপত্যকা (Vale of Misery)। বিভিন্ন সেতুর নাম Envy, Superstition, Despair, love প্রভৃতি। কাজেই কাহিনীর উপস্থাপনায় এবং রূপক-বর্ণনায়, উভয়ক্ষেত্রেই অক্ষয়কুমার সচেতন ভাবেই Addison থেকে পৃথক হবার চেষ্টা করেছেন, যেমন সর্বত্রই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রাখার চেষ্টা করেছেন—কি বৈজ্ঞানিক রচনায়, কি ঐতিহাসিক রচনায়। এই Technique-এ বহু লেখকই লিখেছেন। বাংলা দেশে আধুনিক কালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও এ-ভঙ্গীতে গল্প লিখেছেন।

সাহিত্য-বিষয়ক এই রচনাটিতে সাহিত্য-আদর্শ সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের অন্তত একটি যে স্পষ্ট ধারণা ছিল তা বোঝা যায়। বিদ্যার জগতে তিনি তিন ধরনের লোকের উল্লেখ করেছেন। যথা—

১. "সর্ব্বোত্তম ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি"

২. "কেবল পরিচিত গ্রন্থপাঠ দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শী" এবং

৩. "অনেকানেক গ্রন্থপাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচারশক্তি নাই।"

বাংলা সাহিত্যে এই তিন শ্রেণীর প্রয়োগ সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের আপত্তি ছিল। সেকালীন অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল। কেবল আলঙ্কারিক রূপচর্চায় যে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয় তার অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যেরও যে একটা দিক আছে সে সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের স্পষ্ট ধারণা ছিল। 'স্বপ্নদর্শন : ন্যায় বিষয়ক প্রস্তাবে'র স্বপ্নদর্শক স্পষ্টই দেখেছেন, পূর্ববর্ণিত বিদ্যা-জগতের তিনটি শ্রেণীর যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য "কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থ-কর্ত্তা" ক্রমে দাঁড়ালে "ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।" সে শ্রেণীতে কোন স্থান হল না। "এই দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া; আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃসৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারী না হইয়া তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়?" ধর্ম্মপুরুষের মুখে তাৎকালিক বাংলাসাহিত্য-রচয়িতাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্যও শোনা যায়। যেমন—

"তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকেনা,

ভাবের প্রগাঢ়তা থাকেনা, এবং রচনাও পরিপাটি শুদ্ধ হয় না।"
—চা. পা. (৩), ৯১।

সাহিত্য, ভাব ও ভাষার দ্বৈতরূপে অদ্বৈতসৃষ্টি,—অক্ষয়কুমারেরও এরূপ প্রত্যয় ছিল। ধর্মপুরুষের মুখ দিয়ে এ-সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন—

"আর অনেকে যৎকুৎসিৎ অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন।" —(তদেব, ৯১)।

যে লেখক যে বিষয়ে সাহিত্যচর্চা করেন তাঁর সে-বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য বলে অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করতেন।—

"বিশেষত যিনি যে বিষয়ে রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিত রূপে শিক্ষা ও তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন।"
—তদেব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত, বিজ্ঞান-সাহিত্য'র ক্ষেত্রে পল্লবগ্রাহীতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বপ্নদর্শকের বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে তাই শোনা যায়—

"যাহারা ভাষান্তরে সামান্যরূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া, বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে, যাহাদের কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহাদের অপমান দেখিয়া, হৃদয়-বিদীর্ণ হইতে লাগিল।"—তদেব।

পাণ্ডিত্যের ব্যর্থ দম্ভের প্রতিও অক্ষয়কুমার সশ্রদ্ধ ছিলেন না। বিশেষত তৎকালীন বঙ্গসমাজে সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে এই ব্যর্থ অহঙ্কার অত্যন্ত উগ্ররূপে প্রকাশ পেত দেখেই সম্ভবত অক্ষয়কুমার আলোচ্য প্রসঙ্গে এই দর্পঙ্কর পাণ্ডিত্যের অভিমানে পূর্ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি শ্লেষ ও বিদ্রূপ করেছেন। লিখেছেন,—"কত কত দীর্ঘ পুণ্ড্রধারী দাম্ভিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র, এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্তে বিস্তর বাগ বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলোপরি ন্যায়-দণ্ড চালনা করিয়া, তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমগ্ন হইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।"—চা. পা. (৩), ৯।

এই ব্রাহ্মণগণ যেমন ছিলেন পাণ্ডিত্যাভিমানী তেমনি ছিলেন জাত্যাভিমানী।

জাতের নামে তাঁরা নৃশংসতায়ও পরাঙ্মুখ হতেন না। মানবপ্রেমিক অক্ষয়কুমার স্বভাবতই এই হীন মনোবৃত্তির বিরোধী ছিলেন। শ্লেষের চাবুকে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়ে তাই লিখেছেন,—

> "আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলব। তাঁহারা নিরুপবীত হীন জাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয়, সন্তপ্ত হইলেন।"

স্বদেশপ্রেমিক অক্ষয়কুমার পররাজ্যলোভী, প্রজাপীড়ক ইংরেজ শাসকবর্গের প্রতিও বিরক্ত ছিলেন। দ্বিধাহীন ভাবে তাই তিনি লিখেছেন,—

> "কতিপয় ইংরাজ জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্যন্ত কেবল সহায়বলে ও বুদ্ধিকৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মপুরুষের ন্যায়রূপ দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।" (চা. পা. (৩), ৯৩)।

অক্ষয়কুমারের স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক এই রচনাটিই একমাত্র লেখা যাতে সাহিত্য-সম্পর্কীয় ভাবনা-চিন্তা স্থান পেয়েছে। সাহিত্য-রচনার রীতি-নীতি, দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেও সচেতন মতামত প্রকাশিত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হয় যে হুবহু অনুকরণে রচিত না হলেও অক্ষয়কুমারের রচনায় লেখকের স্বাধীনতা খুব বেশী নেই। এবং রচনাটি সাহিত্য-বিষয়ক হলেও তার সাহিত্যিক আবরণ উন্মোচন করলে নৈতিক রসাবেদনটাই প্রকট হয়ে পড়ে। মানব-চরিত্রের নীতিগত দোষত্রুটির কারণ ও ফলাফল নিয়েই রচনাটি লিখিত। সম্ভবত Addison'র রচনার মধ্যে অক্ষয়কুমার এই মানবহিতকারী কল্যাণ-ধর্মের বাণীই শুনতে পেয়েছিলেন, তাই সম্ভবত *Vision of Mirzah*'র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

'ডেভিড-বক্তৃতা' (১৮৪৫) অক্ষয়কুমারের সাহিত্যক রচনার আর একটি নিদর্শন মাত্র। এই পুস্তিকাটি সমগ্র অক্ষয়-রচনাবলীর ক্ষুদ্রতম রচনা, মাত্র আটটি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১জুন, ১৮৪৫-এ ডেভিড সাহেবের তৃতীয় সাম্বৎসরিক সম্বর্দ্ধনাসভায় অক্ষয়কুমার কতৃক পঠিত বক্তৃতার পুস্তকরূপ এটি। রামগোপাল ঘোষের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় এই সভানুষ্ঠান হয়েছিল।

অক্ষয়কুমারের বক্তৃতার পরেই বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' এ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করছেন—

> Ba-oo Kisary Chand Mitra then rose and said, Mr. Chairman, I am sure you will agree with me that the discourse just read bv my friend does honour both to his head and to his heart. The subject which it embraces—a subject fraught with the utmost practical importance has been ably, eloquently, and feelingly treated by him. It is distinguished by a chastilty of diction, a sweetness of style, and a felicity of illustration, seldom to be met with in Bengali writers.[২৪]

অক্ষয়কুমারের দেশপ্রীতি, সামাজিক দুরবস্থায় ভাবনা-চিন্তা, এবং জ্ঞানচর্চার দুরবস্থা-জড়িত বেদনাবোধ আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রারম্ভেই প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন—

১. "আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে.—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে।"

২. "পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন।"

ডেভিড হেয়ার এদেশে শিক্ষার প্রসারতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার সেবিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

> "তিনি আমাদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।" (ডেভিড বক্তৃতা ; পৃঃ ৭-৮)।

'বিদ্যা অমূল্যধন' (চারুপাঠ ১, ১) অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের একটি বাক্যই কেবল নয়, এ তার সমাজচিন্তার একটি প্রত্যয়ও। অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের

একটি বিশ্বাস। বাংলা তথা ভারতের জাগরণযুগের অন্যতম বুদ্ধিবাদী মানুষ অক্ষয়কুমার ; তাঁর কর্ম ও চিন্তার জগতের সীমা ও সিদ্ধি এই নবজাগরিত বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতীয় মুক্তিতে জ্ঞানচর্চার স্থান সর্বাগ্রে, বিদ্যানুশীলন মানুষের সর্বার্থসাধক, প্রয়োজন ;—অক্ষয়কুমার তা মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সম্ভবত সে জন্যেই ডেভিড সাহেবের শিক্ষানুরাগী ক্রিয়াকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি এত উৎসাহী ছিলেন। এই বক্তৃতাটি তাঁর সেই মানসিকতারই পরিচায়ক।

১। অক্ষয়কুমারের প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার (১৯০১) পুস্তকটি উক্ত বিষয়ক মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠার একটি বক্তৃতার ২০৯ পৃষ্ঠার পুস্তক রূপ। অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পোনের বৎসর পর তাঁর পুত্র রজনীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক রচনার সঙ্গে গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২। যেমন, তরুণবয়স্কদের প্রতি উপদেশ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির…(১ খণ্ড) থেকে সঙ্কলিত। তেমনি কীটাণু, তাড়িত-বিদ্যুত-বজ্রাঘাত রচনা-দুটিও 'পদার্থ বিদ্যা'র অন্তর্গত। বা মিত্রতা রচনাটি ধর্মনীতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩। জন পিয়ার্স, ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮১৮)
জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়, ২য় সংস্করণ (১৮১৯)
ফেলিক্স কেরী, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮২০)
জে. ডি. পিয়ারসন্‌, ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক প্রস্তাব (১৮২৪)
উইলিয়ম ইয়েটস, পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৫)

৪। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, ১৯৩৪, ৫২।

৫। তদেব ৫৩।

৬। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (৩ ভাগ), কলকাতা, ১৯৫৯, ১১৬-'১৭।

৭। তদেব, (২ ভাগ), ৭৫।

৮। *Bengal Harkara*, 7 June, 1845, *The Hare Anuiversary meeting*,

(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত, ডেভিড বক্তৃতা (১৮৪৫), বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।

(খ) Peary Chand Mitra, *A Biographical Sketeh of Dvaid Hare* (1877) 1949 বঙ্গবাসী সংস্করণ, '97,

David Hare (1775—1 June 1842) 1800 খৃঃ-এ ভারতবর্ষে আসেন।

৯। বাহ্যবস্তু, (১ ভাগ) ১৮৫১, বিজ্ঞাপন, ১।

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আত্মকথা।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চোখের বালি, কলকাতা, ১৯০৩।

১২। বিনয় ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, (৩ খণ্ড) কলকাতা, ১৯৫৯, ৩১২।

১৩। অক্ষয়কুমার দত্তের ভূগোল (১৮৪১), বিদ্যাদর্শন পত্রিকার (১৮৪২) মত এই গ্রন্থ দু'খানিও দুষ্প্রাপ্য। জাতীয় বা সাধারণ কোন পাঠাগারে বই দুটি পাওয়া যায় না। লণ্ডনের British Museum-এ এবং India office Libray-তে বই দুটি সংরক্ষিত আছে। বর্তমান লেখক Photo Stat copy করে বই দুটি এনেছেন। ১৯৬৬ শারদীয় 'এক্ষণ' ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সম্পাদনা সহ বাষ্পীয় রথের পুনর্মুদ্রনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪। ১৮৫৪তে ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করা হত। অক্ষয়কুমারের এই পুস্তকখানি ঐ বক্তৃতার পঞ্চম সংখ্যক বক্তৃতার পুস্তকরূপ মাত্র।—

ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাবের ১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব', ৬।

১৬। 'ধর্ম্মনীতি', বিজ্ঞাপন, ১

১৭। অক্ষয়কুমার দত্ত, 'ধর্ম্মনীতি' ১৮৫৬. বিজ্ঞাপন ১

১৮। 'ধর্ম্মনীতি', 'বাহ্যবস্তু', 'পদার্থবিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের থেকেই বেশির ভাগ রচনা সম্পাদন করা হয়েছে।

১৯। ভা. উ. স. (১), ১।

H. H. Wilson, (1786-1860),

২০। তদেব, উপক্রমণিকা।

২১। ক. জৈন, হিতৈষী (পৌষ-চৈত্র) (বাং ১৩০৫)

খ. বাবাবলি উপাসক-সম্প্রদায়, তদেব (মাঘ) ১৮৯৮ (বাং ১৩০৫)

গ. শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, সাহিত্য (বৈশাখ) ১৮৯৯ (বাং ১৩০৬)

ঘ. ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রবাসী (শ্রাবণ) ১৯১০ (বাং ১৩১৭)

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্রঃ সা. সা. চ. ১ (১২), ৩৬।

২২। ১. রচনার নাম, ২. যে বিষয়ের অন্তর্গত তার সংখ্যা, ৩. বিষয়ের আদি অক্ষর এই ক্রমে সজ্জিত হল। যথাঃ স্বপ্নদর্শন ৩য় বিষয় ভাগের অন্তর্গত সাহিত্যবিষয়ক রচনা=স্বপ্নদর্শন (৩) সা।

২৩। 'চারুপাঠ' ১ ভাগ (১৮৫৩)

বিদ্যাশিক্ষা (১) নী; আগ্নেয়গিরি (১) বি; সিন্ধুঘোটক (১) বি; দয়া (১) নী; বীবর (১) বি; 'তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ' (১) নী; জলপ্রপাত (১) বি; সন্তোষ (১) নী; পৃথিবীর আকার (১) বি; কুসংসর্গ (১) নী; পুরুভুজ (১) বি, পৃথিবীর পরিমাণ (১) বি। বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম (১) বি। উষ্ণ প্রস্রবণ (১) বি। আত্মপ্রসাদ (১) দীপমক্ষিকা

(১) বি। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন (১) নী; পৃথিবীর গতি (১) বি; আত্মগ্লানি (১) নী; মাধ্যাকর্ষণ (১) বি। —মোট ২৪টি।

'চারুপাঠ' ২ ভাগ (১৮৫৪)

নীতি চতুষ্টয় (২) নী; বল্মীক (২) বি; সন্তোষ ও পরিশ্রম (২) নী; হিমশীলা (২) বি; মুদ্রাযন্ত্র (২) বি; ব্যোময়ান (২) বি; 'পিতামাতার প্রতি ব্যবহার' (২) নী; 'দিগদর্শন' (২) বি; 'অসাধারণ অধ্যবসায়' (২) নী; প্রবাল কীট (২) বি; 'অসাধারণ স্মারকতা শক্তির উদারণ' (২) নী; 'পরিশ্রম' (২) নী; 'তত্র' (২) বি; 'জান ফ্রেড্‌রিক ও বর্লিন' (২) নী; 'আগ্নেয়া (২); বি; প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার' (২) নী; 'সৌরজগৎ' (২) বি; 'সত্যকথন ও সদাচরণ' (২) নী; তাপমান (২) বি। জন্মভূমি (২) নী। —মোট ২০টি।

চা. পা (৩), ১৮৫৯।

স্বপ্নদর্শন (৩) সা। কীটাণু (৩) বি। মিত্রতা (৩) নী। মেঘ ও বৃষ্টি (৩) বি। তাড়িত-বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত (৩) বি। বিহঙ্গম দেহ (৩) বি। উল্কা পিণ্ড (৩) বি। বায়ুসেবন ও গৃহ-পরিমার্জন (৩) বি। জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা (৩) বি। জোয়ার ভাঁটা (৩) বি। ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড (৩) বি। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তারতম্য (৩) বি। —মোট ১৩টি রচনা।

[* "পুরাণে ধর্মের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত আছে"।] (চারুপাঠ-৩ : স্বপ্নদর্শন, ন্যায়বিষয়ক : ৮৭)।

২৪। Peary chand Mitra, *A Biogriphical Sketch of David Hare* (1877) 1949 Edn : 97,99,

অক্ষয়কুমার, 'ডেভিড-বক্তৃতা' (১৮৪৫) ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়

অক্ষয়কুমার : বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা

উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কোন বৈজ্ঞানিক রচনা ছিলনা। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায়, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞানচর্চার শুরু। বেদাঙ্গ যুগে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার অস্পষ্টরূপ লক্ষিত হয়। আচার্য লগধ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রণেতা ছিলেন। ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের চারটি যে উপবেদ আছে—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও শিল্পবেদ বা তন্ত্রবেদ তার মধ্যে আয়ুর্বেদে আটটি ভাগের[১] শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র, বাজীকরণ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছে।[২] খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পালকাপ্য'র 'হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ' নামক হস্তিচিকিৎসার বইও ছিল বলে অনুমান করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'হস্তিপ্রচার' অধ্যায়ে যে হস্তিচিকিৎসার কথা আছে তারও পূর্বে তাহলে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা ছিল প্রধানত সংস্কৃত শ্লোকে, সামান্য কিছু অংশ ছিল গদ্যে। তাছাড়া পালকাপ্য বাংলা দেশের লোক ছিলেন।[৩] বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে (চর্যা ও মঙ্গল সাহিত্য) বিজ্ঞানচর্চার অল্প-স্বল্প ছবি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এগুলিকে ঠিক বিজ্ঞান সাহিত্যের নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায় না ; এগুলি সমাজ-জীবনের প্রাসঙ্গিক চিত্ররূপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম ফলরূপে বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার শুরু হয়। ১৮১৩-য় বৃটিশ পার্লামেণ্টে কোম্পানীর সনন্দে শিক্ষা সম্পর্কে নূতন নীতি অনুমোদিত হয়। তাতে বলা হল—

> "এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা এবং ইয়োরোপীয় বিদ্যার প্রচারের জন্য কোম্পানি অন্য সকল রকমের খরচ খরচা মিটাইয়া বৎসরে একলক্ষ টাকা খরচ করিবেন।"[৪]

স্থির হল এই টাকার এক অংশ ব্যয় হবে,

> "for the introduction and promotion of a knowledge of the science among the inhabitants of the British territories in India."[৫]

বিজ্ঞানশিক্ষার এই নবোদ্যোগ যাতে কাজে ফলবতী হয় তার জন্য রামমোহন প্রথমাবধি সচেষ্ট ছিলেন। ১৮২৩-এ তিনি লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লিখে জানালেন—

"........But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophv, Chemistry, Anatomy, with other useful Sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."[৬]

১৮১৭-তে হিন্দুকলেজের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হল; গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির পঠন-পাঠন তখন থেকে রীতিমত চলতে থাকলো। কেরি, ম্যার্শম্যান সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য এলেন। পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটানোর জন্য স্কুলবুক স্যোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল (১৮১৭)। স্কুল-পাঠ্য বিজ্ঞানের বই প্রথম প্রকাশ করার কৃতিত্বও এই প্রতিষ্ঠানের।[৭] এই বৎসরেই চু চুড়ার বিদ্যালয়-পরিদর্শক রবার্ট মে-রচিত একটি বাংলা গণিতের বই স্যোসাইটি প্রকাশ করেছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-রচনার প্রথম ঐতিহাসিক দলিল ব্যতীত এ-বইর অন্য কোন মূল্য আর নেই। ১৮১৯-তে হার্লি-সংকলিত আর একটি গণিতপুস্তক প্রকাশিত হয়।[৮] ঐ একই বৎসরে উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্সের ভূগোল-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় (১৮১৯)। জন্ পিয়ার্সের ভূগোল এবং জ্যোতিষ-বিষয়ক কথোপকথনও স্যোসাইটি প্রকাশ করেন (১৮২৪)। কলকাতায় এসে অক্ষয়কুমার পিয়ার্সনের এই ভূগোল ও জ্যোতিষ-বিষয়ক কথোপকথনের গ্রন্থই প্রথম পাঠ করেছিলেন; এবং বাল্যকালে শোনা বিশ্বকার্যের অলৌকিক কারণগুলির অসারতা সম্পর্কে সংশয়হীন হয়েছিলেন, শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি। এই সময় (১৮২৪-২৫) Loason পিয়ার্স স্যোসাইটির পক্ষে বিভিন্ন পশুদের

সম্পর্কে নানা কথা বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করতেন। মাসিক পত্রিকাকারে সেগুলি নিয়মিত প্রকাশিতও হত। দু'মাসে দু'সংখ্যা এইভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৮২৮-এ সবগুলি একত্রে 'পশ্বাবলী' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। রামচন্দ্র মিত্র পরে পশ্বাবলীর আরো ষোলটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র মিত্র হিন্দুস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক স্যোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম ইয়েট্স (১৭৯২-১৮৪৫) ১৮২৫-এ 'পদার্থবিদ্যা সার' রচনা করেন, এবং পাঁচ বৎসর পরে জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩০) নামক আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম পুস্তকটিতে কথোপকথনের ভঙ্গীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থটি ফার্গসুনের ইংরেজী গ্রন্থ *An Easy Introduction to the Astronomy*-র বঙ্গানুবাদ। ডঃ গ্রাণ্টের বইর বঙ্গানুবাদ 'সারসংগ্রহ'ও (১৮৪৪) তিনিই রচনা করেন। ইয়েট্সের মত জন ম্যাক্ নামক মিশনারীও এদেশে এসেছিলেন খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারের আশায়, কিন্তু তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারী কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 'কিমিয়াবিদ্যার সার' নামক একখানি রসায়ন বিজ্ঞানের বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কেমিস্ট্রির বই হিসাবে গ্রন্থটির গুরুত্ব আছে। ১৮১৮-তে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শনের পৃষ্ঠাতেও বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশিত হত। এছাড়া বিদ্যাহারাবলী পরিকল্পনায় ফেলিক্স কেরীর 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' (১৮২০) ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানের বই ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া পঞ্চম সংস্করণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করবেন বলে স্থির করেছিলেন ফেলিক্স কেরি। ৬৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' সেই পরিকল্পনারই প্রথম ও শেষ গ্রন্থ। এই পুস্তক রচনাকালে কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে; যেমন Larva—কীটশাবক, Lenticular—মসুরাকৃতি, Linament—অবয়ব, Neurology—শিরাবিদ্যা, Plaint—নম্য, Spiral—পেচাকৃতি।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত এই সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা বিদেশী লেখকদের; বাঙ্গালী-রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রামকমল সেনের। তাঁর 'ঔষধসার' (১৮১৯) এ গৌরবের অধিকারী। এ পুস্তকে

পঞ্চান্নটি ঔষধের পরিচিতি এবং তাদের ব্যবহার-রীতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বিষয়ক কিছু বাংলা বই রচিত হলেও এ-সকল বইগুলিকে বিজ্ঞান সাহিত্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় না। সাহিত্যের রস এবং বিজ্ঞানের সত্য উভয়ের মিশ্রণে যে বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে ওঠে তার জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানকে সাহিত্যিক রসাবেদনের মধ্যে পরিবেশন করতে যে মানসিকতার প্রয়োজন তা বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-বঞ্চিত অক্ষয়কুমারের ছিল।—

> "তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানে উৎসাহ বোধ করেছেন। বিজ্ঞানে এই উৎসাহ নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে নয়, আত্মিক প্রয়োজনেও। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ফসল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানপ্রিয় বাঙালী সাহিত্যিক।"

জাতীয় প্রয়োজন উপলব্ধি করে অক্ষয়কুমার এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ৩০ এপ্রিল ১৮৪৩-এ অক্ষয়কুমার বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন—

> "আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না,—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, হিন্দুনাম ঘুঁচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শক ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।"[১০]

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল নিম্নরূপ—

১. ভূগোল (১৮৪১)

২. বাহ্যবস্তু (১ ভাগ ১৮৫১, ২ ভাগ ১৮৫৩)

৩. চারুপাঠ (১ ভাগ ১৮৫৩, ২ ভাগ ১৮৫৪, ৩ ভাগ ১৮৫৯)

৪. পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)।

চারুপাঠের তিন ভাগে মোট ৫৭টি রচনার মধ্যে ৩৪টি রচনা বিজ্ঞান-বিষয়ক।[১১] এই সকল রচনা পূর্বে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে (যেমন, ভূগোল, ধর্ম্মনীতি, ডেভিড-বক্তৃতা, পদার্থ বিদ্যা) ছাত্রবোধ্য করে সঙ্কলিত হয়েছে। একমাত্র ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের থেকে কোন অংশ চারুপাঠের কোন ভাগে নির্বাচন করেন নি ; তার কারণ চারুপাঠের শেষভাগ ১৮৫৯-এ প্রকাশিত হয়, এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ। চারুপাঠের ভূগোল-বিষয়ক রচনাগুলি (যেমন, পৃথিবীর আকার, চন্দ্রগ্রহণ, উল্কাপিণ্ড, মেঘ ও বৃষ্টি) সম্ভবত তাঁর ভূগোল বই'র অন্তর্গত। এ অনুমান, সিদ্ধান্ত নয় ; কারণ ভূগোল (১৮৪১) বইটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বকার্যের কারণ সম্পর্কে বাল্যকালেই অক্ষয়কুমার অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন ; ভূগোল (১৮৪১) লিখবার পূর্বে ১৮৩০ বা তার দু'এক বৎসর পরে জে. ডি. পিয়ার্সনের **ভূগোল এবং জ্যোতিষ-বিষয়ক কথোপকথন** (১৮২৪) পাঠ করার সুযোগও পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের যুক্তি, প্রমাণের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর আবাল্য। এই একাগ্রচিত্ত, বিজ্ঞাননিষ্ঠ লেখক তাঁর ভূগোল গ্রন্থে বিশ্বকার্যের বৈজ্ঞানিক কারণই লিপিবদ্ধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক অনুমান।[১২] চারুপাঠের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ভূগোল-বিষয়ক রচনাগুলি অক্ষয়কুমারের রচিত অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যথা—

গ্রহণ (চা. পা. : ৩, ৭৮), জোয়ার ভাঁটা (চা. পা. ৩, ১০৫), ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড (চা. পা. ৩, ১১১), মেঘ ও বৃষ্টি (চা. পা. ৩, ৩০), সৌরজগৎ (চা. পা ২, ৮১, ৯০, ৯৭), চন্দ্র (চা. পা ২, ৫৪), দিগ্‌দর্শন (চা. পা. ২, ৩১), হিমশিলা (চা. পা. ২, ১২), আগ্নেয়গিরি (চা. পা. ১, ৬), জলপ্রপাত (চা. পা. ১, ২৬), পৃথিবীর আকার (চা. পা. ১, ৩২), পৃথিবীর পরিমাণ (চা পা. ১, ৪১), উষ্ণপ্রস্রবণ (চা. পা. ১, ৫৩), জলস্তম্ভ (চা. পা. ১, ৮৪)।

এই রচনাগুলি তাহলে হয় চারুপাঠের জন্য স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয়েছিল, নতুবা অনুমান করতেই হয় যে এগু'লি ভূগোল বইর অন্তর্গত রচনা, চারুপাঠে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ভূগোল বইটি যাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই বইটির ভূমিকা থেকে লেখকের রচনার উদাহরণ তুলেছেন। অক্ষয়কুমারের দৌহিত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও সেই ভূমিকার অংশ তুলেছেন। যথা—

> "ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষায় অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয়না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি আকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্র-সুধা-লোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"[১৩]

দেবেন্দ্রনাথ কিংবা বিদ্যাসাগরের কোন গদ্যরচনা এ-সময়ে প্রকাশিত হয় নি। অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

> "বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনার যতখানি প্রভেদ, তদপেক্ষা এই ভূগোলের অনতিপূর্বে প্রকাশিত যে কোনো গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী।"[১৪]

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১৮৫১, ১খণ্ড : ১৮৫৩, ২খণ্ড) অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। জর্জ কুমের 'Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object' (1828) অবলম্বনে রচিত বলে যে মতবাদ প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে বলা চলে, গ্রন্থটি এ পুস্তকের 'অবিকল অনুবাদ' নয়। গ্রন্থটিকে সুচারুরূপে পাঠোপযোগী করে সাধারণ্যে উপস্থিত করতে লেখককে সাহায্য করেছিলেন বিদ্যাসাগর এবং দেবেন্দ্রনাথ। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকায় লেখক এ বিষয়ে লিখেছেন—

"অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহুপরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালি (ভু) বিচক্ষণ ব্যক্তি, গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।"[১৫]

পাঁচটি অধ্যায়ে ২৪২টি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, প্রথম ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে 'আমিষ ভক্ষণ' সম্পর্কে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকে লেখকের বিজ্ঞান ও মানবজীবন সম্পর্কে যুক্তি ও চিন্তাপূর্ণ মতামতও প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা, 'ভৌতিক' 'শারীরিক', 'মানসিক' এই ত্রিবিধ নিয়মের অধীন এ জগৎ; এবং জগতের সকল অচেতন পদার্থের নাম 'ভৌতিক পদার্থ'। যে নিয়মে এই ভৌতিক পদার্থ চলে তাকে 'ভৌতিক নিয়ম' বলে, যথা—"অগ্নিতে অগ্নিপাক হয়," "জলেতে নৌকা মগ্ন হয়।" যে নিয়মে শারীরিক কার্য চলে তাকে শারীরিক নিয়ম বলে, যেমন—'আহার', 'বৃদ্ধি,' 'হ্রাস'। সর্বশেষে 'মানসিক নিয়মে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "যে নিয়মে জীব আপন সত্তার বোধ অনুভব করে, যে নিয়মে মানুষ 'বুদ্ধিজীবি', তাকে বলে "মানসিক নিয়ম"।

বিজ্ঞান ও মানবজীবনাচরণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন একটি শক্তি আছে বলে অক্ষয়কুমার মনে করতেন। এ গ্রন্থে, জগতের জীব ও জড়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন, "মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু জগতের চেতন ও জড় পদার্থের স্বতন্ত্র নিয়ম থাকা সত্ত্বেও উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল। মানুষ কেবল তার 'ধর্ম্মপ্রবৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি' এবং 'নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি'তে ইতরজন্তু থেকে উচ্চতর সৃষ্টিরূপে বিষয়ের বৈষম্য দূর করতে চেষ্টা করে। মানুষের ধর্ম ও বুদ্ধি তাকে 'নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি' থেকে রক্ষা করে। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে মানসিক নিয়মের সম্পর্কও ব্যাখ্যা করেছেন লেখক; লিখেছেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মে নৌকা জলে ভাসে, প্রকৃতির সঙ্গে এ নিয়ম একসূত্রে গ্রথিত। প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু অপরিবর্তনীয়, স্বতন্ত্র; কিন্তু অন্য নিয়মের সহকারী। যেমন—প্রাকৃতিক নিয়মে মানবদেহ (জড়বস্তুর মত) উপর থেকে নীচে পড়লে আহত হয়, আহত দেহে শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য বেদনা হয়, দেহের বেদনায় মানসিক প্রবৃত্তিও আহত হয়, মন ভাল থাকে না। এইভাবে অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে

মানুষের দেহ মন কী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; এই হল নিয়ম এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রমে বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ। লেখক এই বোধ থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন—

"পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই যে ব্যক্তি জগদীশ্বরকে নির্দ্দয় বলে তাহার অতিশয় ভ্রান্তি।"[১৬]

অতএব "সমুদায় কৌশলই মঙ্গল কৌশল।" দেখা যাচ্ছে এ গ্রন্থে লেখক মানবজীবন ও বিজ্ঞানকে যেমন এক সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিতরূপে বিচার করেছেন, তেমনি আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবজীবনের নিয়ম ঈশ্বর নামক শক্তিতে আশ্রিত, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরেরই নিয়ম মাত্র, এও বলেছেন। লেখকের ভাষায়—

"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বরের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।"[১৭]

ঈশ্বরের নিয়মের রূপ বা আশ্রয় যেমন এই প্রকৃতি ও মানুষ ; তেমনি মানুষের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির 'মানসিক নিয়ম' ও 'শারীরিক নিয়মে'র আশ্রয় বা রূপ মানুষের আচরণজাত কর্ম ; কারণ—

"নিয়ম থাকিলেই অবশ্যই তাহার আশ্রয়স্বরূপ বস্তুবিষয় থাকিবে। জল ও তেজ মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়।"[১৮]

'বাহ্যবস্তু' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩) দু'টি অধ্যায়ে, ২৮৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এ গ্রন্থে ধর্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের ফল ও তার দণ্ড বিধান, ব্যক্তির সুখবোধ প্রাকৃতিক নিয়ম-নির্ভর কিনা ; বিদ্যা ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক-বিচার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই খণ্ডে লেখকের ঈশ্বরচেতনার স্বরূপও উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা যে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা ও মানবদর্শন-সম্পৃক্ত একটি অখণ্ড চেতনা তারও সমর্থন মেলে ; এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার ষষ্ঠ অধ্যায় লিখেছেন—

"এই অখিল সংসাররূপ ভ্রমশূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়।"[১৯]

কিন্তু জগৎ ও জীবনের রহস্য তাঁর নিকট ঐশ্বরিক নয়, যুক্তি ও বুদ্ধিতে

কার্য ও কারণের সম্পর্কে উদ্ঘাটিত ; তাই তিনি স্পষ্ট লিখেছেন—

> "সকল কার্যের কারণ থাকে। ঈশ্বর শুভাশুভ ফল করেন না, কারণানুযায়ী কার্য ঘটে।"[২০]

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তার এই সম্পর্ক বুঝতে বিদ্যাচর্চা প্রয়োজন বলে তাঁর ধারণা। "পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ করা ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য।" সুতরাং অক্ষয়কুমার মনে করেন—

> "অতএব যে সকল প্রচলিত ধর্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য।"[২১]

গ্রন্থটির প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে যেমন আমিষভক্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে তেমনি সুরাপান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।[২২] 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' অক্ষয়কুমারের ধর্ম ও বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার আত্মিক পরিচয়। কেবল বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানব সংসারের সম্পর্কের কথা নয়, মানবাত্মার বিকাশের কথাও এ গ্রন্থের উপজীব্য ; জ্ঞান ও কর্ম, প্রকৃতি ও মানুষ, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা এবং ধর্মসাধনা দুই-ই মানবজীবনের অপরিহার্য বিষয়। অন্তর ও বহির্বিশ্বের সাম্যতেই মানবজীবনের পূর্ণতা ; 'বাহ্যবস্তু' এই পরিপূরকতা, এই পূর্ণতার গ্রন্থ।

জর্জ কুমের *Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object*-র (1828) অনুবাদ যে অক্ষয়কুমার করেন নি, এ গ্রন্থের ভূমিকাতেই তার স্বীকৃতি দিয়েছেন ; জগৎ ও ধর্মবিশ্বাসে উভয়ের প্রভাব সম্পর্কেও এবার বিচার করা দরকার।—'বাহ্যবস্তু' প্রথম ভাগ ১৮৫১-এর ২৩ বৎসর পূর্বে কুমের পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ; অর্থাৎ বালক অক্ষয়কুমার যখন কলকাতায় আসেন (১৮৩০-এ) তার দু'বৎসর পূর্বে কুমের পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হবার পর তাঁর রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয় ; অক্ষয়কুমারের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি (১৮৩৯, '৪০) ; অষ্টম, নবম শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি তখন বিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করতেন। সে সময়ে কুমের উক্ত গ্রন্থ পড়ে তার বস্তু-বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মত বয়স ও জ্ঞানের আনুকূল্য তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ। আর ১৮৪০-৪৩-র মধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, বিদ্যালয়ের পড়া ছাড়তে হয়, জীবিকার খোঁজে ব্যস্ত হতে হয় ; ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্য লাভ এবং

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সম্পর্কে আসেন। মাঝে ১৮৪২-এ বিদ্যাদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরই মধ্যে ১৮৪১-এ ভূগোল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১৮৩৯-'৪৩-র চার পাঁচ বৎসর অক্ষয়কুমারকে অতি ব্যস্ততায় কাটাতে হয়। এই কর্মমুখর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুমের ঐ পুস্তক পাঠ এবং তার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় প্রভাবিত হওয়া তাঁর পক্ষে কতটা বাস্তব ছিল তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আদৌ কুমের এই বই অক্ষয়কুমার পাঠ করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলে কখন কী অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন সে সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য বা সূত্র তিনি রেখে যান নি। তবে ১৮৪৩-র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি আছে। সেখানে লিখেছেন—

"বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক। কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।"[২৩]

জগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের এ উক্তির অর্থ, ঈশ্বরচিন্তায় মানুষের মনের পরিশুদ্ধি দরকার, এবং এই সংসারে কৃষ্টির মধ্যেই পরমেশ্বরের রহস্য বিরাজমান। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দেই অক্ষয়-মানসিকতায় এ বোধ জন্মেছে; কুমের গ্রন্থপাঠ তিনি এ সময়েই করেন কিনা তা অজ্ঞাত, তবে অন্য কাজে, বিশেষ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে তিনি তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। পত্রিকার অফিসে তাঁর কী অপরিসীম ব্যস্ততায় এ সময় কেটেছে তার সমর্থন মিলবে নীচের উদ্ধৃতি থেকে—

"লিখিতে আরম্ভ করিলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকিত না। লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, প্রস্থান করিত। হুঁস নাই। প্রভাতে পত্রিকা সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়কুমার বঙ্গসভার জন্য 'অক্ষয় যশের মালা,' রচনা করিতে ব্যস্ত।"[২৪]

মহর্ষি নিজেও অক্ষয়কুমারের ধর্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কখনো কোন

প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু'র পরিকল্পনায় জর্জ কুমের প্রভাব সম্পর্কে তিনিও মন্তব্য করেন নি। যদিও নিজ ধর্মচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমারের ধর্মবোধ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> "আমি কোথায় আর তিনি কোথায়? আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সহিত কি সম্বন্ধ, আকাশ পাতাল প্রভেদ।"[২৫]

জর্জ কুমের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হলে অক্ষয়কুমারের এ গ্রন্থের সকল মৌলিক চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। অথচ এ-গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের জগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তা অক্ষয়-মানসিকতার পূর্বানুক্রমিক বিশ্বাসবোধের প্রসারিত রূপ মাত্র; এবং পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে বাস্তব কতকগুলি কারণে কুমের ঐ গ্রন্থ সেসময় অক্ষয়কুমার তাঁর অত অল্প বয়সে পাঠ করতে পারেন না। কাজেই যদি আদৌ এ গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন তবে নিশ্চয়ই ১৮৫১-র পূর্বেই পাঠ করেছেন। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না থাকায় 'বাহ্যবস্তু'র উপর কুমের প্রভাব সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, চিন্তার দিক থেকে উভয়ের কিছু মিল আছে সত্য; কিন্তু অক্ষয়কুমার সোজাসুজি কুমের গ্রন্থের প্রভাবে 'বাহ্যবস্তু' রচনা করেন নি। তাঁর জগৎ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের যে পূর্বানুবৃত্তি এ-গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়েছে তাতে কুমের জগৎ ও ঈশ্বরচিন্তার কিছু মিল লক্ষিত হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্যও আছে। অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করতেন না, কুম তা স্বীকার করতেন।

অক্ষয়কুমারের অন্যতম বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৫৬) ছাত্রপাঠ্য। জড় ও জড়ের গুণ, বিস্তৃতি, স্থিতিবিরোধ, পরমাণু, আকৃতি, মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, চৌম্বক, তাড়িতাকর্ষণ, তেজ, পরিচালকতা, কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, গতি, শক্তি প্রভৃতি পদার্থের সম্ভাব্য সকলপ্রকার গুণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। যেমন—

জড়ের সংজ্ঞা—

> "যে গুণ থাকাতে, জড়পদার্থ আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং অন্য কর্তৃক চালিত হইলে, আপনা হইতে স্থির হইতেও পারেনা, তাহার নাম জড়ত্ব।"[২৬]

জড়ের ব্যাখ্যা—

"যেখানকার হিমালয় পর্ব্বত সেইখানেই আছে, এবং যেখানকার বিন্ধ্যাচল সেইখানেই রহিয়াছে। যে স্থানে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায়, যাহা (ভু) সেই স্থানেই থাকে ; মনুষ্য, জল, বায়ু, বা অন্য কোন কারণ দ্বারা ভগ্ন না হইলে, তাহার কণামাত্রও স্থানচ্যুত হইয়া অন্য স্থানে গমন করে না। জড় পদার্থ যেমন স্থির থাকিলে আপনা হইতে চলিতে পারে না, এইরূপ, চালিত হইলে, আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না।"[২৭]

চারুপাঠের তিনখণ্ডেও বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ রচনাগুলির মধ্যেও অত্যন্ত সহজ করে বাংলা ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হয়েছে। যেমন, চারুপাঠ, প্রথমভাগে 'আগ্নেয়গিরি' রচনায় আগ্নেয়গিরির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা ; প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণজল ও ধাতু নিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হয়। এই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় পর্ব্বত।"[২৮]

চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগে, 'হিমশিলা' রচনাটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। লিখেছেন—

"জল শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। সাধুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা।"[২৯]

চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগের একটি রচনায়—

"যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীটপতঙ্গে পৃথ্বীমণ্ডল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নহে। তাহারা অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাণু বলিয়া উক্ত রহিয়াছে।"[৩০]

অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলীর পরিকল্পনায় নানা ইংরেজী গ্রন্থের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর উপর কারো 'প্রভাব' পড়ে নি। এ ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানমূলক রচনাগুলির মধ্যে অক্ষয়কুমার অন্য বিদেশী লেখকদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমত সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। ঠিক নয় তার কারণ, বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারমূলক, বৈজ্ঞানিক ও একজন

আবিষ্কারক (যেমন, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক); আর তাঁর আবিষ্কার নিয়ে রচিত গ্রন্থ সেই আবিষ্কৃত সত্যের প্রচার, স্বীকৃতি মাত্র। সেক্ষেত্রেও 'রেফারেন্স' হিসাবে একাধিক গ্রন্থ পাঠ করে নূতন আর একখানি গ্রন্থ, (ঐ একই আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সত্য-বিষয়ক) রচনা করাতে কোন মৌলিকত্বের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। তাছাড়া,—

"It is a common fallacy in criticism to take parallels for signs of indebtedness or influence. All that perallels really prove, is the community of the poetic mind all the world over. Too much stress on parallels might lead to absurd conclusion."৩১

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলির উপর এই পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায়, লেখক হিসাবে তিনি এই সমস্ত রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জলতা সৃষ্টিতে, এবং তথ্যের সম্পূর্ণতা আনতে যে সকল বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য 'রেফারেন্স' হিসাবে ব্যবহার করেছেন (কখনই মূল থেকে অনুবাদ করেন নি) তার সকৃতজ্ঞ উল্লেখ উদারভাবেই করেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থকর্তার নাম ও রচনা, বা পুস্তকের রেফারেন্স দিতে অক্ষয়কুমারের কোন কুণ্ঠা ছিল না। অতএব বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টির কৃতিত্ব যে অক্ষয়কুমারের তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার সার্থক সিদ্ধিও এখানে।

১। Major Sergery, Minor Sergery, Demonology, Physiology, child cure, Toxicology, Aphrodisiaes etc,

২। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, সংস্কৃত সাহিত্যের কথা, (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৪৭) ১৩৪৫, ২০-২১। দ্র: ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, *Positive science of the ancient Hindus*, (1915) (P. C., Ray, *History of the Ancient Hindus* : 2 vols. গ্রন্থে উল্লিখিত)।

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাংলার প্রাচীন গৌরব, (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৫৪), ১-৮।

৪। অনাথনাথ বসু, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, (তদেব ২৩) ১৩-১৪।

Sharp,, H., *Selections from educational records*, (1781-1839 East India Co. Act of 1813. Sec. 43 Calcutta, 1920, 22,

৫। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (দেশ: সাহিত্য-সংখ্যা) ১৯৬৪, ১৩৩।

৬। *The English Works of Raja Rammohon Ray*, Allahabad, 1906, 496. (with an introduction by Ramananda Chatterjee)

৭। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, ১৩৩।

৮। Hearly, গণিতাঙ্ক, ১৮১৯: ক্যালকাটা বুক সোসাইটি।

৯। শিশিরকুমার দাশ, রামেন্দ্রসুন্দর, এক্ষণ, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা: ১৯৬৫, ২।

১০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ আশ্বিন: ১৮৪৩ (১৭৬৫ শক), ১১-১২।

১১। পূর্ণ বিশ্লেষণ অক্ষয়-রচনাবলীর পরিচিতি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১২। বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম ভূগোল (১৮৪১) বইটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কোথাও করা হয় নি।

১৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুপাঠ (৩) ভূমিকা, (৩১ সংস্করণ): ১৯১২, ১৩।

১৪। তদেব।

১৫। বাহ্যবস্তু, ১ ভাগ, ভূমিকা, ১৮৫১, ৮-৯।

১৬। তদেব ৫০।

১৭। তদেব, ২৮।

১৮। তদেব, ৯।

১৯। তদেব, ১৫৩।

২০। বাহ্যবস্তু, ২০৩।

২১। তদেব, ২০৮।

২২। এ 'পরিশিষ্ট' দুটির বিস্তৃত আলোচনা অক্ষয়কুমারের নীতিবিষয়ক রচনার পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

২৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (ভাদ্র ১৭৬৫ শক) ১৮৪৩, ১ সংখ্যা।
বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২ খণ্ড, ১৯৬৩, ৮৪।

২৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বে উল্লিখিত, ১২।

২৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (১ম প্রকাশ, ১৮৯৮) ১৯৬২, ৩৭।

২৬। অক্ষয়কুমার দত্ত, পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ১৩।

২৭। তদেব।

২৮। চা. পা. (১), ৬।

২৯। তদেব (২), ১২।

৩০। তদেব (৩), ১১।

৩১। Sen, Taraknath, *Western Influence on the Poetry of Tagore*, *Rabindranath Tagore: Centenary Volume, 1861-1961*, Shahitya Academy. New Delhi. 1961, 255.

চতুর্থ অধ্যায়

অক্ষয়কুমার : নীতিবিষয়ক রচনা

বিষয়-গুরুত্বে অক্ষয়-রচনাবলীতে বিজ্ঞান-রচনার পরই নীতি-সম্পর্কীয় রচনার স্থান। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলার লেখক ও পাঠক-সমাজে নীতিবিষয়ক রচনার ব্যাপক চর্চা লক্ষিত হয়। গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০১) এদিক থেকে প্রথম বাংলাগদ্যে রচিত নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ।[১] পুস্তকটি সংস্কৃত থেকে অনূদিত। ১৮০৩-এ গিলক্রস্টের তত্ত্বাবধানে তারিণীচরণ 'ঈশপস্ ফেবল্‌সের' বঙ্গানুবাদ করেন, ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট। ১৮২০-তে স্টুয়ার্টের *Moral Tales of History*-র ইংরেজী ও বাংলা দ্বিভাষিক অনুবাদ উপদেশ-কথা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক উদাহরণে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, বন্ধুত্ব, মিথ্যাচরণ, গর্ব, অহঙ্কার, ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও নীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ করছিলেন। ১৮২৯-এ প্রকাশিত 'সদ্‌গুণ ও বীর্য'র লেখক সম্ভবত জে. সি. মজুমদার; ৯৫টি চূর্ণকের চরণে গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক চরিত্রাদর্শে বিবিধ নীতিবাচক কথা ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৩৩-এ বিশপ টার্ণারের উপদেশ অনুসারে ইংরেজী নীতিগ্রন্থ জনসনের *Rasseles* (1759)-র ইংরেজী মূলসহ বঙ্গানুবাদ করেন রাজা কালিকৃষ্ণ।[২] একবৎসর পরে রামচন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩৪) পুস্তকেও ইতিহাস, প্রাকৃতিক ইতিহাস, এবং নীতিবিষয়ক চূর্ণকের সঙ্কলন লক্ষিত হয়। ঐ একই বৎসর শরৎ বোসের 'উপদেশ-কথা' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভাষা বাংলা, কিন্তু হরফ ছিল রোমান। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 'নীতিদর্শন' (১৮৪০) নামে কতকগুলি নীতি-বিষয়ক রচনার একটি পুস্তক লেখেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতার সমষ্টি নিয়েই এই পুস্তকখানি রচিত।

বাংলা সাহিত্যে নীতিচর্চার এই ধারাটি কলিকাতা স্কুল বুক স্যোসাইটি'র পৃষ্ঠপোষকতায় আরও ব্যাপকতর হয়েছিল। জ্ঞানবিস্তারের অন্যতম সাফল্যজনক প্রতিষ্ঠানরূপে স্কুল বুক স্যোসাইটি'র সে-যুগে বিশেষ খ্যাতি ছিল। ছাত্রপাঠ্য অধিকাংশ পুস্তকই এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হত।

'কবিতামৃত কূপ' (১৮২৬), 'হিতোপদেশ' (১৮৪১) প্রভৃতি নীতিবিষয়ক ছাত্রপাঠ্য পুস্তকগুলি ঐ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের এই নীতিবোধের চর্চা সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যেও লক্ষিত হয়। ১৮১৮-তে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাতেও নীতিবিষয়ক একাধিক রচনা প্রকাশিত হত; দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় এই নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশের পশ্চাতে স্কুল বুক স্যোসাইটি'র আনুকূল্যও ছিল। হিন্দুর জীবন ও ধর্মাচরণ, আমেরিকার দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্য স্যোসাইটি নিয়মিত রাখতেন। তারিণী-চরণের 'নীতিকথা' (১৮১৮) এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাসাহিত্যে নীতিচর্চার এই ধারাটি মাসিকপত্রে, স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এবং সাধারণ নীতিবিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে উনবিংশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে সর্বাপেক্ষা বেশি পুষ্টিলাভ করেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও পাঠশালাকে কেন্দ্র করে যে সকল সাহিত্যচর্চা করেছেন তারও মধ্যে অনিবার্যভাবে এই যুগবৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

১৮৪০-এ রাজকিশোরের সংস্কৃত ও বাংলায় রচিত 'হিতকথা' এ পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বই। ১০০টি নীতি ও উপদেশাত্মক শ্লোকে 'বিনাকারণে রাগ', 'কণ্ঠস্বর কোমল কিন্তু স্ববল', 'কৃপণ-ধনবান' প্রভৃতি আলোচনা পুস্তকটির উপজীব্য। ১৮৪২-র সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রেমচাঁদ রায়ের 'জ্ঞান-অর্ণব' অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ সময় পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের নীতিবিষয়ক কোন রচনা প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু ১৮৪০-৪২-র মধ্যে তিনি নীতি-তরঙ্গিনী সভায় সভ্য হিসাবে নীতিবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ লিখে পাঠ করেন। ১৮৫১-য় তাঁর নীতিবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তু' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫১-র পর 'বাহ্যবস্তু' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩), 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষ্য়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৫) এবং 'চারুপাঠ' তিন ভাগের (১৮৫৩, '৫৪, '৫৯) নীতিবিষয়ক রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৫১-'৫৯ এই আট বৎসরের মধ্যেই তাঁর নীতিবিষয়ক রচনাগুলি সব প্রকাশিত হয়ে যায়; এই সময়ের মধ্যেই ঈশ্বরচাঁদ মল্লিকের 'জ্ঞানোল্লাস' (১৮৫৪) ইএট্সের 'হিতোপদেশ' (১৮৫১) (শেষ সংস্করণ), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' (১৮৫৪), রাধাকান্তদেব

ও তারিণীচরণ মিত্রের 'নীতিকথা' (১৮৫১ : শেষ সংস্করণ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাংলাসাহিত্যে নীতিচর্চার এত আধিক্যের কারণ সম্ভবত সমকালীন ধর্মবোধের সঙ্গে জড়িত। খৃষ্টান মিশনারীগণ খৃষ্টীয় ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন ; জোর করে, ছলনা করে, এদেশীয় লোকেদের খৃষ্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করে তুলছিলেন তাঁরা। রামমোহন এ বিষয়ে লিখেছেন—

> "কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতকব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকার করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয়প্রকার এই যে কোন নীচ ধনাশয় কিংবা অন্য কোন কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"[৩]

খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন—

ক. এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্মজন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

খ. অধিকন্তু লেখেন যে বেদান্তে কহেন, যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয় সেইরূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় বারংবার হয়, ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

গ. হিন্দুরদের শাস্ত্রমতে জীবের জন্মমৃত্যু কর্ম্মবশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কোচিৎ মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কোচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

ঘ. এ দেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়।

ঙ. মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়।[৪]

খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এই মনোভাব অক্ষয়কুমারের সমকালীন ধর্মচেতনাকেও বিচলিত করেছিল। Alexander Duff তাঁর *India and Indian's Missions* (1839) গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে লেখেন—

> 'He (Brahm) effectuates no good, inflicts no evil, suffers no pain, experiences no emotion,...his (Brahm) beautitude is represented as consisting in a long..., monotonous and uninterrupted sleep, a sleep so very deep as never to be disturbed by the visitation of a dream.
>
> There is not in the whole enumeration the remotest allusion to a single moral attribute (of Brahm).'[৫]

হিন্দুবিরোধী এই সকল মতবাদের প্রধান কারণ—

> They found there was no apparent metaphysical basis of God and Evil because none of them were real. They thought that the doctrine of maya denies the very reality of the world and leaves no room for ethics."[৬]

'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে (১৮২৩) রামমোহনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৮৪৪) দেবেন্দ্রনাথও প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৮৪৫-এ তাঁর *Vedantic Doctrines Vindicated* প্রকাশিত হয়।[৭] এই সকল প্রতিবাদ একত্রিত হয়ে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়।

স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী এই Alexander Duff ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সহায়তায় কলকাতায় একটি মিশনারী স্কুল খুললেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে London Missionary Society চুঁচড়ার নিকট ভারতীয় ভূমিতে শাখা প্রতিষ্ঠা করল। ১৮১৮-তে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় শ্রীরামপুর মিশনে প্রায় ১০,০০০ ছাত্রকে খ্রীষ্টান ধর্মের নীতিবোধ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হত। কাজের সহায়তার জন্য তাঁদের ১২৬

খানি বাংলা পুস্তকও ছিল। ১৮২৯-এ চার্চ মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার ছ'বৎসরের মধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৩৫)। ১৮৪১-এ লরেট হাউসও প্রতিষ্ঠিত হল। কলকাতার জাতীয় সংস্কৃতিতে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবত একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৩১-এ ডিরোজিও'র মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর আদর্শ 'ইয়ং বেঙ্গল'কে সর্বপ্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কার ভেঙ্গে মানবতার জয়গানে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছিল।[৮] Duff এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ওদিকে "ডফ সাহেব তো ইস্কুল খুলিয়া হিন্দুকালেজের কাছেই বাসা বাঁধিলেন এবং কালেজের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রী ডফ্ এবং পাদ্রী ডিয়ালট্রির বক্তৃতার হাওয়ায় কালেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তাহাদের ডিরোজিও-গুরুর প্রভাবে তাহাদের মনে হিন্দুবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া তাহারা কেহ কেহ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের দিকেই স্বভাবতঃ ঝুঁকিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর একজন প্রধান শিষ্য, মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।"[৯]

"সেই ১৮৩২ সালেরই ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, হিন্দুকালেজের সমুদয় ভালভাল ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।"[১০]

কৃষ্ণমোহন (১৮১৩-১৮৮৫) বয়সে অক্ষয়কুমারের চেয়ে সাত বৎসরের বড় ছিলেন। ১৮৩১-এ কৃষ্ণমোহন তাঁর মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ কর্তৃক গৃহ-বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেকালীন হিন্দুগোঁড়াদের পরামর্শে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী, খ্রীষ্টান বলে তাঁর নামে রামজয়ের নিকট অভিযোগ করে বলেছিলেন "আপনার দৌহিত্রকে বর্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।"[১১] কৃষ্ণমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের জন্য সত্যসত্যই হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি *Inquirer* নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় তিনি হিন্দুদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) হিন্দুধর্মানুযায়ী আদালতে সাক্ষী দিতে উঠে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "I do not believe in the Sacredness of the Ganges."("আমি গঙ্গা মানি না")।[১২] মাধবচন্দ্র মল্লিকও *Athenium* পত্রিকায় লিখলেন, If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.

'বাহ্যবস্তু'র প্রথম ভাগের উপসংহারে 'সুরাপান' এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষে 'আমিষ ভোজন' দুটি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই সুরাপানের রীতি ঊনবিংশ শতকের নীতিবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি আচরণ মাত্র। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরিত শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের আচরণ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই লিখেছেন—

> "আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব-সংস্কারই বা কিরূপে যাইবে?[১৩]

ঊনবিংশ শতকের এই চাঞ্চল্য ভিক্টোরীয় যুগকে (১৮৩০-৭০) স্মরণ করায়। সে যুগও ছিল এমনিতর সংঘাত-চঞ্চল। ধর্মবোধ, নীতিবোধ, সাহিত্যবোধ, ও সংস্কৃতিচর্চা সবই তখন সংস্কারমুখীন হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায়—

> "It was the period in which the conflict between religious feeling and the scientific spirit, between mysticism and rationalism, became intense and widespread.
>
> The characteristic feature of this period in comparison with following one is the prudence and reserve with which novel ideas on the subject of faith and morality were ordinarily expressed."[১৪]

ধর্মজগতের গোঁড়ামি রামমোহনও পছন্দ করেন নি। মানুষের ভাল করার

স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম (১৮১৫) প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন, এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এ স্বপ্নের মূলে কোন রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা ছিলনা[১৫]; বিশ্বমানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই রামমোহন সেদিন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখেছিলেন—

"It is now generally admitted that not religion only but unbiassed commonsense as well as the accurate deductions of scientific research led to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."[১৬]

রামমোহনের এই বিশ্বমুখীনতার আভ্যন্তরীণ রূপ দেবেন্দ্রনাথের জাতিধর্ম নির্বিশেষে ব্রাহ্মধর্ম উপাসনার বিধিব্যবস্থার মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারও খ্রীষ্টীয়ধর্মের সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ও হিন্দুধর্মের অর্থহীন গোঁড়ামির হাত থেকে সমাজকে বাঁচিয়ে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মীয় প্রয়াস সহজতর করে তুলতে মহর্ষির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের এই ধর্মান্দোলন বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বুদ্ধিবাদী মানবপ্রেমিক অক্ষয়কুমার বেশিদিন দেবেন্দ্রনাথের Mysticism-পুষ্ট ঈশ্বরচিন্তায় আস্থা রাখতে পারেন নি। মনোমালিন্য ও মতোবিরোধের ফলে ধর্মের জগতে উভয়ের অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। আরও পরে ব্রাহ্মধর্মের ভাঙন শুরু হয়েছে। একবার কেশব সেনের হাতে আর একবার শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে সেই ভাঙনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। ধর্মের এই ভাঙাগড়ার মধ্যেই ঊনবিংশ শতকের নীতিবোধ গড়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষার জগতেও এই নীতিবোধ প্রসারিত করতে সহায়তা করেন। পাঠ্য-পুস্তকের তালিকায় নীতি ও ধর্মবোধ-সম্পৃক্ত পুস্তকের নাম এসেছে।[১৭] ভিক্টোরীয় যুগেও স্কুল, কলেজের পাঠ্যতালিকায় খ্রীষ্টীয়ধর্ম-পুস্তক প্রচলিত ছিল। একটি গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলাও হয়েছে—

"They tried to Christianise education, just as Thomas Arnold at Rugby taught the great ideal of the Christian gentleman to the public schools."[১৮]

নীতিবোধের এই ধারা পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের মধ্যেও অনুবর্তিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গোরা (১৯০৬) শরৎচন্দ্রের দত্তা (১৯১৮) নববিধান (১৯২৪) বা এঁদের পূর্ববর্তী যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেলভগিনী' (১৮৮৫) ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) বা যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সমাজ' (১৮৯৩) প্রভৃতি পুস্তকের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

> "সময়গুণে ডিরোজিও'র যুবশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদখাওয়া ও খানাখাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করে। কেহ কেহ উদ্ধতবেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন, 'গরু খেতে পারিস? গরু খেতে পারিস?' এইরূপে প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন।"[১৯]

অক্ষয়কুমারের রচনাগুলিতেও এই সমকালীন ধর্ম ও সমাজবোধ-প্রসূত নীতি-বোধের ধারাটি স্পষ্ট। কিন্তু এই নীতিবোধের ধারাটি অক্ষয়কুমারের রচনারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এইরূপ নীতিবোধে জাগ্রত সমাজচিন্তা যে কোন দেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হতে পারে। ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যে ম্যাথু আরনল্ডের আবির্ভাবও এমনিতর সংঘর্ষ-চঞ্চল মুহূর্তেই হয়েছিল। অক্ষয়কুমার যখন কলকাতায় এলেন (১৮৩০) তখন সদ্য রহিত সতীদাহ-প্রথার (১৮২৯) উত্তেজনা, বেন্টিঙ্কের ঠগীদমন-নীতি (১৮২৯), আরও পরের বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬), বহুবিবাহ-রহিত আন্দোলন, সমকালীন ধর্মীয় আন্দোলনকে আরও প্রবলতর করেছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর মত প্রগতিপন্থী ধার্মিক ব্যক্তির মনেও এই নীতিবোধ তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। বহুবিবাহ একজন হিন্দুপুরুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে কিনা, অপরাধী করে কিনা এ নিয়ে তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল তা তাঁর জীবনেরই নৈতিক সমস্যার প্রশ্ন;—তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করলে শিবনাথ সেদিন তাঁর পিতার সামনেই নীতিগত প্রশ্ন তুলেছিলেন, "আমার এরূপ বয়স হইয়াছিল যে বহু বিবাহকে মন্দ বলে জানি।··· আমার এরূপ মনে হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল।"[২০] কিন্তু পিতৃ-আদেশ অমান্য

করে তাঁর ভাল মন্দ জ্ঞানমত কাজ তিনি করতে পারেন নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পরও তিনি এই সূক্ষ্মনীতিবোধে অন্তরে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন।[২১]

একটি "নিরাপরাধা স্ত্রীলোককে অন্যায়রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছা সত্বেও সেই অন্যায় কার্যের প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অনুতাপের মুহূর্তে সে চিন্তা আর আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্য আপনিই দায়ী।...আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। ...আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনো নিচের গর্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভালো হয়।"[২২]

এই পরিবেশে অক্ষয়কুমারেরও নীতিবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৫), 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৪), এবং 'চারুপাঠের' (১৮৫৩, '৫৪, '৫৯) নীতিবিষয়ক রচনাগুলি বুদ্ধিবাদে পরিশোধিত নীতি ও ধর্মচেতনার সাহিত্যিক নিদর্শন। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম যুক্তিবাদী পুরুষ ছিলেন অক্ষয়কুমার, তিনি যুক্তি দিয়ে নীতির বিচার করেছিলেন, ধর্মবোধকে এই নীতি-চেতনায় সম্পৃক্ত করে দেখেছেন। তাই বিধবাবিবাহ উচিত কিনা আলোচনায় বিদ্যাসাগর যখন হিন্দুধর্মের শাস্ত্র, পুরাণ মন্থিত করে তার বিচার করতে ব্যস্ত, তখন অক্ষয়কুমারও তাঁর সমবয়সী বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতিতে। যুক্তি ও বুদ্ধি ছিল তাঁর সহায়, শাস্ত্র নয়, ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বিশুদ্ধ মানবজীবনাচরণ থেকে তিনি উদাহরণ তুলে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন; এবং তাঁর এই যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য সম্পর্কে তিনি নিজেও মন্তব্য করেছেন—

"এই স্থলে নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথ আশ্রয় করিয়া এ বিষয়ের বিচার করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া ইহা প্রচলিত করা কর্তব্য কিনা অবধারণ করিবেন।"[২৩]

এই 'নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি পথে' ন'টি প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেছেন, এ ন'টি প্রস্তাবে যে নীতি ও ধর্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে তা একান্ত করে মানবতাবাদে পরিশুদ্ধ, যুক্তিগ্রাহ্য, বুদ্ধি-প্রণোদিত। প্রগতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে অক্ষয়কুমার সেদিনকার এই দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সাম্যের অধিকারের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছিলেন। কোন রকম শাস্ত্রীয় সমর্থন ব্যতীতই তিনি লিখলেন—

"স্ত্রী বিয়োগ হইলে, পুরুষেরা পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিয়া যদি পাপগ্রস্ত (ভু) না হয়, তবে স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীরা পুনর্বার অন্য পতির পাণিগ্রহণ করিলে কি নিমিত্ত অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইবে, তাহা কোনক্রমে নির্দ্ধারণ করা যায় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বভাব এ বিষয়ে তুল্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ঐ উভয় জাতিরই কাম আছে, স্নেহ আছে, প্রীতি আছে, বুদ্ধি আছে, ধর্ম্মজ্ঞান আছে, ইহাতে, এক জাতিই বা পুনর্ব্বার উদ্বাহবন্ধনে কি নিমিত্ত অধিকারী হইল, এবং অন্য জাতিই বা কি নিমিত্ত সে বিষয়ে বঞ্চিত রহিল, তাহা কোন মতেই অনুভূত হয় না।"[২৪]

অক্ষয়কুমারের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবাদীর চিন্তাপ্রসূত, অতি বাস্তব এবং সাধারণ মানবজীবনাচরণের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, যুক্তিগ্রাহ্য। কোন ধর্মের দোহাই নেই, ঈশ্বরের কৃপা বা করুণার প্রশ্ন নেই, নর ও নারীর পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক থেকে যে বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা যায় এখানে লেখক তাই করেছেন মাত্র।

এই 'Rational outlook' থেকেই তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করেন এবং বেদ ব্রাহ্মধর্মের অভ্রান্ত যুক্তি নয়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন ও প্রার্থনার প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করেছিলেন। উদার মানবতাবাদী, বুদ্ধিনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারও তাই ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুধর্মের সংরক্ষণশীল গোঁড়া ভক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের কাজ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে বাধ্য

হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার তাঁর মতামত স্বাধীন ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের আলোচিত এই যুগপরিবেশেই অক্ষয়কুমারের নীতি-বিষয়ক রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল। ১৮৫১-১৮৫৯ এই আট বৎসরের মধ্যেই তাঁর নীতিবিষয়ক রচনাগুলি সব প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ১৮৩৯-'৪০-র মধ্যে তাঁর কতকগুলি নীতি-সম্পর্কীয় বক্তৃতা নীতিরঞ্জিনী সভায় পঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির পৃথক কোন সঙ্কলন আর করা হয় নি। (আধুনা সেগুলি দুষ্প্রাপ্যও)। তাঁর প্রথম নীতি-গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তু' (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩) জর্জ কুমের (১৭৮৮-১৮৫৮) *Essays on the Constitution of Man* (1828) নামক পুস্তকের আদর্শে রচিত হলেও লেখকের রচনানৈপুণ্যে তা মৌলিক হয়ে উঠেছে। লেখক নিজে এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> "ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এ দেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।"[২৫]

গ্রন্থটির প্রথম ভাগে মানুষের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম আলোচনা করে, মানুষের সুখ ও কল্যাণ কিসে হয় সে সম্পর্কে লেখক কতকগুলি নিয়ম স্থির করেছেন। বলাবাহুল্য এই নীতিগুলি সবই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। ফলে নীতিভ্রষ্ট মানুষের দুঃখ অপরিহার্য। নিয়মপালন, শারীরিক সুস্থতা বজায় রেখে পরিবার প্রতিপালন, বিবাহ, সন্তানপালন, প্রভু ও ভৃত্য, পিতা-মাতা ও সন্তান, প্রভৃতির পারস্পরিক ব্যবহার-সম্পর্কীয় নীতি এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টাংশে আমিষভোজনের পক্ষে মত দিয়ে যুক্তির অবতারণায় আমিষভোজন হিতকারী বলেছেন লেখক। 'বাহ্যবস্তুর' (১) বস্তু-বিষয় মোটামুটি এই'। বাহ্যজগত ও জীবনের সঙ্গে ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের বিশ্বাসবোধটি কিন্তু খুব স্পষ্ট।

"ইতর জন্তু ও মনুষ্য নিয়েই পৃথিবীর প্রাণীজগৎ। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইতর জন্তু ও মনুষ্য নিজ নিজ স্বভাবে কাজ করে। পরস্পর তবু সুখে, দুঃখে নির্ভরশীল।" সুতরাং "ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতের তত নিয়ম আছে। ভৌতিক নিয়ম, শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম", এক্ষেত্রে পালনীয়। "নিয়ম লঙ্ঘনই দুঃখের কারণ। পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। নিয়ম পালন করার জন্যই দুঃখের ব্যবস্থা। সমুদায় কৌশলই মঙ্গল কৌশল।" অতএব "শরীর চালনা, জিজীবিষা ও বুভুক্ষা, প্রতিবিধিৎসা, জিঘাংসা, নির্ম্মিমিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা, আত্মাদর" প্রভৃতি "মানুষের প্রকৃতিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা কর্তব্য। সামাজিক দুঃখনাশের জন্য বিদ্যাপ্রচারই দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সাম্যাবস্থায় রাখে। 'মৃত্যু-ঘটনা'ও সমস্ত শারীরিক বস্তু প্রকৃতি-সিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হবে তাহ'লে। এই নিয়ম সমুদায় শুভকর।"২৬

'বাহ্যবস্তুর' দ্বিতীয় ভাগে (১৮৫৩) ধর্ম, সমাজ ও প্রকৃতির নিয়মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে লেখক বলেছেন, "এই অখিল সংসাররূপ ভ্রমশূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় উপায়।" এই মন্তব্যটি অক্ষয়কুমারের ধর্মধারণার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করা চলে। বেদ নামক অপৌরুষেয় গ্রন্থটিই সমস্ত বিশ্বকার্যের একমাত্র কারণ নয়। এর মূলে দৈবাদেশ নেই, ঈশ্বর নামক শক্তি বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। এই "বিশ্বরূপ গ্রন্থই" ভ্রমশূন্য কারণে তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে আছে। ধর্মচিন্তায় অক্ষয়কুমার যে প্রগতিপন্থী ছিলেন তার প্রমাণও এই গ্রন্থে মেলে। আধ্যাত্মিক প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্য সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকতা নেই, সংসারবন্ধন মাঝেও যে ঈশ্বরানুভূতি সম্ভব অক্ষয়কুমার তারই প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন—

"অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি (ভু) হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতার পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং

তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না।"[২৭]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ২৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগেও লেখকের যে ধর্মজিজ্ঞাসা জেগেছে তার উত্তরও 'বুদ্ধিবৃত্তি'র মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। লিখেছেন, বিদ্যা-অধ্যয়নেই "পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা পাওয়া যায়।" মনে করেছেন, "যথার্থ ধর্মশাস্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিতে অধ্যয়ন" করা কর্তব্য। অক্ষয়কুমার তাই দৃঢ়ভাবেই বলেছেন, "অতএব যে সকল প্রচলিত ধর্মের সহিত জগতের নিয়মশৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্তব্য।" কোন আপোষ নয়। বুদ্ধি-পরিশোধিত মানবতাবাদে শ্রদ্ধাশীল লেখক তাই বাস্তবজগৎ ও জীবনের প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে ধর্মকে একত্রে বিচার করতে চেয়েছেন; প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনও তাঁর কাম্য।

'বাহ্য বস্তু'তে জর্জ কুমের[২৮] *Essays on the Constitution of Man*-র (1828) প্রভাব আছে বলে সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু গ্রন্থটির প্রকাশ-কালে অক্ষয়কুমার মাত্র আট বৎসরের বালক এবং তখনও তিনি কলকাতায় আসেন নি। তাঁর ইংরেজী শিক্ষা কলকাতায় আসার পর রীতিমত শুরু হয়। 'বাহ্য বস্তুতে' কুমের প্রভাব সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে 'বাহ্যবস্তু'তে ধর্মসম্পর্কীয় যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে তারই প্রসারিত অন্যতম প্রকাশ-রূপ 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৫৫)[২৯] লক্ষিত হয়। 'ধর্মোন্নতি'তে লেখক স্পষ্টই বলেচেন যে ধর্মীয় এবং অধ্যাত্মচিন্তায় ভারতের যা কিছু গৌরব তার মুলে আছে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার একাগ্র সাধনা। জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তারও পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন বাস্তবসম্মত, অলৌকিকতা-পুষ্ট নয়।

"সমুদায় ধর্ম্মই আমাদের স্বভাবসিদ্ধধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের অন্যান্য বিষয়ও যেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্মও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে। বনস্থলের পর্ণকুটীর এবং নগর-মধ্যস্থিত পরম শোভাকর রাজপ্রাসাদ উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক নির্ম্মিত। পূর্বকালের ভ্রান্তিসঙ্কুল ফলিত জ্যোতিষ, এবং অধুনাতন তত্ত্ব-পরিপূর্ণ

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক প্রণীত। ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতদিগের মনঃকল্পিত ভূগোলবৃত্তান্ত এবং অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা উভয়ই মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত। সেইরূপ বৈদিক-সংহিতা প্রোক্ত চন্দ্র-সূর্য্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা এবং উপনিষদুল্লিখিত নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত। মানবজাতি প্রথমে সকল বিষয়েই ভ্রান্ত ছিলেন ;·· শিক্ষালাভাদি দ্বারা তাহার মানসিক প্রকৃতি উত্তরোত্তর যেমন মার্জিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে বিদ্যা, ধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম এবং সামাজিক ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারই উত্তেরোত্তর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।"[৩০]

অক্ষয়কুমারের ধর্মবোধ নীতিনির্ভর। এই নীতিবোধ বিজ্ঞানবাদী অক্ষয়-কুমারের মনীষায় পরিশোধিত, বুদ্ধিবাদে সম্পূর্ণ। ধর্মনীতি (১৮৫৫) পুস্তকেও অক্ষয়-মানসিকতার এই দিকটিই উদ্ঘাটিত। মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যবোধেই ঈশ্বরশক্তির অর্থ সূচিত। এ গ্রন্থের ধর্মচিন্তার মূলেও এই বিশ্বাস স্পষ্ট। সাংসারিক সম্পর্কে আত্মীয়তার যে ধারণা তা পালনীয় নীতির অন্তর্গত এবং এই নীতির আচরণই ধর্মাচরণ। ২০২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে মানুষের আচরণ-ধারায় কর্তব্য এবং অকর্তব্যগুলি প্রথমে নির্দেশিত হয়েছে। এই আলোচনায় মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ-মিশ্রিত ফলাফল-গুলিও আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানেও ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধিত হয়, অবশ্যপালনীয় স্বাস্থ্যসাধনের বিধান সেক্ষেত্রে অবশ্য মান্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। গৃহধর্ম, বিবাহনিয়ম, দম্পতির পারস্পরিক ব্যবহার, বয়স্কের বয়স্ক-র প্রতি ব্যবহার, শিক্ষাদান, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে এবং লেখক দেখিয়েছেন ধর্মের প্রকৃত আচরণ মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নির্দেশিত।

অক্ষয়কুমারের ধর্মনীতি (১৮৫৫) গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং বস্তুবিষয়ের সঙ্গে Rev. Septimus Hodson-র *Sermons on the Present State of Religion* (1792)[৩১] গ্রন্থের যথেষ্ট মিল লক্ষিত হয়। পিতামাতার পারস্পরিক কর্তব্যবোধ এবং শিক্ষাবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনায় অক্ষয়কুমার ও হড্সনের চিন্তাধারা ও বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গী বস্তুত একই

ধরনের। যেমন সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য নির্ধারণ সম্পর্কে হড্‌সন লিখেছেন—

"If we view it as constitued by the customs of nation, we shall find that this duty requires not only care, protection and maintenance in the helpless stages of infancy and childhood ; but also sound and good education."[৩২]

একই বিষয়ে অক্ষয়কুমার লিখছেন—

"তাহারা কেবল সন্তানের জীবন দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্পত্তি সম্ভোগের উপায় করিয়া দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্ম।"[৩৩]

আবার অক্ষয়কুমার জনক-জননীর প্রতি সন্তানের কর্তব্য-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "পিতামাতার মত শুভকরী পৃথিবীতে আর কেহই নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের বার্দ্ধক্যকালে সন্তানের শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশের প্রধান সময়।" Hodson ঠিক তেমনিই লিখেছেন—

"There are other situations, besides those of poverty, infirmity, or old age, where parents ought to desire consoltaion from the attentions of a child of riper years ;"

সন্তান যে পিতামাতার আত্মীয়-স্বজনের আচার-আচরণ দ্বারাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়, যেমনটি দেখে তেমনটি আচরিত হয় তাদেরও জীবনে ; এবং এই স্বাভাবিক নিয়মের জন্য সন্তানের পিতামাতার যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সে বিষয়েও Hodson এবং অক্ষয়কুমার একই মত পোষণ করেন। Hodson বলেন—

"If you would have your children good and virtuous, your own lives must be the faithful comments on your precepts. The young and inexperienced mind is more easily led by example, than taught by instructions ; and what example can be so pursuasive, as that of the parents, to whom children look up with the gratitude due to continued obligations."

অন্যদিকে অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"শিশুগণ যেমন দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেই রূপ কর্ম্ম করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সেই রূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহাদিগের সেইরূপ প্রকৃতি জন্মানো সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। অতএব, বালকবালিকাদিগকে সুশীতল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনকজননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেইরূপ হইতে হয়।"

সন্তান সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে পিতামাতার পক্ষে যে রূঢ় আচরণ করা কখনোই উচিত নয় সে বিষয়েও Hodson-র মতামত প্রকাশিত হয়েছে।—

"And yet it frequently happens, that where the duty of parental care is fully admitted, parents endeavour to produce the great ends of it by severity and force, rather than by kindness and address. In these cases, generally speaking, the event will be disappointment."৩৪

নীতিবিষয়ক রচনা হিসাবে 'চারুপাঠে'র বহু রচনা (যেমন বিদ্যাশিক্ষা, আত্মগ্লানি, আত্মপ্রসাদ, পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, মিত্রতা প্রভৃতি) অক্ষয়-কুমারের নীতিচিন্তারই প্রকাশ-রূপ, তবে এ রচনাগুলি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত, মৌলিক নয়।

অক্ষয়কুমারের এই নীতিচর্চার মূল্যবিচার প্রসঙ্গে এই কথাই বলা যায় যে, এই নীতিবোধ পাশ্চাত্য প্রেরণাজাত কিনা সে প্রশ্ন বড় নয়, বড় সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের সঙ্গে বিজড়িত লেখকের শিল্পচৈতন্য। ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে অক্ষয়-মানসিকতার এই নীতিবোধ নিছক পাশ্চাত্য প্রেরণার ফল নয়, স্বদেশের সমকালীন সামাজিক আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। এ ধরনের সামাজিক আন্দোলন সব কালেই সব দেশে সম্ভব (যেমন ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক পরিবেশ)। কিন্তু মনে রাখা দরকার অক্ষয়কুমারের চা. পা. (৩)'র নীতিবিষয়ক রচনাগুলির সময়ও ওদেশের Samuel-র (১৮১২—১৯০৪) *Self Help* (1859) বা

Character (1871) প্রকাশিত হয় নি। অতএব অক্ষয়-মানসিকতার নীতিবোধ-সম্পৃক্ত ধর্মচেতনা প্রাচ্য মনীষারই ফল, সমকালীন যুগপরিবেশে পুষ্ট ; তবে তা হয়ত পাশ্চাত্য ধারণায় প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠেছে।

১। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ২৫।

গোলকনাথের 'হিতোপদেশ' সম্পর্কে রেভা: লঙ সাহেব লিখেছেন, "Next to the Bible this work has been translated into the greatest number of languages.... and at the best 200,000 copies have been printed in Bengali."

২। Jhonson, Samuel, (1709-1784), *Rasseles* (1759)।

৩। ব্রাহ্মণ সেবধি, ১৮২১ দ্র: রামমোহন গ্রন্থাবলী ৫, ব. সা. প. ১৯৫৮, ৫।

৪। রামমোহন রায়, পূর্বে উল্লিখিত, ৭-৩১।

Das, S. K., *Bengal's Response to Christianity* (1800-1850), D. U. 1965, 8.

৫। বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : (২ খণ্ড), ৪৮২-৪৮৫।

৬। Das, S. K., *op. cit*., 9.

৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ফাল্গুন, ১৯ সংখ্যা, ১৮৪৫।

৮। Das, S. K., *op. cit*, 12.

৯। অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০।

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু, কলিকাতা, (১৯০৯), ১০৭।

১১। তদেব, ১০৬।

১২। তদেব, ১২১।

১৩। তদেব, ৮৮।

১৪। Legouis, Emili, *A short History of English Literature*, London, 1934.

১৫। Dasgupta, R. K., *Raja Rammohon Roy and International Order* : Raja Rammohon Ray, Delhi University, 1966, 23.

("When we recall Rammohon's most significant pronouncement on a world society,. perhaps the first of its kind made by an Asian in the modern age, we at once discover that it is not prompted by considerations of political convenience but is essentially an expression of faith in the unity of all mankind.")

১৬। Sophia, Dobson, Collet., *Life and Letters of Raja Rammohon Roy*, Cal. 1913, 227।

১৭। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নীতিসংক্রান্ত বই পাঠ্য ছিল। যেমন : কঠোপনিষৎ, তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা, জ্ঞানার্ণব, মনোরঞ্জন ইতিহাস, নীতিকথা (১, ২ ভাগ)।

১৮। David, Thomson, *England in the Nineteenth Century*, London, 1950, 109.

১৯। রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, ১৮৭৪ (সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ, ১৯৫৬) ৩২-৩৩।

২০। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ: ১৯৫২), ৬৭।

২১। বর্ধমান জেলার দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর বড় কন্যা বিরাজমোহিনীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়।

২২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ, ৯৫২) ৬৭।

২৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৪০ সংখ্যা, চৈত্র (১৭৭৬ শক) ১৮৫৪। দ্র: বিনয় ঘোষ, পূর্বে উল্লিখিত, ১০৪।

২৪। তদেব, ১৫৪-'৫৫।

২৫। বাহ্যবস্তু, (১ম ভাগ) ১৮৫১, বিজ্ঞাপন, ২-৩।

২৬। বাহ্যবস্তু, (১ম ভাগ)।

২৭। তদেব, (২য় ভাগ), ১২।

২৮। ২১ অক্টোবর, ১৭৮৮ এডিনবারায় কুমের জন্ম হয়। অক্ষয়কুমারের চেয়ে বয়সে প্রায় বত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন। অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা'ও (১৮৫৬) প্রকাশিত হবার পর ১৮৫৮-য় কুমের মৃত্যু হয়।

২৯। মাত্র ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি এদেশে দুষ্প্রাপ্য। বইটির প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ আছে, "১৭৬৬ শকে ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের গৃহে মধ্যে মধ্যে সমাজ-দিবস ভিন্ন অন্য দিবসে ধর্ম্ম-বিষয়ে এক-একটি প্রস্তাব পঠিত হয়। তন্মধ্যে এটি পঞ্চম প্রস্তাব।"

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুস্তকটির একটি কপি আছে 'কল' নম্বর Beng. $\frac{42}{1}$

৩০। ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব, (১৮৮৫), ২-৩।

৩১। ২১২ পৃষ্ঠায় এবং ১০ পরিচ্ছেদের এই গ্রন্থটির মূল বস্তু-বিষয় হল: ধর্মাচরণে শৈথিল্যের কারণ (on the decrease of religion), বর্তমান ধর্মপ্রবৃত্তির কারণানুসন্ধান (enquiry into the present state of religious mindedness), বর্তমান উপকার প্রবৃত্তির কারণানুসন্ধান (enquiry into the present state of benevolence), সমকালীন শিক্ষাবিধি (on the present state of education), এছাড়া duties of parents, on the duties of the children, relative duties of the minister and people etc.

৩২। Hodson, Septinus,, *Sermons on the Present State of Religion*, London (1742), 101

৩৩। ধর্ম্মনীতি (১৮৫৫), ১৪১।

৩৪। Hodson, *op. cit.*, 106.

অক্ষয়কুমার : ঐতিহাসিক রচনা

History শব্দের প্রচলিত বাংলা অর্থ ইতিহাস ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে History শব্দের অভিধা আরও ব্যাপকতর। Collins-র Dictionary-তে (1911) এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "Train of events, public or private ; course of life or existence ; systematic account of phenomena."[১] Chamber's Dictionary-তে বলা হয়েছে, "a systematic account of the origin and progress of the world, a nation, an institution, a science."[২] অন্যত্রও History শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "The word 'history' comes from *historia*, a Greek word meaning knowledge obtained by inquiry or a written account of one's inquiries."[৩]

অতএব ইতিহাস অর্থ কেবল অতীত ঘটনার বিবরণ নয়, তার চেয়েও কিছু বেশী ; এবং এই ব্যাপকতর অভিধানুসারে অক্ষয়কুমারের তিনখানি গ্রন্থ আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গ্রন্থ তিনখানি হল ১. বাষ্পীয় রথারোহী, ২. ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় এবং ৩. প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার (১৯০১)।

বাংলা ভাষায় ইতিহাস-সাধনা বাংলাগদ্যের প্রাথমিক পর্যায়েই শুরু হয়। ১৮০১-এ প্রকাশিত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এই বিষয়ক প্রথম পুস্তক।[৪] ইতিহাস-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) এবং প্রায় ঐ সময়েরই লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' (১৮০৮), এ-ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ও পরে কৃষ্ণচন্দ্রের কার্যবিধি এই গ্রন্থের উপজীব্য। রাজাবলির উপজীব্য কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজদের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজারাজড়াদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কয়েকজন বিদেশী লেখক ছিলেন যাঁদের চেষ্টায় অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাস-বিষয়ক রচনাও পুষ্টি লাভ করেছিল। যেমন

ফেলিক্স কেরীর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮১৯)[৫], জন স্টুয়ার্টের Moral Tales of History-র অনুবাদ 'নীতিগল্পের ইতিহাস' (তারিখ বিহীন) এবং শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত 'সদবীর্যগুণ' (১৮২৯)। 'সদবীর্যগুণে' প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রের ঘটনাবিষয়ক কতকগুলি 'চূর্ণকে'র সমষ্টি স্থান পেয়েছে।

উনবিংশ শতকে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্য যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল কলিকাতা স্কুল বুক স্যোসাইটি (১৮১৭) তাদের মধ্যে অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরেই, বাংলাগদ্য গঠনে এই স্যোসাইটি'র অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বলে ধরা হয়। যথাসম্ভব সুলভে পাঠ্যপুস্তক প্রচার করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ধর্ম। ফেলিক্স কেরী ও জন স্টুয়ার্টের পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ-দুটি ব্যতীত পিয়ার্সনের সম্পাদনায় 'ইতিহাস-সমুচ্চয়'ও (ইতিহাসখ্যাত মানুষ ও ঘটনাবলীর সঙ্কলন) (১৮৩০), এই স্যোসাইটি'র মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। 'সত্য ইতিহাস' (১৮৩০), 'প্রাচীন ইতিহাস' (১৮৩০), 'গ্রীক ইতিহাস' (১৮৪০) প্রভৃতি ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থাদি স্কুল বুক স্যোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থটিতে মিশর, গ্রীস, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, রোম প্রভৃতি জায়গা ও সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইতিহাস-সাধনার এই ধারা পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ সেনের 'ভারতের ইতিহাস' (১৮৩৯), 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪০), মার্শম্যানের *History of India* (undated) এবং *History of Bengal* (undated) পুস্তক-দুটির বঙ্গানুবাদ। বিদ্যাসাগরের 'বাংলা ইতিহাস' (১৮৪৯) পলাশির যুদ্ধ থেকে বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত মার্শম্যানের ইংরেজী ইতিহাস-বিষয়ক রচনার বঙ্গানুবাদ। ১৮৪৩-এ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Mrs. Trimmer'র *Bible History*-র বঙ্গানুবাদ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান এর পরেই স্মরণীয়। 'পল মুরের জীবনী' (১৮৫০), 'খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য' (১৮৫১), 'গ্যালিলিও চরিত্র' (১৮৫১), 'ইজিপ্ট পুরাবৃত্ত' (১৮৫৭), 'জীবনবৃত্তান্ত (তারিখ বিহীন) প্রভৃতি ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সবই কৃষ্ণমোহন কতৃক অনূদিত।

বাংলা ভাষার ইতিহাস-সাধনায় এই ধারারই লেখক ছিলেন অক্ষয়-কুমার। স্কুল বুক স্যোসাইটি, ট্রাস্ট স্যোসাইটি এবং শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেস উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারকল্পে যেমন সাহায্য করেছিল, তেমনি সে সময়ের মনীষীজন বাংলা ভাষা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মে ও কথায় এবং বাস্তবে তাঁর সর্বপ্রকার প্রচলনও প্রার্থনা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন এমনি একজন মনীষী। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা, মাতৃভাষার প্রচার তাঁর একান্ত কাম্যও ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ভাষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। অবশ্য তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তা কেবল ছাত্রপাঠ্য রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সাধারণের জন্য তিনি বিজ্ঞান, নীতি, ইতিহাস-বিষয়ক ছোট বড় নানান ধরনের গ্রন্থাদিও রচনা করেছিলেন। স্বদেশের জাতি ও সভ্যতা, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ইতিহাসও তিনি রচনা করেছিলেন।

তাঁর ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে বাংলা তথা ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনযাত্রায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার কিরূপ ছিল তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক প্রাচীন বৈদিকযুগের জীবনযাত্রার কথাও উল্লেখ করেছেন, দেখিয়েছেন হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসও কত প্রাচীন ছিল। কেবল প্রাচীনই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্কও ছিল আবহমান কালের। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ভারতবর্ষীয় ধর্মসম্প্রদায়ের তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু ঐ বিবরণ একটি ধর্মীয়-গোষ্ঠীর ধর্মচিন্তার বর্ণনা নয়, ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসকদের জীবন ও কর্মের একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়ও ; ধর্মসম্প্রদায়গুলির জীবনাচরণের কথা, সমকালীন রাষ্ট্রচেতনা এবং সমাজ ও ধর্মবোধের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। 'বাষ্পীয় রথারোহী' পুস্তিকাটিতেও ভারতীয় সভ্যতার উন্নতির পরিচয় দিয়েছেন। রেলগাড়ীর প্রথম প্রচলনে জনসাধারণের শুভাশুভমিশ্রিত ফলাফল সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখকের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ কোন চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষিত হয় না। কিন্তু ইতিহাস অর্থ কেবল অতীত ঘটনার বিবরণ নয়, যে কোন "knowledge obtained by inquiry"। সেদিক থেকে এবং "progress of the world, nation and

science-র পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি, রেলগাড়ীর প্রথম প্রচলনের কথা-বর্ণিত এই পুস্তিকাটিও ঐতিহাসিক। অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক রচনাগুলি অনূদিত ছিল ; সেদিক থেকে এই রচনাগুলি মৌলিকও বটে।

'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৯০১) অক্ষয়কুমারের ৩৬ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধের পুস্তক-রূপ। তাঁর মৃত্যুর পনের বৎসর পরে রজনীনাথ দত্ত-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত আকারে, প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন অংশে এ সম্পর্কে লেখাও হয়েছে—

> "আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবেক। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড। বর্তমান পুস্তকে যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ বা অযৌক্তিক কথা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমার, আমার স্বর্গীয় পিতার নহে।"

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা থেকে শুরু করে বৈদিকযুগে ভারতের হিন্দু-সমাজের জীবন-আচরণ প্রণালী পরবর্তীকালীন হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশর ফিনিশ শহরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, রামায়ণ-মহাভারতে হিন্দুদিগের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক কেমন ছিল তারও আলোচনা হয়েছে বইটিতে। পরিশেষে গ্রন্থকার লিখেছেন—

> "এতদ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অবগত হইতেছি যে, অতি পূর্ব্বকালে বেদাদি শাস্ত্র রচনার সময়ে ও তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুগণ সমুদ্রযোগে দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিয়াও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইত না, জাতিবিভক্ত হইলেও জাতিভ্রষ্ট হইত না।"[৬]

এ পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫)। বইটির শেষ-দুটি পৃষ্ঠায় 'চার্টে'র আকারে গাড়ীভাড়া ও গাড়ীর সময়সূচীর উল্লেখ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও রেলগাড়ী ছিল বিস্ময়কর বস্তু। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু এবং মানব-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মনে স্বভাবতই এই নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল জেগেছিল। রেলগাড়ীর যান্ত্রিক রহস্য ও তার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক তাঁর মতামত জানিয়েছেন। কেবল যুগের সমকালীন একটি বিস্ময়ের জন্যই নয়, এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবকল্যাণের জন্য আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার দোষ, গুণ সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা

পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্য স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পুলকিত লেখক পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, "এক শতাব্দ পূর্ব্বে গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ছয় মাসের পথ ছয় দিবসে উত্তীর্ণ হওয়া অতি বিস্ময়কর অসম্ভব ব্যাপার বিবেচনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,*[৭] অধুনা বাষ্পীয় রথের প্রসাদে উহা সহজ ব্যাপার বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"[৮] কিন্তু মানবজীবন-অভিজ্ঞ অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার-সম্পর্কে সাধারণ জীবনের যে সম্বন্ধ সে সম্পর্কেও তাই বলেছেন, "কিন্তু নরলোকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর পদার্থ অতীব দুর্লভ। রেলের প্রচলন শুভাশুভ মিশ্রিত। তার চলার পথ এবং চলতি যাত্রীদলও এই অপরিহার্য ফলাফলে শৃঙ্খলিত। তবে প্রচলিত দুর্ঘটনার কারণগুলির সঙ্গে তুলনা করে লেখক জেনেছেন যে, "অন্যান্য যানে গড়ে যত ব্যক্তির শরীরপীড়া ও প্রাণবিয়োগ হয়, বাষ্পীয় রথে কদাচ তত ব্যক্তির হয় না।" কেবল তাই নয়, বাষ্পীয় শকটে যে দুর্ঘটনা ঘটে তার অধিকাংশই আবার যাত্রীদের নিজেদের দোষে। অক্ষয়কুমারের মতে তাই, "তাঁহাদের আপন দোষে যাবতীয় বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, তাঁহারা সাবধান ও সতর্ক হইয়া অবশ্যই তাহা নিবারণ করিতে পারেন।" সভ্যতার চিহ্ন যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির পরে নির্ভরশীল এবং পথ ও যান যে "বাণিজ্যের জীবন স্বরূপ" তিনি তাও উপলব্ধি করেছিলেন।

> "যে জনপদে গমনাগমন ও দ্রব্যাদি বহনের সদুপায় নির্দ্ধারিত নাই, তত্রস্থ লোকের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হওয়া কোনরূপে সম্ভব নহে। যে দেশে দ্রুতগামী যান ও সুপরিষ্কৃত পথ বিদ্যমান নাই, সে দেশের লোক কদাচ সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"[৯]

সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে উনবিংশ শতকের পঞ্চদশ পাদে অক্ষয়কুমার যে মন্তব্য করেছেন তা কালাতিক্রম্য। গ্রাহ্য মন্তব্য বলে সম্ভবত তা আজও বিচার্য। Hudson-কথিত সেই ইতিহাস-বিষয়ক রচনার গুণও পুস্তিকাটিতে বিদ্যমান। It represents "faithfully the manners, tone, and temper of the age with which it deals".[১০] এ সবের উর্দ্ধেও অনুন্নত দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে বাস্তব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, স্থানে স্থানে জীবনরসিকের দৃষ্টিতে মানবজীবন-প্রসঙ্গেও ইঙ্গিত করেছেন। অতি ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাটির মধ্যে অক্ষয়কুমারের মানসিকতার বিবিধ দিক উন্মোচিত হয়েছে, গ্রন্থটির মূল্যও এইখানে।

আলোচ্য পর্বের শেষ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,' প্রথম ভাগ ১৮৭০-এ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৮৩-তে। এই গ্রন্থই অক্ষয়কুমারের জীবনের সর্বশেষ রচনা। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় এই গ্রন্থের তথ্য-সংগ্রহের সন্ধান দিয়েছেন।[১১]

"কিরূপে এই উপাসক-সম্প্রদায় রচিত ও সংগৃহীত হইল, এক্ষণে পাঠকগণকে অবগত করা আবশ্যক। কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইঁহারা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয় দাস কর্ত্তৃক ব্রজভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পাণ্ডিত শ্রীমান হ. হ. উইলসন ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী উপাসক-সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক রিসার্চ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশখণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিবর্জন ও সংশোধন করা হইয়াছে এ কথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন এই প্রথমভাগে রামসনেহী, বিথলভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী, প্রভৃতি আর ২২টি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০টি কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।"[১২]

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের উপর Horace Hayman Wilson (1786-1860)[১৩] *Religious Sects of the Hindus* (1862) বইটির প্রভাব কিরূপ কতটা আছে তা বিচার করে দেখা আবশ্যক। Asiatic Research

Society-র সম্পাদক হিসাবে Wilson যখন কাজ করতেন তখন ১৮২৮-এ স্যোসাইটি-র পত্রিকার ষোড়শ সংখ্যায়' *A sketch of the Religious Sects of the Hindus* নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ স্যোসাইটি-র সপ্তদশ সংখ্যায় (১৮৩২) মুদ্রিত হয়। ১৮৪৬-এ আবার প্রবন্ধ-দুটি একত্রে মুদ্রিত হয়।[১৪]

অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের মূল সম্প্রদায়-বিভাগ পাঁচটি ; যথা বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। অন্যান্য উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলি এই মূল বিভাগেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি এখানে প্রদত্ত চার্ট-দুটি থেকে স্পষ্ট হবে।

Wilson-র ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিভাগ নিম্নমত।

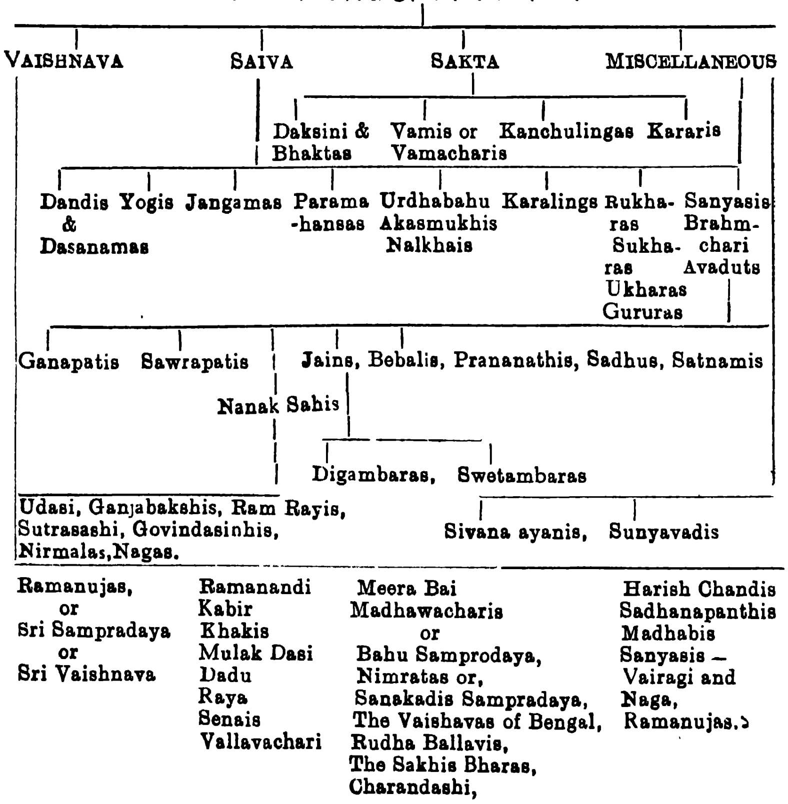

১ Wilson, H. H., *Op. Cit.* 1

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' অনুযায়ী ধর্মসম্প্রদায়-বিভাগ

- **বৈষ্ণব**
  - ানুজ, বিষ্ণুস্বামী | নিম্বাদিত্য সনকাদি সম্প্রদায়, রামসনেহী, বল্লভাচারী, চৈতন্যসম্প্রদায়, হরিশ্চন্দী, সধ্ন, মাধবী, চুহঁড়, কুড়া, | চরণদাসী, কর্ত্তাভজা, মার্গী, পল্টুদাসী, সৎনামী, সাঁই, মধ্বাচার্য
  - সনকাদি সম্প্রদায়
    - মধ্বেনী
    - মটুক ধারী
  - চৈতন্যসম্প্রদায়
    - নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত
      - দায়ক, বাউল, ন্যাড়া, সজো, গোরাবাদী, সাঁই, দরবেশ, পুরুষীয়, হরিবোলা, বলরামী, সাধিনী, রাধাবল্লভী, ভাবক, উৎকলদেশীয়, গোপ, বৈষ্ণব, বিন্দুধারী, বরাজী, সৎকুল, যোগিগিরি, ব্রাহ্মণ-করণ, নিহঙ্গ, বিরকত, গ্যাহত, চামার বৈষ্ণব, প্রভৃতি।
  - রামানন্দী (রামানন্দের শিষ্য সকলের নাম)
    - কবীর, রখদাস বা রুইদাস, সেন, কীল, মলুকদাস, সুরসুরানন্দ, নরহরি, রঘুনাথ, নাভাজি, সূরদাস, তুলসীদাস, জয়দেব
      - দাদু
        - বিরক্ত
          - বৈষ্ণব নাগা
          - শাক্ত নাগা
        - নাগা
        - বিস্তর ধারী
      - বৈরাগী
      - জগন্মোহিনী
  - এ ছাড়া ভা. উ স. (২) পরিশিষ্টে আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, যথা : নিরক্ষয়ী সাধু মানভাজ, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া, নেম বৈষ্ণব, কেউড়দাস, ফকির সম্প্রদায়, কুড়ু পাতিয়া, (খোজা), দশমার্গী, শাস্ত্রী, নরেশ-পন্থী, পাঙ্গুল।
    - দ্রঃ ভা. উ. স. (২) পরিশিষ্ট, ৪॥
- **শৈব**
  - শিবারাধনা, দণ্ডী, দশানাম', ঘরবারী, কুটীচক, বহুদক, হংসপরমাহংস, অওঘর, গুদড়, অবধূতানী, ঘরবার, সন্ন্যাসিনী, ঠিকরনাথ, স্বর্ত্তঙ্গী, ত্যাগ, আতুবসন্ন্যাসী, ব্রহ্মবিচারী, যোগী, কণফটযোগী, অঘোরপন্থী, যোগিনী, সংযোগী, লিঙ্গোপাসনা, চোপা, দশনামী, জট, চন্দ্রভাঁট, নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উর্দ্ধবাহু-পঞ্চধুনী, মৌনব্রতী, জলশয্যা, কড়ালিঙ্গী, করারী, দুর্বাধারী, অলূনা প্রভৃতি।
- **শাক্ত**
  - সন্ন্যাসী (অবধূত)
    - নামসন্ন্যাস
    - কর্ম্মসন্ন্যাস
    - ষটসন্ন্যাস
    - সন্ন্যাসীর বেশভূষা
    - সন্ন্যাসীর মঠ আখড়াদি, জগৎমার্গ
    - সন্ন্যাসীর জমাৎ, আহার, ব্যবহার।
  - পশ্বাচারী, বীরাচারী,
  - বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, স্বৈরাচার প্রভৃতি।
  - চলিয়াপন্থী,
  - করারী,
  - ভৈরব ও ভৈরবী
  - শীতলা পণ্ডিত
- **সৌর**
- **গাণপত্য**

স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে অক্ষয়কুমারের সম্প্রদায়-পরিচিতি উইলসনের সম্প্রদায় পরিচিতি থেকে অনেক বিশদ। উইলসনের মূলবিভাগ চারটি যথা—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এবং বিবিধ। অক্ষয়কুমারের মূল বিভাগ পাঁচটি এবং কোন 'বিবিধ' বিভাগ নেই। উইলসনে সর্বমোট ৪৩টি সম্প্রদায়ের কথা আছে, পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দুটি ভাগে পরিশিষ্ট ব্যতীতই মূল বর্ণনাতে ১০৬টি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। প্রথম ভাগে তো কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখার বর্ণনাতেই বক্তব্য পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগেও কেবল শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের বর্ণনা। সৌর ও গাণপত্যের বর্ণনা নিয়ে তৃতীয় খণ্ড রচনার অপূর্ণ ইচ্ছা রেখেই অক্ষয়কুমার ইহলোক ত্যাগ করেন।

অক্ষয়কুমার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপসম্প্রদায়রূপে চৈতন্য-সম্প্রদায় ও চৈতন্যশাখা-সম্প্রদায়ের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, উইলসনের গ্রন্থে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনামাত্র এবং এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও নামটি স্বতন্ত্র, 'বাংলার বৈষ্ণব' (Vaishnabas of Bengal)। বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের cult বা শাস্ত্রীয় রীতিনীতি চৈতন্যভক্তদের মাধ্যমে রূপ, জীব, গোপাল প্রভৃতি ষট্‌গোস্বামীর প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল; সেদিক থেকে বাংলার বৈষ্ণব নামের তুলনায় চৈতন্য-সম্প্রদায় নামই অধিকতর সার্থক বলে মনে হয়। অক্ষয়কুমার চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখাবিভাগই দেখিয়েছেন প্রায় ২৫টি। চৈতন্য-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মূল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও ১৬টি বিভাগে বিন্যস্ত। রামানন্দী সম্প্রদায়েরও ১২টি বিভাগ দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে, উইলসন মোট ২০টি সম্প্রদায়-বিবরণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়েছেন। বিবিধ শ্রেণীর অন্তর্গত উইলসনের জৈন সম্প্রদায়, বাবালালি সম্প্রদায় এবং শিবনারায়ণী সম্প্রদায় অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের কোন খণ্ডেই প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এগুলির বিশদতর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।[১৫]

উদাহরণ স্বরূপ—

জৈন, হিতৈষী, (পৌষ-চৈত্র), ১৮৯৮ (১৩০৫)

বাবালালি, তদেব, (মাঘ), ১৮৯৮ (১৩০৫)

শিবনারায়ণী, সাহিত্য (বৈশাখ), ১৮৯৯ (১৩০৬)

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রবাসী (শ্রাবণ) ১৯১০ (১৩১০)।

গ্রন্থারম্ভেও উভয়ের অমিল স্পষ্ট। ভা. উ. স. ১ম ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছেন—

"হিন্দুধর্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে, ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।"

অপর পক্ষে Wilson, Introductory Observation-এ লিখছেন—

"The Hindu religion is a term, that has been hitherto employed in a collective sense, to designate a faith and worship of an almost endlessly diversified description : to trace of its varieties is the object of the present enquiry."[১৬]

হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে লেখক সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকের ভঙ্গীতে ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্রের কালানুক্রমিক সমর্থন উদ্ধার করেছেন। যেমন—অমরকোষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্য-ভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়ঃ॥[১৭] বক্তব্য সমর্থনের জন্য অক্ষয়কুমার অন্যতর আর একটি উপায়ও অবলম্বন করেছেন যা কেবল উইলসনের বক্তব্য উপস্থাপনার পদ্ধতি থেকেই স্বতন্ত্র নয়, ঊনবিংশ শতকের অক্ষয়-সমকালীন বাংলাভাষার বিদগ্ধ মহলেও অক্ষয়কুমারের একটি স্বতন্ত্র স্থান সৃষ্টি করেছে। এটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থিত করে বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সমর্থনের পদ্ধতি। ভাষাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই অক্ষয়কুমার বিশ্লেষণ করেছেন—

"লাটিন ও গ্রীক, কোলটিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও স্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসীক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" ...."এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কতকগুলি শব্দের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কালে উহারা সকলেই এক-ভাষী ও এক জাতি-নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারেনা।"[১৮]

এই সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ভাষার analogy-সম্পন্ন শব্দও তুলেছেন।[১৯] যেমন—

সংস্কৃত	আবস্তিক	পারসীক	গ্রীক	লাটিন
দদামি	দধামি	দেহম্	ডিডোমী	ডো
অস্মি	অহ্মি	হস্তম্ । অস্তম্	এস্মি	সম্
মাতৃ	মাতৃ	মাদর	মাটর	×
×	×	×	×	×
লাটিন	জর্ম্মেন	ইংরেজী	চলিত বাংলা	×
মাটর	মুতের	মদর	মা	×

সর্বনাম-বাচক শব্দের সৌসাদৃশ্য

অহম্ ১মা বিভক্তি অজেম মা (বহুবচন) মা মা মা আই আমি
ত্বম্ নিষ্পন্ন তূম তূ মূ টূ টূ জৌ, ইউ তুমি।তুই।তু

সংখ্যা-বাচক শব্দের সৌসাদৃশ্য

নবন্ (ভু) নবংন্ নোহ্ হেনিয়া নবেম্ নয়িন্ নাইন্ নয়।

Wilson-র বর্ণনায় কোথাও এই ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের তথ্যসঙ্কলনের যে কারণ ও উৎস অক্ষয়কুমার বর্ণনা করেছেন Wilson-র বর্ণনাতেও তারি সমর্থন ও সঙ্গতি চোখে পড়ে। যেমন—

"The works attended to are in the Persian language though both were written by Hindi authors ; the first was compiled by Sital Sinha, Munshi to the Raja of Benaras ; The second by Mathura Nath, a librarian of the Hindu College, at the same city, a man of great personal respectability and eminent acquirements."[২০]

অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু অংশ লক্ষিত হয় যেগুলি Wilson-র *Religious Sects of the Hindus*-র আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায় ; যেমন, রামানুজ-সম্প্রদায় সম্পর্কে উইলসনের বইতে লেখা হয়েছে—

"The most striking peculiarties in the practice of this sect, are the individual preparation and scrupulous privacy of their meals ; they must not eat in cotton garments, but having bathed, must put on woollen silk : the teachers allow their select pupils to assist them, but, in general all the Ramanujas cook for themselves and should the meal during this process, or whilst they are eating, attract even the looks of a stranger of the operation is instantly stopped, and the viands burried in the ground."[২১]

অন্যদিকে অক্ষয়কুমার রামানুজ-সম্প্রদায় প্রসঙ্গে লিখছেন—

"অন্নপাক বিষয়ে অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীবৈষ্ণবদিগের অনেক-অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিধেয় নহে, স্নাত হইয়া পট্টবাস বা লোমজ বস্ত্র পরিধান করাই নিতান্ত আবশ্যক। ইঁহারা পরান্ন ভোজন করেন না, নিজ হস্তেই অন্নপাক করেন, তবে আচার্য্যেরা তদ্বিষয়ে শিষ্য-বিশেষের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রন্ধন বা ভোজন-কালে অপরের দৃষ্টিপাত হইলে তৎক্ষণাৎ সে কর্মে নিরস্ত হন এবং ঐ সকল খাদ্যসামগ্রী ভূমিগর্ভে নিহিত হয়।"[২২]

Wilson-র সুরসুরানন্দ—

"Sursuranand : we have a silly enough story of some cakes that were given to him by a Mlechchha being changed when in his mouth into a Tulsi leaf."

অক্ষয়কুমার—

"ভক্তমালেও যতখানি উপাখ্যান, সকলেই এরূপ অদ্ভুত। সুরসুরানন্দ রামানন্দ স্বামীর অন্য এক শিষ্য। তদীয় চরিত্র-বর্ণন-স্থলে লিখিত আছে,

একজন ম্লেচ্ছ তাঁহাকে কতিপয় পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা তাহার মুখান্তর্গত হইবামাত্র তুলসী-পত্র হইল।"[২৩]

তুলসীদাস সম্পর্কেও উভয়ের বর্ণনা বস্তুত এক কেবল ভাষা অন্য। *Religious Sects*-এ বলা হচ্ছে,—

"The account of Tulsi Das in the Bhaktamala represents him as having been incited to the peculiar adoration of Rama by the remonstrances of his wife, to whom he was passionately attached ; he adopted a vagrant life, visited Banaras, and afterwards went to Chitrakuta, where he had a personal interview with Hanuman, from whom he received his poetical inspiration, and the powerof working miracles"[২৪]

অক্ষয়কুমার এ প্রসঙ্গে লিখছেন—

"ভক্তমালে বর্ণিত আছে, তুলসীদাস স্বকীয় পত্নী কর্ত্তৃক রামোপসনায় প্রবর্ত্তিত হন। অনন্তর তিনি দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া কাশীধাম সন্দর্শন পূর্ব্বক চিত্রকূটে উপস্থিত হন। সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং হনুমান তাহাকে কবিত্ব-শক্তি ও আলোকিত কৃতিত্বশক্তি প্রদান করেন।"[২৫]

কিন্তু অক্ষয়কুমার সর্বত্র উইলসনের অবিকল অনুসরণ করেন নি। অনেকস্থলে Wilson-র মন্তব্যের প্রতিবাদও করেছেন এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন। যেমন রামানন্দ-সম্প্রদায় সম্পর্কে উভয়ের ধারণার পার্থক্য লক্ষিত হয়। Wilson এ বিষয়ে লিখেছেন—

"The followers of Ramanand are much better known than those of Ramanuja in upper Hindusthan : they are usually considered as a branch of Ramanuja sect, and address their devotions peculiarity to Ramchandra, and the devine manifiestations connected with Vishnu in that incarnation, as Sita, Lakshmana, and Hanumana."[২৬]

অক্ষয়কুমার—

"ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রামানুজ অপেক্ষা রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের নাম

প্রসিদ্ধ। তাঁহারা রামচন্দ্র ও তৎসহবর্ত্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করেন। কেহ কেহ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানন্দকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা কোনক্রমে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। রামানুজের শিষ্য-পরম্পরার যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তদনুসারে তাঁহার পরম্পরাগতশিষ্য-প্রণালী মধ্যে রামানন্দ চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যথা—

রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইলে শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দ স্বামীরও এই শতাব্দীর আরম্ভে, না হয় কিছু পূর্ব্বেও জীবিত থাকাই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব হয়। অতএব তিনি রামানুজের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, যে সময় তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব, তাহা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং তিনি রামানুজের শিষ্যপরম্পরার অন্তর্গত কিনা তাহাও সন্দেহ-স্থল।[২৭]

জয়দেব সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের বক্তব্য Wilson-র বক্তব্য থেকে অধিক তথ্য-বহুল। Wilson বলেছেন—

Jayadeva was an inhabitant of a village called Kenduvilla, where he had an ascetic life, and was distinguished for his poetical powers, and the fervour of his devotion to Vishnu.[২৮]

পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার জয়দেবের জন্মস্থান সম্পর্কে যে সমস্যা প্রচলিত আছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন—

তিনি প্রতিদিন জাহ্নবী-জলে অবগাহন করিতেন। গঙ্গা তখন জয়দেবের নিজগ্রাম কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ অন্তরিত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার গমনাগমনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয় দেখিয়া, গঙ্গা দেবী জয়দেবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আর এতাদৃশ পর্য্যটনক্লেশ স্বীকার করিও না, আমিই তোমার নিকটস্থ হইতেছি। জয়দেব জাহ্নবীর বাক্য সাঙ্গীকার করিলেন এবং জাহ্নবী কেন্দুবিল্বের নিকট দিয়া বহিতে

লাগিলেন। উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে কেন্দুবিল্ব গ্রাম গঙ্গাতীরস্থ বলিয়া অনুভব হইতে পারে। কিন্তু তীরভূমির প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের তীরে কেন্দুলি নামে একখানি গ্রাম আছে, বৈষ্ণবেরা তাহাকেই জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর পৌষমাসে তথায় জয়দেবের স্মরণার্থ একটি মেলা হইয়া থাকে।[২৯]

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে *Sketch of the Religious Sects of the Hindus*-এর (XVI, vol., Asiatic Research Papers 1928 ; XVII, Vol., A. R. P., 1832) প্রভাব এবং অক্ষয়কুমারের স্বাতন্ত্র্য বা মৌলিকতা বিচার এই গ্রন্থের বড় বিবেচ্য বিষয় নয়, বড় বিষয় ঊনবিংশ শতকের সংগঠন-পর্বের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত, প্রাচ্য মনীষীর মানসিকতায় সমগ্র ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের এরূপ একটি সুশৃঙ্খলিত ইতিহাস রচনার প্রেরণা সার্থকতর রূপ পেল কি করে, তাই। ইতিহাস-রাজনীতির পটভূমিকায় ধর্মের এরূপ পরিচিতির উল্লেখ্য পূর্বপ্রয়াস তো আর লক্ষিত হয় না। নীচের উদ্ধৃতি তিনটিই এ সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রমাণ হতে পারে।

ক. সিংহল ও ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধদিগের মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ঘটে। ইহা হইলে ঐ খোদিত লিপি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছে বলিতে হয়।[৩০]

খ. শুদ্রকের কৃত মৃচ্ছকটিক এবং কবি কালিদাসের কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রায় প্রচলিত অন্য অন্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের সময়ে শৈবধর্ম-প্রচার থাকিবার বহুতর প্রদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে।[৩১]

গ. তখন শাজাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনয়ন নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন এবং তিনি উপস্থিত হইলে পর, কহিলেন, তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর। অবশেষে জাহাঙ্গির বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬৮০ সম্বতে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।[৩২]

সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনেও অক্ষয়কুমার চিন্তিত ছিলেন। শৈব-সম্প্রদায়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে তাই লিখেছেন—

এ দেশীয় লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিকতর অর্থের প্রয়োজন

হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু অনেকে চিরজীবন কেবল অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক তাহা সঞ্চয়, ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া আয়ুঃ শেষ করেন। তাহারা এইরূপ ব্যবহার করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য জানেন। মনুষ্যপদের উপযুক্ত কোন হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, একবার চিন্তাও করেন না। আত্ম ও জনসমাজ সম্বন্ধীয় লঘুগুরু কত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, সে বিষয় একবার মনেও করেন না। নিজ নিজ লেখনীকে রঙ্গভূমির অসুন্দর-রূপ নৃত্যকরী বিকলাঙ্গী নর্ত্তকীর সজ্জায় সজ্জিত এবং পিতামহী ও মাতামহীর নিকট শিক্ষিতরূপে উপন্যাস-অনুবাদাদি অর্থকরী বিদ্যার অনুপযুক্ত দাসীত্ব-পদে-নিযুক্ত করিবার প্রথা এ দেশীয় বিদ্যাভিমানীর অনেক গ্রন্থকারেরই বিদ্যা ফলোৎপত্তির পরিসীমা হইয়া রহিল। নানা কারণ বশতঃ ভূলোকের কল্যাণকর ও নরকুলের উন্নতিসাধক গুরুতর বিষয়ে আমাদের আর মতিগতি হইল না। এ দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞান-বিশেষের অনুশীলন ব্রতে ব্রতী হইয়া তৎসংক্রান্ত অভিনব তত্ত্ব নিরূপণ চেষ্টায় কালাতিপাত পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিতেছেন এই চিরাভিলষিত বিষয়টি দর্শন ও শ্রবণ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।[৩৩]

এই স্বদেশপ্রীতি অক্ষয়কুমারের মুহূর্তের উদ্দীপনা নয়, আন্তরিক। আন্তরিক বলেই সমকালীন সমাজের অবক্ষয় এবং আলস্য-প্রীতিতে সংক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং জ্বালাময়ী মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে রামমোহনের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হয়েছে তাঁতেও তাঁর স্বদেশপ্রীতি-সম্পৃক্ত সমাজচিন্তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রামমোহন-সম্পর্কিত এই মন্তব্যটিতে অক্ষয়কুমারের শিল্প-শোভন জোরালো গদ্যেরও সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষিত হয়। মন্তব্যটি দীর্ঘ, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বোধে তার অংশ-বিশেষ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।

Strange is it that such a man should have been given by India to the world.

Strange it is—but he was not of India, so much as for India.— Rev. W. J. Fox's Sermon

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহিয়সী কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশ্যে অর্ধ ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে।

বৃষ্টল! বৃষ্টল! তুমি কি সর্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফলরাশি উৎপংস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষমূলে সাঙ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ!

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে। সেইদিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ- শূন্য-শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ। দুঃখজীবি কৃষিজীবিগণ, যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনেও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃসহ দুঃখরাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান পূর্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়-ভূমির আশ্রয়লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ!

ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপে দুঃখ বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতিসাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থা ও তন্নিবন্ধনে স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্রুবারি সমস্তই নিবারণ-পূর্বক ভারত-মণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমার সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ।

বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারতভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেইদিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

*　　*　　*　　*

Being dead, he yet speaketh with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generation.

—Fox's Sermon

Though dead, he yet speaketh, and the voice will be heard impressively from the tomb, which, in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect

—Dr. Carpenter's Sermon

…। ভাগ্যে সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ডভূমিতে গমন করেন, তাই তাঁহার একটি রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল, ভারতবর্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত অঙ্কন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দারা তাঁহার ঋণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা কি অতিমাত্র উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ, কি নরাধম![৩৪]

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় অক্ষয়কুমারের শেষ গ্রন্থ। রোগের যন্ত্রণায়, বয়সের ভারে লেখক তখন কর্মজগৎ থেকে প্রায় অবসর গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থ তাঁর অর্ধ-সমাপ্ত রচনা. কিন্তু এই অসমাপ্ত রচনার মধ্যেই রচয়িতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের পরিচয়। ধর্মচেতনা, সমাজচিন্তা, সাহিত্যিক রচনা ও স্বদেশভক্তিতে পূর্ণ এই বিশাল ধর্মের ইতিহাস তাঁর জীবন-অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিতে সম্পন্ন। ধর্ম ও ইতিহাসের পটভূমিতে ভারতবর্ষের আত্মার পরিচিতি, অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্তি।

১। Collins, *New Gem Dictionary*, London, (1911) Ed. Earnest Weekely and Scott Anne (1960), 251

২। Chamber's *Twentieth Century Dictionary*, London (1901), Ed. William Geddie, (1955), 501

৩। *Childrens Britannica*, Vol. 5, History, London, (1961), 318. (Herodotus নামক একজন গ্রীক মনীষী প্রথম এই ধরনের ইতিহাস রচনা করেন। আনুমানিক 425 B. C. তে তিনি মারা যান)।

৪। Long., J. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, Calcutta, (1855) দ্রঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (১৮৯৬), ৬৫৬।

৫। Goldsmith'র *History of England*'র অনুবাদ।

৬। প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার, (১৯০১), ১৭৭।

৭। * এই তারকা-চিহ্ন উদ্ধৃতির মধ্যে লেখকই ব্যবহার করেছেন এবং পুস্তকাটির পাদটীকায় ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

* "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥ —বিদ্যাসুন্দর।"

৮। বাষ্পীয় রথারোহী, ১।

৯। তদেব।

১০। Hudson William, Henry., *An Introduction to the Study of Literature*, London (1910), 1942, 213.

১১। ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কি ইংরেজী, কি জার্ম্মান, কি ফ্রেঞ্চ, কি লাটিন, কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক-সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা-প্রণালী ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি উইলসন সাহেবের Hindu Sects নামক গ্রন্থ হইতে সকল কথাই লইয়াছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। উইলসনের Hindu Sects-এ যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা তাঁহার পুস্তকে আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি উইলসনের Hindu Sects হইতে কিছুই লন নাই। তৎকালে কলিকাতায় একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ ব্যক্তি কলিকাতায় কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থান, কি উড়িয়া, কি মাড়োয়ারী সকল জাতিরই সহিত বেশ মিলিতে পারিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া তাহাদের নিগূঢ় খবরগুলি আনিয়া দিতে পারিতেন। তিনি উইলসন সাহেবেরও মুরুব্বি, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তেরও মুরুব্বি। সুতরাং দুইখানি পুস্তকের অনেক কথা একইরূপে লিখিত হইয়াছে। আমাকে যাঁহারা বলিয়াছেন, এই ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

দ্রঃ হরপ্রসাদ রচনাবলী, সম্পাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৬, ২২৮।

১২। ভা. উঃ স. (১ ভাগ), উপক্রমণিকা ১১৯-২০।

১৩। Horace Hayman Wilson ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৬, লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। Soho-square-এ পড়াশুনো করেন। পরে St. Thomas Hospital-এও শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং

Oxford University'র Boden Sanskrit Chair-এও কাজ করেন। ১৮০৮-এ কলকাতায় আগমন। বিখ্যাত রসায়নবিদ হিসাবে Asiatic Research Society-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮১১-৩৩ পর্যন্ত উক্ত পদে ছিলেন। ৮ মে, ১৮৬০-এ মৃত্যু।

১৪। "These articles reprinted by the Bishop's College Press in 1846, no improvement in this respect was aimed at in the reprint of the work, which appeared at Calcutta in the year 1846."

দ্র: *Religious Sects of the Hindus*, Ed. Rost., R., Calcutta, 1958, preface, 1.

১৫। William, Monier'র *Religious Thought and Life in India, London* 1883, গ্রন্থটিতে বৈদিক ধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের আলোচনা আছে। কিন্তু ভা. উ. স.-এ তার উল্লেখ নেই। কিন্তু Horace, Hayman,. Wilson'র উল্লেখ গ্রন্থটিতে আছে। Wiliam, Monier'র বইটি প্রকাশিত হবার পূর্বে (প্রায় ১৩ বৎসর) ভা. উ. স.'র প্রথম ভাগ (১৮৭০) প্রকাশিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশকাল আর *Religious Thought and Life in India*'র প্রকাশকাল (1883) এক।

১৬। Wilson. H. H., *op. cit.*, Introduc,, 1.

১৭। ভা. উ. স., (১), ৮। অমরকোষ ব্যতীত মনুসংহিতা, ঋক্‌বেদ, অথর্ববেদ, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি থেকে বহু উদ্ধৃতি লেখক ব্যবহার করে বক্তব্য সমর্থন করেছেন।—(দ্র: ভা. উ. স. (১), ৮-১৫)।

১৮। তদেব, ১, পাদটীকা, ৪।

১৯। তদেব, ৫।

২০। Wilson, *op. cit*, 5,

২১। Ibid, 19.

২২। ভা. উ. স, (১), ১১।

২৩। তদেব, ৩১।

২৪। Wilson, *op cit*, 33.

২৫। ভা. উ, স, ৩১।

২৬। Wilson, *op cit*, 23,

২৭। ভা. উ, স, (১), ১৯-২০।

২৮। Wilson, *op. cit*, 34.

২৯। ভা. উ, স. (১), ৩৯।

৩০। ভা. উ. স, (২), ২১৬।

৩১। তদেব, (২)।

৩২। ভা. উ. স, (১) ৩৪-৩৬।

৩৩। তদেব, ২২৫।

৩৪। ভা. উ. স. (২), উপক্রমণিকা, ৩৮-৩৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অক্ষয়কুমার : ভাষা ও অলঙ্কার

॥ শব্দ ॥

লেখক মাত্রেরই ভাষা-প্রয়োগের একটি বিশিষ্ট রীতি থাকে। ভাষা-প্রয়োগের বিশ্লেষণে লেখকের রচনারীতি, তথা তাঁর শিল্পীস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের রচনারীতি বা 'স্টাইলে'র আলোচনায় সেজন্য প্রথমে প্রয়োজন তাঁর ভাষার বিশ্লেষণ। এই ভাষা-বিশ্লেষণের প্রধান অংশগুলো হবে ১. শব্দ, ২. শব্দগুচ্ছ, ৩. শব্দক্রম বা শব্দ-সজ্জা, ৪. বাক্য-বিন্যাস, ৫. যতি-চিহ্ন, ৬. অনুচ্ছেদ প্রভৃতি। অংশগুলি একে একে আলোচ্য।

১

বাংলা শব্দগুলিকে মোট চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে,—তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী। তৎসম, ও তদ্ভব শ্রেণীর অন্তর্বর্তী আর এক শ্রেণীর শব্দের কথা প্রচলিত আছে যা সাধারণত অর্ধ-তৎসম নামে পরিচিত।[১] কোন্ শ্রেণীর শব্দের প্রতি লেখকের প্রবণতা বা আসক্তি আছে যদি বোঝা যায় তাহ'লে লেখককেও বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আলোচনা স্পষ্ট করার জন্য প্রথমেই অক্ষয়কুমারের রচনা থেকে যথেচ্ছভাবে কয়েকটি অংশ তুলে শব্দগুলিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

ক. সংখ্যক অনুচ্ছেদ :

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ-খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি, অন্ত, কার্যকারণ, সুখ-দুঃখ, কর্মাকর্ম সমুদায় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জলকল্লোলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শরশর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি-সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোনস্থানে কেবল নবীন দুর্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ-ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ-সমূহ, কোথাও নদী

বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্যাপ্ত আনন্দলাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ-দীপ্ত-হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল, ততদূরেই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।[২]

খ

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদবিষয়ক-বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেও কত কত অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া পুলকিত হইতে হয়। আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ডে গোপাদপ নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার স্কন্ধ হইতে সুস্বাদ সুগন্ধ পুষ্টিকর দুগ্ধ নির্গত হয়। তথাকার অনেক লোকে তাহা পান করে ও তাহাতে অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য সিক্ত করিয়া ভক্ষণ করে। আফ্রিকা-খণ্ডে মেদবৃক্ষ নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফল হইতে অত্যুত্তম নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাতে ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদ হয়। যেরূপ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিদিগের সন্তান উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিয়মও তদনুরূপ। এই গ্রন্থের অন্যভাগে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইবে। এই সকল প্রীতিকর বিষয় পাঠ করিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রফুল্ল না হয়?[৩]

গ

'ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল'

বাহ্যবস্তু সমুদায়ের যেরূপ শৃঙ্খলা ও আমারদের মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখঘটনা হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি (ভু) আচরণ করিলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এবং নানাপ্রকার সাংসারিক সুখ উৎপন্ন হয়, আর তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে সেই সমস্ত পরম-সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক যন্ত্রণা ও সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।[৪]

ঘ

স্থিতিবিরোধ : জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে, দুই দ্রব্য একসময়ে একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে স্থিতিবিরোধ বলা যায়। বস্তুর বিস্তৃতিগুণ স্বীকার করিলেই স্থিতিবিরোধ-গুণ স্বীকার করিতে হয়। সমুদায় পরমাণুই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া স্থিতি করে, অন্য পরমাণুর সে সময়ে সে স্থানে স্থিতি করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কর্দ্দমের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয়, আম্রফলে ছুরিকা প্রবিষ্ট হয়, ঘৃত-কুম্ভে হস্ত প্রবিষ্ট হয় যথার্থ বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট জানা যায়, যে কর্দ্দম, আম্র ও ঘৃতকুম্ভের যে যে স্থানে অঙ্গুলি ছুরিকা বা হস্ত প্রবিষ্ট হয়, সে সে স্থানে কর্দ্দমাদির একটি পরমাণুও থাকে না। ছুরিকাদি ঐ সকল দ্রব্যের কতকগুলি পরমাণু স্থানান্তর করিয়া আপনারা তাহার স্থানে স্থিতি করে।[৫]

ঙ

কোন দিক্ দিয়া কিরূপে অবতরণ করিলে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। যে স্থলে বাষ্পীয় রথের দুই পথ পরস্পর পাশাপাশি থাকে, সে স্থলে সারথীরা প্রচলিত রীত্যনুসারে বামদিকের পথ দিয়া আপন রথ চালনা করে। উভয় পথের রথ পরস্পর আহত হইয়া ভগ্ন না হয় এই নিমিত্ত, ঐ উভয় পথের মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ স্থান শূন্য থাকে। যে রথের যে দ্বার সেই স্থানের দিকে থাকে, সে রথের কোন ব্যক্তি সে দ্বার দিয়া সেই স্থানে অবরোহণ করিলে, পার্শ্ববর্ত্তী পথের রথ দ্বারা আহত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক এই বিধান পালন না করাতে, অনেক স্থানে অনেক অনেক ব্যক্তির প্রাণ-সংহার হইয়াছে। অতএব, সে দিক দিয়া অবতীর্ণ না হইয়া অন্যদিকের দ্বার দিয়া অবতরণ করাই শ্রেয়ঃ কল্প। তাহা হইলে, আর কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা থাকে না।[৬]

চ

প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, সূর্য্য যেমন নিজে তেজোময়, চন্দ্র সেরূপ নয়। সূর্য্যের রশ্মি পাইয়া চন্দ্র প্রকাশ পায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে, সে ভাগ সূর্য্যরশ্মি পাইয়া প্রকাশিত হয়। আর যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সে ভাগ ঐ রশ্মি না পাওয়াতে

অপ্রকাশিত থাকে। এই নিমিত্ত সে সময়ে আমরা চন্দ্রও দেখিতে পাই না।

পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নিরূপিত আছে, তদনুসারে কোন কোন অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে, এই নিমিত্ত কেবল সেই অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল অমাবস্যাতেই চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের সেইরূপ মধ্যবর্ত্তিনী হয় না, সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে না।[৮]

বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির প্রথম একশটি শব্দের মধ্যে আমাদের গণনার কাজ সীমাবদ্ধ রাখা হল। গোত্র অনুযায়ী তদ্ভব, তৎসম, দেশী, বিদেশী এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করলে অনুচ্ছেদগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির নিম্নলিখিত বিন্যাসরূপ লক্ষিত হয়।

শব্দের গোত্র	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
তৎসম	৮৩%	৭১%	৭২%	৬৫%	৫৫%	৫৬%
তদ্ভব	১৭%	২৮%	২৮%	৩৫%	৪৩%	৪৪%
দেশী	০%	১%	১%	০%	১%	০%

দেখা যাচ্ছে, অক্ষয়কুমারের রচনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। তারপর তদ্ভব। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে তৎসম শব্দ-ব্যবহারে ভাষায় গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের ব্যবহার দুর্বোধ্যতাও সৃষ্টি করে। বা তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে ভাষা প্রাঞ্জল হয়। সাধারণ সত্য হিসাবে শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে এই প্রচলিত ধারণার যথেষ্ট মূল্য না থাকলেও সম্পূর্ণ অহেতুকও নয়। Contextual বা বিষয়গত আলোচনা থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

শব্দের গোত্রগত আলোচনায় লক্ষ্য করা হয়েছে যে, উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি বিভিন্ন বিষয়ক রচনার অংশ—ক-অনুচ্ছেদটি, সাহিত্যবিষয়ক, গ-অনুচ্ছেদটি ধর্মবিষয়ক, ঘ-অনুচ্ছেদটি বিজ্ঞানবিষয়ক। এই বিষয়ভেদে রচনার বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন সংখ্যক তদ্ভব, তৎসম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ক-অনুচ্ছেদটিতে সর্বাধিক তৎসম শব্দ এবং সর্বাপেক্ষা কম তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গ-অনুচ্ছেদে তৎসম শব্দের ব্যবহার ১১% কম, এবং ১১% বেশী তদ্ভব শব্দের ব্যবহার। কিন্তু ঘ-অনুচ্ছেদে ৬৫% তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং ৩৫% তদ্ভব শব্দের ব্যবহার, অর্থাৎ ক-অনুচ্ছেদের তুলনায় ঘ-অনুচ্ছেদের তৎসম শব্দ-ব্যবহার ২৮% কম, এবং তদ্ভব শব্দের ব্যবহার ১৮% বেশী। এই সংখ্যাগুলি থেকেই দেখা যায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাতে অক্ষয়কুমারের তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা নিঃসন্দেহে সাহিত্যবিষয়ক এবং নীতি, বা ধর্মবিষয়ক রচনায় তৎসম শব্দ-ব্যবহারের প্রবণতা থেকে কম। শুধু কম নয়, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয় তাও পরিভাষামূলক। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট এবং আদর্শ পুস্তক অক্ষয়কুমারের পূর্বে বিশেষ ছিল না। অক্ষয়কুমার ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অনিবার্যভাবেই তাই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পরিভাষা সৃষ্টিও তাঁকে করতে হয়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, পরিভাষার জন্য তাঁকে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। Botany শব্দের পরিভাষা তাই, খ-অনুচ্ছেদে উদ্ভিদ-বিষয়ক বিদ্যা এবং ঘ-অনুচ্ছেদে Atom শব্দের বাংলা পরিভাষা 'পরমাণু' করেছেন; তৎসম শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বিষয়ভেদে সাহিত্যবিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ সকল রচনার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় যে, বহু তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার তদ্ভব রূপ ব্যাপক ব্যবহৃত হলেই ভাষার বোধগম্যতা বিনষ্ট হত। যেমন: ক-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত তৎসম শব্দ 'সুন্দর' 'জল' 'আনন্দ'; খ-অনুচ্ছেদের 'প্রফুল্ল', 'সুগন্ধ', 'উৎপন্ন'; ঙ-অনুচ্ছেদের 'প্রাণ', 'আশঙ্কা' 'আহত' প্রভৃতি। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ রূপেই এগুলি স্বাভাবিক। অতএব বিষয়ভেদে সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার কম-বেশী হলেও তৎসম শব্দ মাত্রই তা ভাষার বোধগম্যতার বাধা এবং তদ্ভব শব্দের ব্যবহার মাত্রেই ভাষার বোধগম্যতার স্পষ্টরূপ সৃষ্টি হবে বা হয়, এরূপ কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় না, দেখা যাচ্ছে। আসলে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ অথবা তদ্ভব শব্দ যাই হোক না কেন, তার ব্যবহার-রীতির উপর ভাষার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং ভাষার ঔৎকর্ষ নির্ভর করে। অতি-প্রচলিত, স্বাভাবিকগ্রাহ্য

যে শব্দ তা তৎসম শব্দই হোক, আর তদ্ভব শব্দই হোক, তার ব্যবহারই স্বাভাবিক, সঙ্গত ; অন্য শব্দ সে ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক, অসঙ্গত। অবশ্য সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে অক্ষয়কুমারের মানসিক প্রবণতা তৎসম শব্দের প্রতিই বেশী। এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা জন্মে colligation[৮] বা সামীপ্য, collocation[৯] বা সাযুজ্য'র পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ-আলোচনায়। colligation হল পদসজ্জার স্বাভাবিক ক্রম, যা সব ভাষারই থাকে ; যেমন, ইংরেজী বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম হ'ল : S.V.O. অর্থাৎ কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম—Man is mortal : সংস্কৃত ভাষায় colligation বা সামীপ্য-র কোন একটি সঠিক norm বা স্বাভাবিক ক্রম নাই। অর্থাৎ 'বায়ুর্দ্বিবিধো নিত্যানিত্যশ্চ' লেখাও যা 'নিত্য অনিত্যশ্চ দ্বিবিধবায়ু' লেখাও তা, আবার বায়ুর্দ্বিবিধো অনিত্যনিত্যশ্চ লেখাও একই। বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম হ'ল S.O.V. বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—রাম বই পড়ে। কিন্তু collocation বা শব্দের সাযুজ্য অন্য জিনিস। কতকগুলি শব্দ সর্বদাই কতকগুলি শব্দেরই সাযুজ্য চায়, না পেলে শক্তিমান শিল্পীর রচনায় নূতন শব্দসঙ্গী ব্যবহৃত হয়ে ভাষার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, আর দুর্বল লেখকের রচনায় তার অভাবে বা অসঙ্গত ব্যবহারে ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকুও বিনষ্ট হয়। যেমন, 'শুভদৃষ্টি' শব্দটিতে 'শুভ' ও 'দৃষ্টি' দুটি শব্দেরমধ্যে পারস্পরিক একটি সাযুজ্যবোধ আছে, একটিকে সরিয়ে অন্যটির জন্য যদি পরিবর্ত কোন শব্দ বসানো হয়,—ধরা যাক, 'দৃষ্টি' শব্দটি সরিয়ে 'হাসি' শব্দটি ('শুভহাসি') বসানো হল ; তাহলে ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য-টুকুও নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি, এখানে তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব 'ভাল- বা 'দেখা' বলা চলে না। 'ভাল দৃষ্টি' বা 'ভাল দেখা' অভিপ্রেত অর্থ বহন করে না। শব্দের colligation বা সামীপ্য, ও শব্দের collocation বা সাযুজ্য'র পারস্পরিক সম্পর্কটিও তাই বিবেচ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় colligation বা সামীপ্য হয়তো ঠিকই থাকলো, কিন্তু collocation ঠিক থাকে না। যেমন : রাম (কর্তা), ভাত (কর্ম), পড়ে (ক্রিয়া) শব্দের সামীপ্য অনুযায়ী বাক্যটি নির্ভুল, কিন্তু collocation, বা সাযুজ্য অনুযায়ী অস্বাভাবিক, 'ভাত', ও, 'পড়ে' শব্দ-দুটির সাযুজ্য হয় নি ; হয় 'খায়', নতুবা, 'বই' শব্দের ব্যবহার আবশ্যক এখানে।

কিন্তু শক্তিমান শিল্পীদের রচনায় Collocational exception বা সাযুজ্য-ধর্মী ব্যতিক্রমেই সাহিত্য-শোভন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। লেখকের ব্যক্তিগত শিল্পী-স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। যেমন; দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে বা প্রাচীন জীর্ণশরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ। 'কিরণ-সম্পাত' সাধারণ প্রত্যাশা। চিত্রকল্পটির স্বার্থে 'বক্কিম' কিরণ-সম্পাতও বলা চলে। অথচ 'রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে' ব্যবহার বিসদৃশ লাগে না ; নূতন ব্যবহার নব মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। 'বৃক্ষ' জীর্ণশরীর এবং প্রাচীন হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিশেষণগুলি সচেতন প্রাণীর পক্ষে সহজ প্রযোজ্য। অথচ এ ক্ষেত্রে অচেতন পদার্থে চেতন প্রাণীর গুণারোপ করে লেখক ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। (রবীন্দ্রনাথের 'বিহ্বল বাতাস', 'ক্লান্ত সন্ধ্যা', 'নীল ঘুম' 'স্বপ্নের ঢেউ', 'গল্পপোষা জীব' 'বোবা অন্ধকারের চোখের জল' প্রভৃতি ঐশ্বর্যময় ভাষার শব্দ-সাযুজ্য স্মরণ করা যেতে পারে)।

অক্ষয়কুমারের রচনায় এ ধরনের Collocation ব্যবহারের কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা দেখা যেতে পারে। শব্দ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত ক-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দ ১. 'পুরাতন বৃক্ষ-সমূহ'—স্বাভাবিক ব্যবহার কিন্তু 'প্রাচীন', 'পুরাতন' বিশেষণটি ব্যবহৃত বস্তুর সময় বা কাল-জ্ঞাপক। যেমন, পুরাতন ঘাট, পুরোনো বাড়ী। পক্ষান্তরে 'প্রাচীন' বিশেষণটি দীর্ঘকালীন কোন জিনিসের বয়সের ঐতিহ্যসূচক ব্যবহার। যেমন, প্রাচীন বট, প্রাচীন বৃক্ষ। ২. ক-অনুচ্ছেদে 'যতদূর দৃষ্ট হইল'—'দৃষ্টিগোচর হইল' স্বাভাবিক ব্যবহার। খ-অনুচ্ছেদে, ১. 'সুস্বাদ দুগ্ধ'—'সুস্বাদু' স্বাভাবিক বিণ। গ-অনুচ্ছেদে, 'দুঃখ ঘটনা হয়'—ক্রিয়াপদের স্বাভাবিক ব্যবহার-রূপ, 'দুঃখজনক ঘটনা ঘটে'।

কতকগুলি নূতন Collocation-র ব্যবহার অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন রচনায় লক্ষিত হয়। যেমন : 'চারুপাঠে'—

১. সুস্নিগ্ধ সময় ২. সুললিত সৌন্দর্য-সুধা ৩. দারিদ্র্য-দশা ? ৪. শোক-সন্তাপ ?

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১)-এ।

ক. সুপ্রসন্ন শব্দ খ. সুখপ্রদ ঔষধ গ. নাভাজির প্রাদুর্ভাব ঘ. মৃত্যু-ভূমি ঙ. লোমজ-বস্ত্র।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (২)-এ।

চ. খ-পুষ্প ছ. কর্মচারিত্ব-পদ জ. বেতন-মুদ্রা ঝ. তাল-পত্র ঞ. সম্ভ্রম-উপার্জন।

বলা বাহুল্য, এই নূতন collocations ব্যবহার মাত্রেই যে তা ভাল হয়েছে, এমত দাবী করা যায় না। যেমন 'সুস্নিগ্ধ' শব্দটি যে শব্দটির সাযুজ্য চায় তা 'সময়' নয়। অনভিপ্রেত 'সময়' ব্যবহৃত হয়েছে। সুস্নিগ্ধ বাতাস, সুস্নিগ্ধ পরিবেশ, সুস্নিগ্ধ আলো, প্রভৃতি collocations স্বাভাবিক। অনুরূপ wrong collocation বা পীড়িত শব্দ-সাযুজ্য'র উদাহরণ 'সুপ্রসন্ন শব্দ'।

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত শব্দ-সাযুজ্যের বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে কতকগুলি collocation সত্যিই সুন্দর-কাল্পত; কিন্তু অতিরিক্ত দুই-একটি শব্দ উপসর্গের মত শব্দ-সাযুজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সে-সম্ভাব্য সৌন্দর্য পরিণত হতে পারে নি। যেমন, 'অতি প্রচণ্ড বেগ', 'গভীর ঘোরতর গর্জন', 'নিবিড়-নিস্তব্ধ নির্জ্জন বনখণ্ড'। 'প্রচণ্ড বেগ,' 'ঘোর গর্জন', 'নিস্তব্ধ বনখণ্ড,' প্রভৃতি শব্দ-সাযুজ্যগত সৌন্দর্য যথাক্রমে, 'অতি', 'গভীর', 'তর', 'নিবিড়' 'নির্জন' প্রভৃতি অতিরিক্ত শব্দ-ব্যবহারে আহত হয়েছে। 'ঐ আলোক অতিশয় চঞ্চল' বাক্যটির 'ঐ' নির্দেশক শব্দটি, এবং 'অতিশয়' বিশেষণ-বাচক শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহারে একটি নূতন শব্দ-সাযুজ্যের সম্ভাবনা (New Collocational use) বিনষ্ট হয়েছে। 'আলোক' শব্দ সাধারণত 'উজ্জ্বল' 'ঝলমল' শব্দেরই সঙ্গ কামনা করে। 'চঞ্চল' শব্দটি 'হরিণ', 'বালক', 'পাখী', প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক সঙ্গ। কিন্তু ব্যতিক্রমে অক্ষয়কুমার ভাষার সুষমাই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি হল না; 'আলোক চঞ্চল', বা 'চঞ্চল আলোক', 'অতি', ও, 'অতিশয়', শব্দের ব্যবহারে সুষমাশূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ colligation বা শব্দসামীপ্যের নিয়ম অনুযায়ী বাক্যটির বিন্যাসরূপ নির্ভুল।

প্যাটার্ন বা রূপানুযায়ীও বিশ্লেষণ করা যায় এই সমস্ত collocation-র। যথা—

Pattern Noun বা বিঃ রূপ ঃ

(i) বি+বি,
বেতন+মুদ্রা

(ii) বিঃ+বিঃ,
তাল+পত্র

(iii) বিঃ+বিঃ,
পৃথিবী+পৃষ্ঠ

Pattern Adjective বা বিণ্ রূপ :	Pattern Verb, বিঃ রূপ
1. বিণ্ + বিঃ,	1. বি, বিণ + ক্রি বা ক্রি বি,
ক. স্থির + সমুদ্র	ক. দুঃখ + ঘটনা + হয়।
খ. বিষম + সঙ্কট	খ. যতদূর + দৃষ্ট হইল।
গ. প্রসন্ন + অন্তঃকরণ।	গ. স্থানে + স্থিতি + করে।

অক্ষয়কুমারের সব ব্যবহারই যে সার্থক নয় সে কথা বলা হয়েছে। তাঁর সময়ে গদ্য-রীতি সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হয় নি। অক্ষয়কুমার নিজেও যত বড় শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড় নির্মাতা ছিলেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পুস্তক-রচনা অক্ষয়কুমারের মৌলিক অবদান নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার চেয়েও অক্ষয়-কীর্তি তাঁর ভাষা-সৃষ্টি। বিদেশী গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিভাষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে অক্ষয়কুমারকে স্বভাবতই সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তাই শব্দ-সম্পদের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে তৎসম শব্দের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী করেছেন। 'পরিভাষা' সম্পর্কে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা হয়েছে।

অক্ষয়কুমারের ভাষার শব্দ-সাযুজ্যগত সুষমা অক্ষয়কুমারের শিল্পী-স্বভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় নয় ঠিকই, কিন্তু কতকগুলি শব্দ-সাযুজ্যের (কলোকেশন) ব্যবহার লক্ষিত হয় যেগুলি বিশেষ ভাবে অক্ষয়কুমারের ভাষারই অন্তর্গত। যেমন : 'সুখ-সম্ভোগ', 'ভুবন-বিজয়ী', 'স্থির-সমুদ্র', 'ভগ্ন-স্বাস্থ্য', 'স্বভাব-সিদ্ধ', 'সুন্দর হিল্লোল', 'আন্তরিক যন্ত্রণা' ('আত্যন্তিক যন্ত্রণা-অর্থে) প্রভৃতি। তাঁর রচনায় অনেক শব্দ-সাযুজ্যের ব্যবহারও আছে যেগুলি হয় গতানুগতিক, নয় অস্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক শব্দ-সাযুজ্যের যে অতি অল্প-সার্থক ব্যবহার আছে (যেমন, 'শূন্যগর্ভ অভিমান', 'জ্ঞানলুব্ধ') তা এত অল্প যে, বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ রাখে না।

নূতন শব্দ-সাযুজ্য-সৃষ্টিতে ভাষার যে ঐশ্বর্য রচিত হয়, তার সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার অক্ষয়-রচনায় বিশেষ নেই। তবে শব্দ-সাজুয্যগত ভাষার স্বভাব যে লেখক অনুযায়ী স্বতন্ত্র হয় তার পরিচয় অক্ষয়-রচনায় আছে।

অক্ষয়কুমারের collocation বা শব্দ-সাযুজ্যগত আলোচনার শেষে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যেতে পারে। সাধারণ শব্দের বিশ্লেষণে অক্ষয়কুমারের রচনায় যে তৎসম শব্দের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষিত হয়, তা তাঁর এই

শব্দ-সাযুজ্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য সিদ্ধান্ত। অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃতশব্দ-সাযুজ্যের যে উদাহরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি তার প্রায় সব কটিই তৎসম শব্দে গঠিত। এই তৎসম শব্দ ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রবণতার কারণও স্বাভাবিক। অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যের গঠনপর্বের লেখক। আদর্শ বাংলা গদ্যের বই তাঁর সামনে,ছিল না। অথচ মাতৃভাষা, বাংলার মাধ্যমে দেশের বালক-বালিকা, ও সাধারণ জনচিত্তে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচিতিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অতএব ভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই নূতন বিষয়েই শুধু অক্ষয়কুমার গ্রন্থ রচনা করেন নি, নূতন বিষয়-উপযোগী ভাষাও রচনা করেছিলেন এবং এই ভাষা রচনার জন্য তিনি বাংলা ভাষার উৎস সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যা ছিল না তা সৃষ্টি করতে হলে প্রাথমিক কর্মের দোষ-ত্রুটিও অপরিহার্য। অক্ষয়কুমারের শব্দ-সম্পদেও তার ব্যতিক্রম নেই। তাই 'নয়নদ্বয়-নিয়োজন করা' 'চমৎকারময়' ও 'বিভীষিকা ভাবনা করা' প্রভৃতিরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

তবে ভাষার শব্দ-সাযুজ্যের যে একটি স্বাভাবিক norm আছে সে সম্পর্কে অক্ষয়কুমার যে সম্পূর্ণ অচেতনও ছিলেন তা মনে হয় না। কেন না, অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে রচনার কালানুক্রমে পরবর্তী রচনায়, পূর্ববর্তী রচনায় ব্যবহৃত শব্দ-সাযুজ্যের অসঙ্গতি সংশোধিত রূপে ব্যবহৃত রয়েছে। যেমন ধরা যাক্, অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগে (১৮৫৯) ব্যবহৃত 'পুরাতন-বৃক্ষ' শব্দ-সাযুজ্যটি। 'প্রাচীন' শব্দটির ব্যবহার অধিক স্বাভাবিক ব্যবহার হ্ত বলে বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগে (১৮৮৩) 'প্রাচীন' বিণ-বাচক শব্দটির কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যবহার লক্ষিত হয়, 'প্রাচীন আচার-ব্যবহার'। আবার কতকগুলি collocation আছে যেগুলি periodic, অর্থাৎ সমকালীন যুগের ভাষায় সেটি প্রচলিত, সিদ্ধ। যেমন, 'প্রাদুর্ভাব' শব্দটির ব্যবহার। অক্ষয়-কুমারের রচনায় যতবার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আবির্ভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: 'ব্রাহ্মণ-বর্ণের আধিপত্য অস্বীকার ও অতিক্রম করিয়াই প্রবর্তিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।'—ভা. উ. স. (১)। বা, 'অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির প্রাদুর্ভূত হন।'—তদেব (২)।

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত যে কোন দশটি collocation'-এর বিশ্লেষণ করলেই আলোচিত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। নীচে প্রদত্ত বিশ্লেষণ-চিত্রটিতে শব্দ-সাযুজ্যগত বক্তব্যটির একটি পূর্ণ পরিচিতি পাওয়া যেতে পারে।

	শব্দ-সাযুজ্য	তৎসম	তদ্ভব	গতানুগতিক	সমকালীন	নূতন
১	'বিশ্বাস যান' (করেন অর্থে)	+	–	–	–	+
২	'চমৎকারময়'	+	–	–	–	+
৩	'জন্মস্থান'	+	–	–	–	–
৪	'শূন্য থাকে'	+	–	–	–	+
৫	'সম্ভ্রম উপার্জন'	+	–	–	–	–
৬	'ঋতুস্বভাব'	+	–	–	–	+
৭	'সৌরজগৎ'	+	–	+	–	+
৮	'বৃক্ষপত্রের শর শর (শব্দ)'	+	–	–	–	+
৯	'সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল'	+	–	–	–	+
১০	'প্রাদুর্ভূত'	+	–	–	+	–

চিহ্ন সঙ্কেত—

+ = আছে।

– = নাই।

॥ সমাস ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যে সমাস ব্যবহারের প্রাবল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমাস ব্যবহার অবশ্য কখনই বাংলা গদ্যে

পরিত্যক্ত হয় নি বা হতে পারে না। কারণ তা বাংলা ভাষা-রীতির মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গীভূত। কিন্তু সমাসের আধিক্যে বা বৈচিত্র্যে তা কখনও কখনও রীতির স্বাভাবিকতায় লক্ষণীয় স্থান নির্ণয় করে নেয়। অক্ষয়কুমারের রচনায় ভাষা-ব্যবহার-আলোচনায় তাই তার সমাসগুলির আলোচনাও বিশেষ প্রয়োজন।

সমাস-শূন্য অক্ষয়-রচনা প্রায় নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রধানত দুটি দিক থেকে সমাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, সমাস-গঠনে সমাসের সংখ্যাভিত্তিক উপস্থিতি, বা ক'টি পদে এক-একটি সমাস গঠিত হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা। দ্বিতীয়ত, সমাস-নিষ্পন্ন পদটির স্বভাব-বিশ্লেষণ, অর্থাৎ চরিত্রানুযায়ী কতটা বাংলা সমাসের স্বভাবসিদ্ধ আর কতটাই বা সংস্কৃত সমাসের স্বভাবসিদ্ধ তার বিশদ বিশ্লেষণের পূর্বে সমাস সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য প্রয়োজন।

সমাস-ব্যবহৃত ভাষামাত্রেই সমাসাক্রান্ত ভাষা নয়। কারণ, বহু সমাসবদ্ধ পদ আছে, যেমন: বিদ্যালয়, প্রধানশিক্ষক, রাজপুত্র, যেগুলি সমাসবদ্ধ পদ রূপেই সহজে ব্যবহার হয়, সমাসভঙ্গ পদ রূপে, বিভক্তি-প্রযুক্ত রূপে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে; যেমন: বিদ্যার আলয়, প্রধান যে শিক্ষক, রাজার পুত্র। সমাসবদ্ধ পদ রূপেই এগুলির প্রচলন, অন্যথায় সমাসভঙ্গ, বিভক্তিযুক্ত পদ রূপে এগুলির ব্যবহার অর্থবোধে অস্পষ্টতা জন্মায়। অক্ষয়কুমারের ভাষাতে সমাসের এই সহজ ব্যবহার কতটা আছে দেখা যেতে পারে।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', ১ম গ্রন্থে:

১. লোকান্তর	৫. হিন্দু-ধর্ম
২. পঞ্চভূত	৬. পাপ-পুঞ্জ
৩. পরমেশ্বর	৭. বজ্রাঘাত
৪. পশুপক্ষী	৮. পীতাম্বর

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', ২য়:

১. দিগ্বিজয়	৩. কুম্ভকার
২. রাজমহিষী	৪. রাজপথ

এই শব্দগুলি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে সমাস হিসেবে গণ্য হলেও ব্যবহারের দিক থেকে এদের তৎসম শব্দরূপেই গণ্য করা যেতে পারে। ব্যবহারের

দিক থেকে এ-সমাসগুলি সরল। আলোচনার সুবিধার জন্য এই ধরণের অপরিহার্য সমাসবদ্ধ পদগুলিকে সরল সমাস (Simple compound) বলা চলে। আলোচ্য প্রসঙ্গে সমাস-সংক্রান্ত আরও একপ্রকার ব্যবহারের উল্লেখ প্রয়োজন। এই ব্যবহার-রীতিটি প্রকৃতপক্ষে একটি সমাসের ব্যবহার নয়, কিন্তু সমাসের ইতিহাস-বিজড়িত, ব্যবহার-রূপ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাসবদ্ধ পদটি ঠিক ব্যবহৃত হয় না, সমাসের ব্যাস-বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: অক্ষয়কুমারের রচনায়—

১. 'যোগমায়ার মন্দির' (স্বাভাবিক ব্যবহার যোগমায়া-মন্দির, তুলনা: কালীর মন্দির=কালীমন্দির)—চারুপাঠ (৩) ৮৩।

২. 'চক্ষুর তারা' (চক্ষুতারা, স্বাভাবিক)—চারুপাঠ (৩) ১০০।

৩. বাদশাহের রাজত্বের শেষে (বাদশাহী রাজত্বের শেষে, বাদশাহের রাজত্ব-শেষে)—ভা. উ. স. (১) ৮১।

৪. 'ধর্মের নিমিত্ত আত্মীয়' (ধর্মাত্মীয়)—তদেব, ২৯।

৫. শোকের বার্তা (শোকবার্তা)—চারুপাঠ (২) ৮৮।

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত এই ব্যাস-বাক্যের আলোচনাকালে একটি কথা ভাববার আছে। অক্ষয়কুমারের পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে যে গদ্য-নিদর্শন ছিল তাও, বিশেষভাবে তৎসম শব্দেই গঠিত ছিল। সামনে গ্রহণযোগ্য আদর্শ বাংলা গদ্যের অভাব ছিল। অনিবার্যভাবেই তাই তাঁর রচনাতে তৎসম শব্দ প্রাধান্য পেয়েছিল। পূর্বাধ্যায়ে শব্দ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ-তথ্যের বিশদ আলোচনাও করা হয়েছে। এখন এই ব্যাস-বাক্যগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষিত হচ্ছে যে বিভক্তির ব্যবহার করে সমাসবদ্ধ পদ সোজাসুজি ব্যবহার না করে, অর্থাৎ পুরাপুরি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে গঠিত সমাসের হুবহু ব্যবহারের পরিবর্তে লেখক যেন ভাষার একটু নববৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার হলেও অক্ষয়কুমারের রচনায় এই বিভক্তি-যুক্ত ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার পার্থক্যটির প্রতিই যেন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছে। একটু বাংলা করার প্রয়াস।

২

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত সমাসগুলির সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রধানত ২, ৩, ৪, ও ৫ পদে সংগঠিত সমাসেরই ব্যবহার তিনি করেছেন। যেমন—

১. দ্বিপদী সমাসের ব্যবহার—'মানসিক-স্তূপ', 'বিদ্বেষ-বচন', 'কৃতজ্ঞতারস'—ভা. উ. স. (২) ২২৪-'২৬।

২. ত্রিপদী সমাসের ব্যবহার—'ব্যাভিচার-রূপ-পাপ'—ধর্মনীতি, ৯৩। 'বন্ধুত্ব-ঘটিত-কর্তব্য'—চা. পা. (৩) ২৭। 'শরীর-বিধান-বেত্তা'—বাহ্যবস্তু (১) ৩২।

৩. চারপদী সমাস—'ঘন-পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষ'—চা. পা. (৩) ৭। 'লালসা রূপ অগ্নিশিখা'—তদেব, (১) ৩১। 'ধর্ম-শাসন-সংস্থাপক-পাত্র—চা. পা. (২), ১২।

৪. পঞ্চপদী সমাস—'নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ-ক্ষেত্র'—চা. পা. (৩) ২। 'স্বদেশ-অনুরাগী-চির-প্রবাসী-ব্যক্তি'—চা. পা. (১)। 'সাধারণতন্ত্র-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী-সেনা-সংক্রান্ত-লোক'—চা. পা. (২)। 'চমৎকার-সম্বলিত-ভক্তিরস-অমৃত'—চা. পা. (৩) ৯৫।

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত সমাসগুলির সংখ্যাভিত্তিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলে আরও লক্ষিত হয় যে, দ্বিপদী-সমাসের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ত্রিপদী, চৌপদী, বা তার উর্দ্ধের পদে সংগঠিত সমাসের ব্যবহার বেশ কম। শব্দ- বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির যে কোন তিনটি ধরা যাক; ক. ঘ এবং ঙ পরিচ্ছেদগুলিতে ব্যবহৃত সমাসগুলির একটি হিসাব করলেই এ মন্তব্যের সমর্থন মিলবে।

বিষয়	অনুচ্ছেদ	২ পদ	৩ পদ	৪ পদ	৫ পদ	৬ পদ
সাহিত্য	ক	১৫%	×	১%	১%	১৭%
বিজ্ঞান	ঘ	৬%	×	×	×	৬%
অন্যান্য	ঙ	৫%	×	×	×	৫%

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ক-অনুচ্ছেদে দ্বিপদী সমাসের ব্যবহার সর্বাধিক। ঘ-অনুচ্ছেদে এবং ঙ-অনুচ্ছেদে সমাসের ব্যবহারই তুলনামূলকভাবে কম। যতটুকু ব্যবহৃত হয়েছে তা অবিমিশ্রভাবে দ্বিপদী সমাসের ব্যবহার।

সমাসের স্বভাবগত বিশ্লেষণে আমরা সমাসের স্বভাবানুযায়ী দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করতে পারি। ১. তৎসম বা সংস্কৃত সমাস, ২. বাংলা সমাস। যে সমাসের রূপে ও স্বভাবে সংস্কৃত সমাসের রূপ ও স্বভাবের কোন পার্থক্য থাকে না তাকে 'তৎসম সমাস' বলা চলে। যেমন: দশরথাত্মজ, দশাননাত্মজ, সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভৃতি। রামমোহন রায়, সম্ভবত প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা সমাস নিয়ে আলোচনা করেন।[১০] তিনিই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন, যে বাংলা ভাষার স্বভাব সংস্কৃত ভাষার স্বভাব থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি পৃথক বইও রচনা করেন।[১০ক] রামমোহন মনে করতেন বাংলা সমাস ও তার ব্যবহার সীমিত।

তিনি লিখেছেন—

> 'অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি, এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য মতে ব্যবহারে আইসে না। যে সকলের ব্যবহার আছে তাহাকে চারি প্রকারে সঙ্কলন করা যায়।[১১]

এই চার প্রকার বাঙলা সমাস হল—

১. অভিহিত (কর্তা)+কর্ম, বা ক্রিয়ার কর্ম+ক্রিয়ার কর্তা। যথা: হাতভাঙা (ব্যক্তি), 'গাছপাকা' (ফল)।

২. অভিহিত+এ-কার, ও-কার। যথা: তালপুকুরে (এ), বানর-মুখো (ও)। (সম্বন্ধ, বা অধিকরণার্থে), (অভিহিতার্থে)।

৩. বিণ্‌+অভিহিত (এ, ও)। যথা মিস্টিমুখো (ও), কটাচুলে (এ)।

৪. এক জাতীয় শব্দ+এক জাতীয় শব্দ। (সমাসবদ্ধ পদটি 'ক্রিয়া', বা উত্তটক্রিয়া বোঝায়, এবং শেষ পদটি ঈ-কার অন্ত হয়)। যথা: মারামারী, কাটাকাটী, লাঠালাঠী, ইত্যাদি।

এই ধরনের বাংলা সমাসের ব্যবহার কথ্য বাংলার গৃহীত লেখ্য রূপের যে মান, অর্থাৎ 'চলতি বাংলা' ভাষায়ও অধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অক্ষয়কুমারের সাধুরীতির বাংলা ভাষায় এই ধরনের খাঁটি বাঙলা সমাসের ব্যবহার সহজলভ্য

নয়। কয়েকটি সমাস অবশ্য ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলির রূপগত বিশ্লেষণ অনেকটা এই বাংলা সমাসের মত। যেমন—

১. অভিহিত + কর্ম রূপের, যথা : বিদ্যুৎ + শূন্য (বিভাবরী), আকাশ+ মুখী (সম্প্রদায়)—ভা. উ. স. (২) ১।—ভা. উ. স. (২) ৯৩৯।

২. এক জাতীয় শব্দ + এক জাতীয় শব্দ, যথা : পাশাপাশি, ভাষাভাষী —বাষ্পীয় রথারোহী, ৯।—ভা. উ. স. (১) ১৪।

অক্ষয়-রচনায় সংস্কৃত সমাসের বৈচিত্র্য বিপুল। সংখ্যাভিত্তিক আলোচনাতেও যেমন, সমাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনাতেও তেমন, সংস্কৃত বা তৎসম সমাসের স্বভাবই অক্ষয়কুমারের রচনায় সমাসের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত করে বেশী। অক্ষয়-রচনায় ব্যবহৃত এ-তৎসম সমাসগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

১. ২, ৩, বা ৪, ও তদূর্দ্ধের পদে গঠিত সমাস।

২. সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস, বাংলায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদগুলিই স্বাভাবিক মনে হয় (যেমন : রাজপথ)।

৩. ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার।

৪ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের অতি-প্রীতি।

অক্ষয়-রচনায় সাধারণত এই বৈশিষ্ট্যের সমাসগুলিই অধিক ব্যবহৃত হয়। পরপৃষ্ঠায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ ব্যবহৃত সমাসের কয়েকটি বিশ্লেষণ দেখানো হল। বিশ্লেষণ-চিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রূপগত এবং ব্যাকরণগত ব্যাখ্যানুযায়ী যে-উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সমাসবদ্ধ পদরূপেই অধিক স্বাভাবিক এবং চলিত। সমাসভঙ্গ বিভক্তি-প্রযুক্ত ব্যবহারই বরং অস্বাভাবিক এবং অপ্রচলিত। যেমন দ্বিপদী তৎপুরুষ সমাস 'বিদ্যালয়'কে 'বিদ্যার আলয়'রূপে ব্যবহার করলে রচনার স্বাভাবিক শ্রী যেন আহত হয়। ঠিক তেমনি 'নিত্যানন্দ'র স্থলে 'নিত্য যিনি আনন্দ দান করেন' লেখাতেও অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আবার যে সমস্ত সমাসবদ্ধ পদ সমাসভঙ্গরূপে ব্যবহৃত হলে অধিক সহজ, সাবলীলতা সৃষ্টি হতে পারতো সেগুলি সমাসবদ্ধ পদরূপে অক্ষয়-রচনাতে স্থান পেয়েছে, এমনও দেখা যাচ্ছে। যেমন : 'ভৃগু-পদ-চিহ্ন', 'লালসা রূপ-অগ্নিশিখা' প্রভৃতি।

সমাসের নাম	রূপ ও ২ পদ	রূপ ও ৩ পদ	রূপ ও ৪ পদ	রূপ ও ৫ পদ	সমাসের ব্যাস-বাক্য
তৎপুরুষ	বিণ + ক্রিয়া-অক-বিণ্ আত্ম-বিস্মৃতি, বিদ্যালয় (বি + বি)	×	ধর্ম-শাসন-সংস্থাপক-পাত্র, (বি-বি-বি-বি) চা. পা. (২)	সাধারণতন্ত্র-সংস্থাপন-কাঙ্ক্ষী-সেনা-সংক্রান্ত লোক। চা. পা. (২)	ধর্মের নিমিত্ত আত্মীয়।
দ্বন্দ্ব	স্ত্রী-পুরুষ (বি + বি)।	গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী (বি + বি + বি)।	নিবিড়-নির্জন নিস্তব্ধ-বন-খণ্ড	×	×
বহুব্রীহি	নিত্যানন্দ (বিণ্ + বি)।	শ্রী-বৃন্দাবন-বিহারী (বিণ্-বি-বি)।	ব্যক্তি-বিশেষ-পুরাণ-বক্তা	×	যাহার-মস্তকে-ময়ূর-মুকুট
কর্মধারয়	হৃদয়-কপাট (বি + বি)। চা. পা. (৩)	ভৃগু-পদ-চিহ্ন (বি + বি + বি)।	জ্ঞান-সিন্ধু-স্বরূপ-দীন-বন্ধু চা পা. (৩)	ঘনপল্লবাবৃত (ভূ) নিবিড় বৃক্ষ চা. পা. (৩)	ব্যাভীচার-রূপ পাপ
অব্যয়ীভাব	অনির্বচনীয় (অ + বিণ্)। প্রতিদিন (অ + বি)।	×	×	×	×

(চার্টের যে উদাহরণগুলির উৎসস্থল নির্দেশ করা হয়নি সেগুলি ভা. উ. স. ১ ও ২ ভাগ থেকে গৃহীত)।

ব্যাসবাক্যের ব্যবহারের চেয়ে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারই যে অধিকতর কাম্য তার উদাহরণও অক্ষয়কুমারের রচনায় লক্ষিত হয়, যেমন : 'ধর্ম্মের নিমিত্ত আত্মীয়' (চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্য) অপেক্ষা 'ধর্ম্মাত্মীয়' যেন সহজতর, এবং কাম্য ব্যবহার হত। তেমনি 'যাহার মস্তকে ময়ূর-মুকুট' ব্যবহারের পরিবর্তে 'মুরারি'র ব্যবহার অধিকতর অভিপ্রেত হত। মনে রাখা দরকার এই প্রসঙ্গে আলোচিত সমস্ত সমাসগুলির উদাহরণই তৎসম সমাসের উদাহরণ।

এই আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বলা যায়, সংস্কৃত বা তৎসম সমাস ব্যবহারেই অক্ষয়কুমারের প্রবণতা ছিল বেশী। সমাসের সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ, সংস্কৃত সমাসের আলোচনা, তথা সমাস সম্পর্কে সাধারণ যে আলোচনা করা হয়েছে তা এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন। শব্দ-বিশ্লেষণে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলিতে ব্যবহৃত যে সমাস-বিশ্লেষণের একটি চার্ট আলোচ্য-প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে, এখন সে-চার্ট থেকে আরও একটি তথ্য জানতে পারা যায়, বিষয়ানুযায়ী সমাস-ব্যবহারের পরিবর্তনও অক্ষয়কুমারের এই রচনাগুলিতে দেখা যায়। ক-অনুচ্ছেদটি ছিল সাহিত্যবিষয়ক ; সমাস-ব্যবহারের হার এটিতে সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ ১৭%। ঘ-অনুচ্ছেদটি বিজ্ঞান-বিষয়ক ; সমাস-ব্যবহারের শতকরা হার ৬%। আবার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-বিষয়ক ঙ-অনুচ্ছেদে সমাসের ব্যবহার মাত্র ৫%। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন অক্ষয়কুমারের রচনার সাধারণ ভাষাবৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (২)-এর উপক্রমণিকা অংশে[১২] রামমোহন রায় প্রসঙ্গে লিখিত সংবেদনশীল, আবেগপূর্ণ রচনাংশের মধ্যে ব্যবহৃত সমাসগুলির বিশ্লেষণে, 'চারুপাঠ' (৩)-এর স্বপ্ন-দর্শন-বিষয়ক তিনটি প্রস্তাবেই সমাস-ব্যবহারের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

এ-প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনামূলক রচনাগুলিতে যে-সমস্ত সমাস ব্যবহার করেছেন তা আবেগপূর্ণ, বা সাহিত্যধর্মী রচনায় ব্যবহৃত সমাসের তুলনায় কম[১৩] এবং ব্যবহৃত সমাসগুলিও অধিকাংশই পরিভাষা সৃষ্টির জন্য রচিত। (অক্ষয়কুমারের পরিভাষা-বিষয়ক বিস্তৃত, স্বতন্ত্র অধ্যায় পরে লিখিত হয়েছে)। যেমন : 'কোরাল রক' = 'প্রবাল শৈল', 'প্যাসিফিক ওসান্' = 'স্থির সমুদ্র'। কিন্তু

সমাস-ব্যবহারে অক্ষয়কুমারের মূল প্রবণতা যে সংস্কৃত বা তৎসম সমাস-ব্যবহারের প্রতি ছিল, তার জন্য অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিমানস তথা শিল্পী-স্বভাব যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী দায়ী ছিল তখনকার প্রচলিত ও প্রকাশিত বাংলা গদ্যভাষার নিদর্শন। অক্ষয়কুমার যখন লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁকে দ্বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১. বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শ গ্রন্থের অভাব, ২. বাংলা গদ্যের অপূর্ণতা। অক্ষয়কুমারের রচনাতে এই দ্বিবিধ বাধা অতিক্রম করায় প্রয়াস লক্ষিত হয়। লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমারের ভূমিকাও তাই দু'টি, স্রষ্টা আর নির্মাতা। তাঁকে ভাষা নির্মাণ করে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিল। অনিবার্যভাবে, বাংলা ভাষার মূল সংস্কৃত ভাষার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে বাংলা ভাষার স্বভাব স্বতন্ত্র, এ ধারণা হয়তো তাঁর স্পষ্ট ছিল। হয়তো সেজন্যেই তিনি সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দে গঠিত সমাসও ব্যবহার করেছিলেন তাঁর রচনায়। পূর্বে উল্লেখ করা ব্যাসবাক্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত বা তৎসম সমাসের প্রীতি অক্ষয়কুমার সর্বত্র অনুসরণ করেন নি। সম্ভবত বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বভাব সম্পর্কে তিনি আগ্রহী ছিলেন, বিভক্তি-প্রযুক্ত ব্যাসবাক্যের ব্যবহারে সেই স্বাতন্ত্র্যটিই হয়তো প্রকাশিত হয়েছে। সমাস-ব্যবহারে বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের যে প্রকাশ তাঁর রচনায় লক্ষিত হয় তা তাঁর শিল্পী-চেতনার সচেতন প্রয়াস কিনা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। সচেতন হোক্ বা না হোক্, তিনি যে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সমাস-ব্যবহারের মূল রীতিটি বহুলাংশে সংস্কৃতও (যা বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে)। তাহলে এ সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, তৎসম বা সংস্কৃত সমাস ব্যবহারের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের রচনায় তার থেকে মুক্তির চেষ্টাও আছে।

॥ বাক্যগঠন ॥

অক্ষয়কুমার যখন গদ্য-রচনায় অবতীর্ণ তখন বাংলা বাক্যগঠনের একটি সাধারণ নিয়ম বিভিন্ন লেখক কর্তৃক অনুসৃত হওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৮৩৩-এ প্রকাশিত রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণের অন্বয়বিধি-অংশটিকে

তার প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর রচনায় এবং রামমোহন রায়ের অন্যান্য রচনায় বাক্যগঠন ও শব্দের অন্বয়বিধির যে অনিশ্চয়তা ছিল তা কিন্তু এই সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার রচনায় একটি নিশ্চয়তায় প্রতিষ্ঠিত।[১৪] সম্ভবত লেখকগোষ্ঠী বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার অন্বয়-বিধিকে তখন থেকেই রচনার ভাষা-আদর্শরূপে গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তবে, এই অন্বয়বিধির 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩) লেখকগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত ও প্রসারিত হবার পূর্বে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বলা চলে। অক্ষয়-কুমারের বাক্যগুলির বিচার এইদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এই গদ্যশিল্পী-ত্রয়ীর প্রয়াসে রীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম, কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন, আবেগ-প্রকাশের ক্ষেত্রে) এই স্বাভাবিক ক্রমের পরিবর্তনও দেখা যায়।[১৫] কিন্তু তাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। অক্ষয়কুমার এই স্বাভাবিক ক্রমকেই মূলত অনুসরণ করেছেন। যেমন—

ক. 'হিন্দু-ধর্ম, অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ হইয়াছে।'

—ধর্ম্মোন্নতি প্রসার; (১৮৫৬, ২২ পৃ)।

খ. 'ঐ সমস্ত নৈমিত্তিক রথ অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে গমন করে।'

—বাষ্পীয়···উপদেশ; (১৮৫৪, ১৬ পৃ)।

গ. 'ইঁহারা অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না।'

—ভা. উ. স. (১) ১৮৮৩; ২য় সং ১৮৮৮; ২৯৬ পৃ।

অবশ্য এই ধরনের ছোট, সরল বাক্য দিয়ে একজন লেখক তাঁর সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। ভাব ও বক্তব্য অনুযায়ী বাক্যের গঠনরূপ পরিবর্তিত হয়। এই বাক্যগঠনের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের লেখার কয়েকটি বিশেষ দিকের আলোচনা প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলা গদ্যে 'এবং' শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই অব্যয়টির সাহায্যে একাধিক পদগুচ্ছকে, বাক্যাংশকে এবং বাক্যকে সংযুক্ত করা সম্ভব। বাক্যের মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি না করে শব্দটির ব্যবহার করে অক্ষয়কুমারও বাক্য-নির্মাণের নৈপুণ্য

দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী অনেক লেখকই কিন্তু 'এবং' ব্যবহারে বাক্যের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। যেমন রামরাম বসু, বা মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'রাজাবলি' (১৮০৮, ১০০-১০১ পৃ) গ্রন্থে লিখেছেন—'কান্যকুব্জ্য দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন'।

এই অস্বাভাবিকতার কারণ, দুটি সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে 'এবং' শব্দটির ব্যবহার। অক্ষয়কুমার কিন্তু এদিক থেকে বিশেষ সচেতন শিল্পী ছিলেন। তিনি 'এবং' বা তুল্যশব্দ ব্যবহার করেছেন সাধারণত পদগুচ্ছের (Phrase) মধ্যে, বা বাক্যাংশের (Clause) মধ্যে, কোথাও কোথাও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে। যেমন—

> 'যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, **এবং ভূ-স্বর্গ-সমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকা** ভক্তিপূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট **উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া** কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার **গুণ বর্ণন ও মহিমা কীর্ত্তন** করে, যাঁহার সর্ব্ব-শুভকর উদার চরিত্র আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ **প্রার্থনা করে এবং এক সময়ে** যাঁহার সহিত **সহবাস ও সদালাপ** বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া তল্লাভার্থে যারপরনাই **আগ্রহ ও ঔৎসুক্য** প্রকাশ **করে ও পরে যাঁহার** অসদ্‌ভাবে শোকাকুল হইয়া দুঃসহ ক্লেশানুভব পূর্ব্বক **বিলাপ ও ক্রন্দন করে,** উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য প্রসঙ্গ বলিয়া আমারে ক্ষমা করিও।'[১৬]

দেখা যাচ্ছে এত দীর্ঘ বাক্যটিও 'ও' বা 'এবং' ব্যবহারের জন্য একটু অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে নি। অথচ তুলনামূলক ভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের অত ছোট বাক্যটিও 'এবং' ব্যবহারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। আলোচ্য বাক্যটিতে 'ও' 'এবং' ব্যবহারে একটি পার্থক্য সূচিত করছে কিন্তু। 'এবং' ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যাংশের সংযোজক অব্যয়রূপে, পক্ষান্তরে 'ও' ব্যবহৃত হয়েছে অসমাপিকা বা সমাপিকা ক্রিয়ার (একটির পর, দুটি সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে নয়, অর্থাৎ 'পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ধনী ছিলেন নয়, '**আগ্রহ ও……প্রকাশ করে ও**

……**পূর্ব্বক বিলাপ ও……ক্রন্দন করে)**' বা, শব্দের বা শব্দগুচ্ছের পরে বা মধ্যে।

পদগুচ্ছের মধ্যে 'এবং' বা সমতুল্য শব্দের ব্যবহারেও অক্ষয়কুমারের নৈপুণ্য সমান। যেমন—

১. 'সুচারু সুদূর-গামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধা-সিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, এককালে সকলে মোহিত হইয়া গেল।'

—চা. পা. (৩) ৪৭।

২. তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়।

—(বিহঙ্গম-দেহ, তদেব, ৫৪ পৃ)।

৩. যখন মন্ত্র-পাঠ কালে, বা মক্কা ও মদিনা-তীর্থ ভ্রমণকালে, তোমার অন্তঃকরণ প্রবঞ্চনার আলোচনাতে অনুরক্ত থাকে, তখন মুখ প্রক্ষালন এবং স্নান, জপ ও দেব-বিগ্রহ প্রণামে কি উপকার হইবে?

—ভা. উ. স. (২) ৩৯।

অক্ষয়কুমারের এই 'এবং' সমতুল্য অব্যয়-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যটি বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'এবং' শব্দটি যে অর্থে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত ভাষাতে কিন্তু সে অর্থে ব্যবহৃত হত না। 'চ' বর্ণটি সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থ দেয়, 'এবং' শব্দটি বাংলা ভাষায় সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং স্পষ্টতই কেরী থেকে আরম্ভ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের কারও রচনারই মধ্যে 'এবং' শব্দটির সুষ্ঠু ব্যবহার বিশেষ দেখা যায় না। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনায় 'এবং' এর ব্যবহার স্বতন্ত্র মূল্য দাবী করতে পারে। এবং বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) প্রকাশিত হবার পূর্বেই অক্ষয়কুমারের 'ভূগোল' (১৮৪১) প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভূগোল' গ্রন্থে ব্যবহৃত 'এবং', ও সমতুল্য শব্দের ব্যবহার এদিক থেকে তাহলে প্রথম সার্থক সংযোজক-অব্যয় ব্যবহারের নিদর্শন বলা যেতে পারে।

বাক্যগঠনে ইয়া-ইতে-ইলে জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি বাংলায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যও। বাংলা দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকই এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির বিচিত্র ব্যবহার করেছেন।

এইগুলির ব্যবহারের দ্বারা বাক্যকে যেমন সহজেই দীর্ঘ করা চলে, সেই রকম এগুলির সতর্ক ব্যবহারের দ্বারা বিশেষ আলংকারিক গুণেরও সৃষ্টি হয়। পর পর এই ধরনের কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রযুক্ত পদগুচ্ছ (participial phrase) ব্যবহারে বাক্যে একটি ঘটনা-পরম্পরা, এবং একটি ভাবের ক্রমোন্নতি সৃষ্টি হয়। এমন কি এই শিল্পরীতিতে বক্তব্যের একটি অংশকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখার ফলে পাঠক, বা শ্রোতার চিত্তে একটি কৌতূহল, বা ঔৎসুক্যের বোধও জন্মে, ইংরেজীতে যাকে periodic effect বলা যায়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা যাক—

১. সহজে বাক্যের দৈর্ঘ্য-সৃষ্টিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :

'যিনি ভারতভূমির দুঃখহরণ ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন', 'মানবকুলের হিত সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা' এই মহার্থ-বোধক পরম পবিত্র পার্সিক রচনাটি যিনি সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যকরূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র সংযোগ ভূমণ্ডলে আর কখন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না, যিনি একাধারে সেইরূপ ঐ সমস্ত গুণ **ধারণ পুর্ব্বক** যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন এবং ভূ-স্বর্গ সমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভক্তিপূর্ব্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ **করিয়া** কৃতার্থ হয়, মনের দ্বারা **উদঘাটন পুর্ব্বক** উচ্চৈঃস্বরে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার গুণ-বর্ণন ও মহীমাকীর্তন করে, যাহার সর্বশুভকর উদার চরিত্র আদর্শস্বরূপ **জ্ঞান করিয়া** অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা করে এবং এক সময়ে যাহার সহিত···সহবাস ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি **বিবেচনা করিয়া** তল্লাভার্থে যারপরনাই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ও পরে যাঁহার অসদভাবে **শোকাকুল হইয়া** দুঃসহ **ক্লেশানুভব পুর্ব্বক** বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্যপ্রসঙ্গ বলিয়া আমারে ক্ষমা করিও।[১৬]

২. ঘটনার পরম্পরা সৃষ্টিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :

'ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি বৃক্ষপত্রের **শর শর** শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব **হইয়া**

মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন **হইয়া** আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়ন-দ্বয় নিমীলিত **করিয়া**, আমাকে অভিভূত করিল।[১৭]

-জলকল্লোল, মর্মর ধ্বনিতে **'মর্মর ধ্বনিতে' 'সুখানুভব'** হওয়া ঘটনার পর **'মনোবৃত্তি সমুদায়ে'র**-অবসন্ন হয়ে আসা আর একটি ঘটনা এবং তারপর **'নিদ্রা'র 'নয়নদ্বয় নিমীলিত'** করে দেওয়া আর একটি ঘটনা, সর্বশেষ ঘটনা **'অভিভূত'** করে দেওয়া। অর্থাৎ এই চারটি ঘটনা পর পর যথাক্রমে **'হইয়া', 'হইয়া' 'করিয়া'** এবং **'করিল'** অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে একটি ঘটনাক্রম বা ঘটনাপরম্পরা সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তিনটি, (**'হইয়া', 'হইয়া'** ও **'করিয়া'**) অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা এই ঘটনাপরম্পরাটি গঠিত হয়েছে।

৩. একটি ভাবের ক্রমোন্নতি সৃষ্টিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :

১ সংখ্যক, ও ২ সংখ্যক উদাহরণ দুটিই আলোচ্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জলকল্লোল, পাতার **মর্মর**, শীতল বাতাস দেহে ও মনে আরাম ও স্বস্তি দেওয়ায় ধীরে ধীরে আরামে যেন শিরাগুলি শিথিল হয়ে এল, স্নায়ুর আরামে নিশ্চিন্ত মানসিকতায় চোখ দুটিও যেন আপনা থেকে বুজে আসে,—এই যে ঘটনাপরম্পরা এতে ভাবেরও ক্রমারোহণ লক্ষিত হয়, দৃশ্য ও শ্রব্য সুখের তৃপ্তি এসেছে মনে, অনুভবে। অর্থাৎ, এ ভাবের শুরু দৃশ্যগ্রাহ্য, কিন্তু পরিণতি অনুভব্য, একটি চোখের, কাণের, অন্যটি মনের, হৃদয়ের। ইংরেজীতে, ভাষার এই আলঙ্কারিক রূপকে crescendo বলা যায়।

৪, Periodic effect. বা বাক্যের মূল বক্তব্য জানতে চাওয়ার জন্য কৌতূহল বা ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার : ১ সংখ্যক উদাহরণটি এ বিষয়ে অন্যতম সার্থক উদাহরণ। **'যিনি ভারতভূমির······যিনি সতত ······যেরূপ অসাধারণ······যিনি······সেইরূপ······যে অসামান্য ······যাঁহার······যাহার······যাঁহার সহিত······পরে যাঁহার** ···' পর্যন্ত ক্রমাগত পাঠক বা শ্রোতার কৌতূহলের মাত্রা একটু একটু করে বৃদ্ধিই পেতে থাকে এবং তারপর **তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ······ করিও।'** পর্যন্ত পড়াহলে সেই কৌতূহলের পরিনিবৃত্তি হয়, তার পূর্বে নয়।

বলা বাহুল্য এতক্ষণ পর্যন্ত এই জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রাখতে বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিই (যেমন : **সাধনার্থে……করিয়া, পূর্বক……করিয়া……করে……করিয়া……করে……হইয়া…… করে……বলিয়া**) মূলত দায়ী। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে যে বাক্যটি (২ সংখ্যক) ব্যবহৃত হয়েছে সে বাক্যটিতেও 'হিল্লোল দ্বারা…হইয়া'… 'হইয়া…করিয়া,'…পর্যন্ত কৌতূহল জাগিয়ে রেখে, 'অভিভূত করিল'তে এসে তার নিবৃত্তি ঘটেছে। দুটি বাক্যই periodic effect-এর উদাহরণ।

বাক্য-সংযোজক অব্যয় (যেমন, 'এবং' যখন…তখন, যেমন…তেমন, যেরূপ …সেরূপ, যদি…তাহা হইলে, প্রভৃতি) ব্যবহার বাংলা ভাষার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এই অব্যয়গুলির ব্যবহারে বাক্যের অর্থবোধ যেমন সহজ ও স্পষ্টতর হয়, তেমনি বাক্যবয়ন—পদ্ধতিও তেমনি দৃঢ় হয়, দুটি বাক্য একটি ভারসাম্যে স্থিত হয়, তার ফলে বাক্যগুলি দৃষ্টি ও শ্রুতি উভয় দিক থেকে সুঠাম ও সুন্দররূপে গড়ে ওঠে।

বাক্যসংযোজক অব্যয়-ব্যবহারে অক্ষয়কুমারের নৈপুণ্য নিঃসন্দিগ্ধ। ছোট, বড়, মাঝারি সর্বপ্রকার বাক্যবয়নের ক্ষেত্রেই তাঁর এই নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। যে যুগে বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণোন্মুখ, সে যুগে বাক্যবয়নের এই শিল্পরীতি কেবল নূতনই নয়, তার ব্যবহারের সাফল্যও একটি বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য। বাক্য-সংযোজক শব্দ-ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন লেখকের রচনা-সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ। অক্ষয়কুমারের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত বাক্য-সংযোজক শব্দগুলি এই সাফল্য কতটা সৃষ্টি করতে পেরেছে, এবার বিচার করে দেখা যেতে পারে। কটি উদাহরণ এ জন্যে নেওয়া হল।

১. যখন……তখন রূপের,

'এই দুই জলতপস্বীরা **যখন তপস্যা ভঙ্গ করিয়া উঠেন, তখন তাঁহাদের শরীরে আর কিছু থাকে না।**'

২. যেরূপ……তাদৃশ রূপের,

'বৈদিক মন্ত্র শব্দের **যেরূপ অর্থ**, অবস্তায় **তাদৃশ অর্থেই** ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে।'

৩. যাহা……তাহা রূপের,

'আর্য্যকুলের আদিম ধর্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ **যাহা লিখিত হইল,**

তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, পুরাকালীন আর্য্যেরা গগন ও গগনস্থ বস্তু ও গগনগত ব্যাপারেরই উপাসক ছিলেন।'

বাক্যের দৈর্ঘ্যের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া এক সংখ্যক বাক্যটিতেও যেরূপ… সেরূপ, যাঁহার…তাঁহার প্রভৃতি বাক্য-সংযোজক অব্যয় ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে। সাধারণভাবে অক্ষয়কুমারের বাক্যবয়নে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার বেশ বেশীই, কিন্তু তার শিথিল ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। কদাচ একটি বাক্য হয়তো নিয়মের ব্যতিক্রম রূপে চোখে পড়ে। যেমন, 'চারুপাঠ' ৩ ভাগের 'মিত্রতা' শীর্ষক রচনার একটি বাক্য।

৪. তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া, আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্বকথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না। —(পূর্বে উদ্ধৃত, ২৯)।

এবার এই বাক্যগুলির গঠনচরিত্র, এবং তার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার একটি পূর্ণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য আমরা যে কোন পাঁচটি বাক্য গ্রহণ করছি। যেমন—

১. পক্ষীগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু।

২. কীর্তি দেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূরগামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধাসিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, সকলে এক কালে মোহিত হইয়া গেল, তাঁহার শরীরের সৌগন্ধে সে স্থান অনবরত মোহিত ছিল।

৩. সহস্র সেনাদল সুসজ্জীভূত হউক, সুকৌশলক্রমে ব্যূহ সমুদায় বিরচিত হউক, সুতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের তাড়িতসমান জ্যোতিঃ প্রকাশে রণস্থল চক্‌মক্‌ করিতে থাকুক, রণপণ্ডিত সেনাপতি না থাকিলে, সে সকলই বিফল ও বিশৃঙ্খল।

৪. জীবগণ আহার করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, বিচরণ করিতেছে, সন্তরণ দিতেছে, নৃত্য করিতেছে, ধাবিত হইতেছে, তাহাদের সুখসাধনার্থে বিশ্বভাণ্ডার পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

৫. না জানি, আনন্দময় অমৃতময় পুরুষ কোন্‌ লোকে কত প্রকার অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অগণনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন।

গঠনের দিক থেকে প্রথম বাক্যটি কর্তা + কর্ম + বিণ, বিণ, কর্ম বি, এবং বিশেষ্য + সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র), বিশেষণ, বিশেষ্য। আয়তনের দিক থেকে বাক্যটিকে ছোট বলা চলে (অনধিক পোনেরটি শব্দে গঠিত বাক্যগুলিকে সাধারণভাবে ছোট বাক্য ধরা হল)।[১০] ক্রিয়া-উহ্য বাক্যটির গঠনক্রম (norm) কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। বাক্যটির ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য-বিচারে 'অতি' ও 'আশ্চর্য্য' বিশেষণবাচক শব্দ-দুটির ব্যবহারিক অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। 'অতি আশ্চর্য্য' বিশেষণবাচক শব্দগুচ্ছটি নিজেই অস্পষ্টার্থক, তাই অর্থবোধেও এই অস্পষ্টতা। কিন্তু আবেগ-প্রধান রচনায় অনেক স্থলেই এই ধরনের অস্পষ্টার্থক শব্দব্যবহার লেখকরা করেন, বক্তব্য বিষয়টির অনুভব-শক্তি এত নিবিড়, ও অনিরুদ্ধ হয়ে ওঠে যে, তার প্রকাশের ক্ষমতা ভাবাবেগে আড়ষ্ট হয়ে যায়, অস্পষ্ট শব্দগ্রন্থনে তখন সেই রুদ্ধ ভাবাবেগ প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন ৫ সংখ্যক বাক্যটিতে ঈশ্বরের মহিমার ব্যাপ্তি প্রকাশে 'অগণনীয়' শব্দটির ব্যবহার আলোচ্য বাক্যটিও তেমনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার সৃজনশক্তিও বিস্ময়বিমুগ্ধ লেখক ভাবাবেগে প্রকাশ করতে গিয়ে ঐরূপ অস্পষ্টার্থক শব্দের ব্যবহার করেছেন। তুলনামূলক ভাবে বাক্যটির সামগ্রিক অর্থাবেদন সংহত।

পক্ষান্তরে ২ সংখ্যক বাক্যটির গঠনচরিত্র অন্য হওয়ায় অর্থাবেদনও ভিন্নতর। বাক্যটির বৃদ্ধিতে (growth) বিশেষণবাচক শব্দ/পদগুচ্ছের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, (যেমন, কীর্তি দেবীর······দর্শন,···সুদূরগামী সৌরভ গ্রহণ,···সুমধুর বংশীরব শ্রবণ,···সৌগন্ধে) একটি 'এবং' ব্যবহারে এবং দুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার (যেমন : 'করিয়া' 'হইয়া') বিশেষ সক্রিয়, কিন্তু বাক্যটি দীর্ঘ হলেও বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ক্রম (কর্তা/কর্ম/ক্রিয়া) থেকে বিচ্যুত নয়, (যথা : কর্তা = কীর্তি দেবী, কর্ম = পরমপবিত্র···সে স্থান, ক্রি = ছিল) যদিও 'কর্ম'র অংশটিতে বিশেষণবাচক পদগুচ্ছ (participal phrase, যেমন··· শ্রবণ···সুদূরগামী···গ্রহণ, ইত্যাদি) অসমাপিকা ক্রিয়া ও 'এবং' প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যটির ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে গেলে লক্ষ্য করা যায় কতকগুলি আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যও এমনভাবে বাক্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে যাতে দৃশ্যরূপের ঊর্ধ্বে শ্রুতিমাধুর্যও সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই শ্রুতিমাধুর্য-সৃষ্টির কারণগুলি দ্রষ্টব্য। প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে

এই শ্রুতিমাধুর্যর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যথা: ১. ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস, ২. স্বরধ্বনির অনুপ্রাস, ৩. 'দল' সৌসাদৃশ্য[১১] ও বৈচিত্র্য। বাক্যটির শব্দগত অনুপ্রাস বহু। যথা, র/প/শ/ষ/স/ত/ন/ণ/ব/ভ/ম/ক/গ/ল। 'সুচারু সুদূর-গামী সৌরভ/সুধাসিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ/সকলে এককালে/পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন। স্বরধ্বনির অনুপ্রাস স্বরগুলির সংস্থাপন-নৈপুণ্যে একটি সঙ্গীতের সুরের মত সুর সমস্ত বাক্যটিতে প্রবাহিত হয়েছে। যেমন, কীর্তি দেবীর পরম পবিত্র সুরম্য পুষ্প সুচারু সুদূর—প্রভৃতি। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ এই ছটি স্বরের বারম্বার আবর্তনে এই স্বরসুষমা, সুরসঙ্গতি সম্ভাবিত হয়েছে। ৫ সংখ্যক বাক্যটিতে অ/ন/ণ/ম/য়/'র অনুপ্রাস এবং ই, আকার ও অ-কারের স্বরসঙ্গতিতে সুরসঙ্গতি লক্ষিত হয়। অবশ্য অনুপ্রাসের ব্যবহার ৩ ও ৪ সংখ্যক বাক্যেও আছে।

অনুজ্ঞা ব্যবহার করে বাক্যের দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করার বিচিত্র শিল্পকৌশলও অক্ষয়কুমারের বাক্যবিন্যাসের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ ৩ সংখ্যক বাক্যটি। '**হউক……হউক……থাকুক**' গঠনরীতিতে বাক্যটির সমৃদ্ধি। বাক্যটির কর্মকে এগিয়ে দিয়ে অর্থপ্রকাশে অধিক জোরও সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ক্রমের (কর্তা / কর্ম / ক্রিয়া) ব্যতিক্রমও এসেছে, কিন্তু তাতে বাক্যটির অর্থাবেদন স্পষ্টতরই হয়েছে।

৪ সংখ্যক বাক্যটি আর ও বৈচিত্র্যবহুল। কতকগুলি ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে বাক্যটির দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। '**করিতেছে………করিতেছে………দিতেছে…… করিতেছে…… হইতেছে……রহিয়াছে**।' বাক্যটির গঠনে যেন ছোট ছোট কটি বাক্যের পর পর সজ্জায় একটি বড় বাক্যের রূপ দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে এই বাক্যটিতে সাতটি ছোট বাক্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অথচ একত্রে যে একটি বাক্য নির্মিত হয়েছে, তাতে অর্থাবেদনে কোন অস্পষ্টতা নেই, কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছে, ভাবের সমুন্নতিতে একটি 'Crescendo' সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টি ও শ্রুতির তৃপ্তি দিয়েছে।

বাক্যগুলির এই শ্রুতিসুখের অন্যতম কারণ 'দলবিন্যাস' (Syllable-arrangement) যে কোন একটি বাক্যের (ধরা যাক ৫ সংখ্যক বাক্যটির) বিশ্লেষণই আলোচ্য প্রসঙ্গে যথেষ্ট।

৫ সংখ্যক বাক্যটিতে মোট দল-সংখ্যা ৪৭টি। 'রুদ্ধ-দল' (Closed Syllable) ১২টি, ৩৫টি 'মুক্তদল'। কোন পর্বই মুক্তদল-বিহীন নয়। এবং কোন পর্বেই বিশেষ একটি সুনিয়মতা (Regularity) নেই, কোন পর্বে ৩টি দল, কোন পর্বে ৪টি দল, আবার কোন পর্বে ৬টি, কোন পর্বে ২টি দল। এই অনিয়মের মধ্যেই বাংলা গদ্যের ছন্দ-নিয়ম।' ভাঙা-গড়া, ওঠা-নামার মধ্যেই তরঙ্গায়িত হয় প্রত্যাশিত, স্বরের উচ্চারিত এবং দৃশ্যত ধ্বনি ও রূপ। গড়ে ওঠে বাক্য-সুষমা। অক্ষয়কুমারের বাক্যের সুষমারও কারণ এই। বাক্যগুলির রূপজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়টির আলোচনা আরও স্পষ্ট হবে।

অক্ষয়কুমারের বাক্যের আকৃতিগত আলোচনায় দেখা যায় ছোট বাক্যের ব্যবহারও যেমন তিনি করেন নি, আবার খুব দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহারও সচরাচর করেন নি। দু-একটি ব্যতিক্রম যা আছে তাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করা যায় না। সাধারণভাবে অক্ষয়কুমারের বাক্যের আকৃতি মাঝারি বলা চলে। যেমন—

ক. ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।

—ধর্ম্মোন্নতি...' ২৫।

খ. এক্ষণে যে প্রাণ-দণ্ডের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অপকারী ও ঘৃণাকর। তাহা কোনক্রমেই আমাদের উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এই প্রাণদণ্ড সম্পাদনার্থে যে প্রাণ-ঘাতক নিযুক্ত থাকে তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রযোজিত রীত্যনুসারে দোষি (ভু) ব্যক্তিকে যাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক।

—বাহ্যবস্তু...২ ভাগ ১৩৮।

গ. অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে, এক

অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্নবদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব অবলোকনে, তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শন লাভ দ্বারা নয়নযুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

—চারুপাঠ (৩) ৩ ।

উদ্ধৃত তিনটি অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ৩, ৪, ও ৩টি করে বাক্য আছে। প্রতিটি বাক্যর 'দল' (syllable) যথাক্রমে ক-অনুচ্ছেদে ৪৪ + ৮৭ + ৩৩ অর্থাৎ প্রতি অনুচ্ছেদের বৃহত্তম বাক্য ক-অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যটি (৮৭টি দলের), গ-অনুচ্ছেদের ৫১টি দলে গঠিত দ্বিতীয় বাক্যটি এবং খ-অনুচ্ছেদের ৪৬টি দলে গঠিত দ্বিতীয় বাক্যটি। এবং ক্ষুদ্রতম বাক্য ক-অনুচ্ছেদের তৃতীয় বাক্যটি (৩৪টি দলের), খ-অনুচ্ছেদের তৃতীয় বাক্যটি (২৭ দলের), এবং গ-অনুচ্ছেদের তৃতীয় বাক্যটি (৩০ দলের)। অক্ষয়কুমারের বাক্যের এইরূপ দৈর্ঘ্য এবং হ্রস্বতা থেকে মনে হয় ভাষার দৃশ্যরূপটি (form of the language) অন্তত তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। একই দৈর্ঘ্যের অনেকগুলি বাক্যসজ্জায় ভাষার শিল্প-সুষমা রূপগত আবেদন ও রসগত আবেদন, দু'দিক থেকেই আহত হয়। টুক্‌রো টুক্‌রো, ছোট ছোট বহু বাক্য পর পর ব্যবহৃত হতে থাকলে যেমন দৃষ্টিকটু লাগে, শুনতে বা পড়তেও তেমনি বাধা জন্মায়। প্রবাহ কেটে যায়। এই প্রবাহ কেটে যাওয়ার কারণ একটানা একই রূপের দৃশ্য ও তজ্জনিত একই প্রকার ধ্বনি-প্রবাহর ওঠা-নামা, বৈচিত্র্য-বিরলতা। অক্ষয়কুমারের বাক্যগত বিশ্লেষণ থেকে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে, দৃশ্যগত ভাষার রূপবৈচিত্র্য তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছিল। কারণ, সম্ভবত অক্ষয়কুমারের ভাষায় প্রচ্ছন্ন ছিল ভাষণকলা। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্র-নাথের বহু রচনা 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশিত রচনাগুলির অনেকগুলিই আবার বক্তৃতাকারে প্রচারিত হত। অক্ষয়কুমার ঊনবিংশ শতকের অন্যতম বক্তা-রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অতএব ভাষণকলার প্রভাব তাঁর লেখাতেও পড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

গদ্যের ভাষা-সৌন্দর্য সম্পর্কে Thomas De Quincy তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

> The two capital secrets on the art of prose composition are these : first, the philosophy of transition and *connexion*, or the art by which one step in an evolution of thought is made to arise out of another : all fluent and effective composition depends on the connexion : secondly, the way in which sentences are made to modify each other ; for the most powerful effects in written eloquence arise out of this revibration ; as it...from each other in a rapid succession of sentences ; and because some limitation is necessary to the length and complexity of sentences, in order to make this interdependency felt ; hence it is that the Germans have no eloquence. The constitution of German prose tends to such immoderate length of sentences that no effect of intermodification can ever be apparent. Each sentence, stuffed with innumerable clauses of restriction, and other parenthetical circumstances, becomes a separate section as independent whole.

অক্ষয়কুমারের বাক্যবয়ন-রীতিতে এই 'connexion' লক্ষিত হয়। 'evolution of thought' যাকে আমরা 'crescendo' ও 'periodic sentence' রূপে পূর্বে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি, তাও অক্ষয়কুমারের সুষমা-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। বাক্যের সংহতি বা 'interdependency'ও অক্ষয়কুমারের বাক্যগুলির ভাব ও ভাষার পূর্ণ সাম্য বজায় রেখেছে। বাক্য-সংযোজক অব্যয়গুলির ব্যবহার, পদগুচ্ছের পর পর ব্যবহার ও 'এবং' ব্যবহার কি ভাবে অক্ষয়কুমারের ব্যক্যগুলির বিন্যাস-সাম্য রক্ষা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ পূর্বে করা হয়েছে—অক্ষয়কুমারের বাক্য-নির্মাণের অন্যতম সাফল্য তার বাগ্মিতা, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। লেখার সঙ্গে পড়া, সশব্দ উচ্চারণ, আর নীরব পঠন ভাষার ঔৎকর্ষ-সৃষ্টিতে যে তারতম্যের

সৃষ্টি করে, অক্ষয়কুমারের বাক্যগুলির গঠন (composition) ও আবেদনের (Rhetoric) বিশ্লেষণ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। লেখকের শুধু লিখে যাওয়াটাই একমাত্র কর্তব্য নয়, তাঁর রচনার ভাষাগত গুণ-সৃষ্টির জন্য উচিত সে লেখা উচ্চারণ করা অথবা মনে মনে পাঠও করা।

"a writer should carefully read his manuscript aloud, or at least read it to his ward ear :'•

ছোট, বড়, মাঝারি বাক্যবয়নের মধ্যে এই রূপবৈচিত্র্যের অন্যত্র একটা pattern বা অঙ্গরাগ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রচিত দু-একটি রচনাংশের উচ্চারণ-বিরতি এবং দলসংখ্যার বিশ্লেষণ করলেই এই রূপ-বৈচিত্র্যের একটা pattern বা অঙ্গরাগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে পারে। বিশ্লেষণের জন্য, বাক্যবহুল দুটি অনুচ্ছেদ তোলা হল।—

১. পূর্ব্বকালে লিঙ্গ-উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না। এখানকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গ-পূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস্ ও তদীয় ভার্য্যা আইসীস্ দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবী-রূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আইসীস দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহার কর্ত্তা, অসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যম-স্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয় অসীরিস্ দেবের এপিস্ নামক বৃষও তাঁহার অংশ-স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত।

—ভাঃ উঃ সঃ (২) ১৪৩-১৪৫।

২. ধন্য রামমোহন রায়: সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতির ঘোরতর অজ্ঞানরূপ-নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথম অনুচ্ছেদে সাতটি বাক্য আছে। এবং বাক্যটি 'যেমন……তেমন' এই সংযোজকরূপে এগিয়ে চলেছে, ভাবের একটা সমুন্নতি

সৃষ্টি করেছে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যগুলি সরল। চতুর্থ বাক্য থেকে 'যেমন-তেমন' রূপে 'শিবশক্তির' সঙ্গে 'অসীরিস্ ও আইসীসে'র তুলনা আরম্ভ হয়েছে। সপ্তম বাক্যে সে তুলনার বিরাম।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে প্রকৃতপক্ষে বাক্য একটি। বিশেষ্য ও বিশেষণ ব্যবহারে বাক্যের দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 'সেই—ইহা' রূপে বাক্যটির বক্তব্যের ঔৎসুক্য বজায় রাখা হয়েছে। 'এবং' সংযোজক-অব্যয় বাক্যাংশ সংযুক্ত করেছে। দুটি অনুচ্ছেদেই যে 'দল' ব্যবহার করা হয়েছে তা 'রুদ্ধ', 'মুক্ত'র সংমিশ্রণ। যতিচিহ্ন অনুসারে উচ্চারণ-বিরতিও একরকম নয়। দীর্ঘ বাক্যেও প্রয়োজনে উচ্চারণ-বিরতি এসেছে। কিন্তু দল, বা উচ্চারণ-বিরতি, তথা বাক্য-দৈর্ঘ্য ও বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতি একই পরিমাপের নয়, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, দেখা যাচ্ছে অনুচ্ছেদ দুটিতেই একটা ছন্দ-স্পন্দন আছে। এই অনিয়ম, বিরোধই অক্ষয়কুমারের গদ্যের ছন্দবোধের কারণ। র‍্যালের সেই বিখ্যাত উক্তি—

> The structure of the sentences is based on antithesis and alliteration or cross-alliteration, almost every sentence being balanced in two or more periodic parts, charging in sound, changing in sense.

অক্ষয়কুমারের রচনার ক্ষেত্রেও সত্য। অনিয়মিত নিয়ম, একটি বিশৃঙ্খল শৃঙ্খলা, একটি ছন্দছাড়া ছন্দ গদ্যের ভাষাছন্দ সৃষ্টি করে। অক্ষয়কুমারের বাক্যগুলির বিশ্লেষণ থেকে এটুকু বোঝা গেল। বাক্যের এই শৃঙ্খলাতেই গড়ে উঠেছে অক্ষয়কুমারের অনুচ্ছেদ-সজ্জার রীতি। বাক্যসাম্যে ভাষা-সুষমা তাঁর অনুচ্ছেদ-রচনার কি কি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, এবার তারও বিচার আবশ্যক।

॥ অক্ষয়কুমার : অনুচ্ছেদ ॥

অনুচ্ছেদ, প্রকৃতপক্ষে যতিচিহ্নেরই প্রকারভেদ। একটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে একটি অনুচ্ছেদে। অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা নির্দেশকালে হার্বার্ট রীড্ও মন্তব্য করেছেন—

> Logically it may be said to denote the full development

> of a single idea, and this indeed is the common definition of the paragraph.[২১]

উচ্চারণ-বিরতি যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, গদ্যের ক্ষেত্রেও তেমনি অপরিহার্য, নতুবা গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক তার সোচ্চার পঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন কি যতি-বিহীন কোন রচনাংশের নীরব পঠনও অসম্ভব, শ্রুতির বাধা সে ক্ষেত্রে না এলেও দৃষ্টির বাধা আসে। ফলে, রচনাংশের সোচ্চার পঠনই হোক, আর নীরব পঠনই হোক তার অর্থবোধে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবেই। ফ্লবেয়ার সম্ভবতঃ এই কারণেই বলেছিলেন—

> a good style must meet the needs of the respiration,[২২]

অনুচ্ছেদ এই আবশ্যিক যতি। গদ্যের ভাষাপ্রবাহে ভাবের স্বাতন্ত্র্য সূচিত করতে তার আবশ্যক। রচনাতে যতগুলি ভাব (idea) ততগুলি অনুচ্ছেদের প্রয়োজন হয়। অনুচ্ছেদগুলির আশ্রয়ে বক্তব্য বিষয়ের যে ভাব মুক্তি পায় সেগুলির সামগ্রিক রূপায়ণই একটি রচনার বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশিত করে।[২৩] এই পৃথক পৃথক ভাবানুযায়ী স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনার মাধ্যমে গদ্যের শৃঙ্খলা (Discipline of prose) ও গদ্যের সঙ্গীতধর্ম (prose-music) প্রকাশিত হয়। গদ্যের শৃঙ্খলা ও সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য গদ্যের অঙ্গরাগ প্রয়োজন। এ বিষয়ে Aristotle'র মন্তব্য স্মরণযোগ্য।

> The form of style must be neither metrical nor yet without rhythm. For if it is metrical it becomes unconvincing, because it seems artifice. Also it distracts the hearer, by making him listen for some cadence to recur...on the other hand, the unrhythmical is formless. Prose style must have form, but not metre : for the formless is both unpleasing and ungraspable.[২৪]

অনুচ্ছেদ, গদ্যের সেই 'Form' বা রূপরাগ। সুনিরূপিত ছন্দ, গদ্যের শৃঙ্খলা ও সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি করে না সত্য, কিন্তু একটা 'Rhythm' বা প্রত্যাশিত উচ্চারণ-প্রবাহের উত্থান-পতন সেই শৃঙ্খলা, সেই সঙ্গীতময়তার সহায়ক। অনুচ্ছেদ-রচনা এই কারণে খুব সহজ নয়। অন্ততঃ কবিতার স্তবক (stanza) রচনা যত সহজ, গদ্যের অনুচ্ছেদ রচনা তত সহজ নয়।[২৫]

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ যেমন উনবিংশ শতকের পূর্বে ঘটেনি তেমনি, তার 'Form' বা রূপরাগও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নি। ইংরেজ নবাবী কেড়ে যেমন রাজা হল, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার চিহ্নও নিয়ে এল। গদ্যের জন্ম ইংরেজ আসার পরে হয়েছে। গদ্যের অন্যতম Form বা রূপরাগও তাই বিদেশী প্রভাবের ফল বলে মনে করা যেতে পারে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গিলখ্রিষ্টের তত্ত্বধানে (J. Gilchrist) ঈশপ্‌স্ ফেব্‌লসের যে বঙ্গানুবাদ করেন তারিণীচরণ্ মিত্র, তাতেই দেশীয় ভাষায় ইংরেজী যতিচিহ্নের ব্যবহার লক্ষিত হয়।[২৬] কিন্তু এই গ্রন্থে (অর্থাৎ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট'-এ) অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে তথ্য-নির্ভর আলোচনা বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থটির নীতিগল্পগুলির শেষে 'ফল', বা এই গল্পের আভাষে (অর্থাৎ Moral-এ) যে সার কথা বলা হয়েছে তা পৃথক অনুচ্ছেদে বর্ণিত।[২৭] অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, রামমোহনও (১৭৭৪) তাঁর রচনায় সুষ্ঠু অনুচ্ছেদের ব্যবহার করতে পারেন নি। তাঁর রচনায় দাঁড়ি, কমা চিহ্নেরও সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নি। রামমোহনের রচনার কিছু অংশ আলোচ্য প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

> প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন (ভু) শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ **লিখিতেছি** * **যাঁহাদের** সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।[২৮]

দাঁড়ি, কমা জাতীয় যতিচিহ্নের কথা ছেড়ে দিলেও আলোচ্য রচনাংশের দুটি অনুচ্ছেদ বিভাগের প্রয়োজনের কথা স্বতঃই মনে আসে। 'অনুষ্ঠানের প্রকরণ' বিষয়ক অনুচ্ছেদ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল * চিহ্নিত অংশ থেকে। কারণ ভাব এখানে স্বতন্ত্র। বলাবাহুল্য, রামমোহনের সময় বাংলা গদ্য কেবল একটি রূপ নিতে চলেছে, তার পূর্বাদর্শ ছিল না। রামমোহনের নিজস্ব উক্তিই তার সমর্থন, 'এ ভাষার গদ্যতে অদ্যপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না'।[২৯] সুতরাং রামমোহনের ভাষায় এই যতিচিহ্নের অভাব নবনির্মিত বিপুল সম্ভাবনার অপরিহার্য স্খলন, দোষ নয়। তা ছাড়া, রামমোহন যত বড় নির্মাতা ও সংস্কারক ছিলেন তত বড় সাহিত্যিক ছিলেন না। যতিচিহ্নের প্রথম নিয়মিত সুষ্ঠু ব্যবহার অক্ষয়কুমারের হাতে, বিদ্যাসাগরেরও হাতে নয়।[৩০] অনুচ্ছেদ রচনাও এই সময়কার (১৯৪১-১৮৫৫) পত্র-পত্রিকার রচনায়, এবং অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গ্রন্থে নিয়মিত, সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহণ করে। তার কারণও আছে।

ঊনবিংশ শতকের এই পাদে বাংলা গদ্য শুধু নীরব পঠনের জন্যই রচিত হত না, তার সোচ্চার পঠনও হত। প্রকৃতপক্ষে ভাষার সৌন্দর্য যে কেবল দৃষ্টি-নির্ভর নয়, শ্রুতি-সাপেক্ষও···তার প্রমাণ এ সময়কার রচিত বাংলা গদ্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৪৩) প্রকাশিত রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশের পূর্বে বা পরে 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'য়, ব্রাহ্ম-ধর্মের উপাসনা-সভায় বক্তৃতার জন্য নির্বাচিত হত, তা পাঠ করা হত।[৩১] বাক্‌-শিল্প বাঙ্ময় হলে তার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বেড়ে যায়, রচিত বিষয়টি তখন চোখেরও তৃপ্তি দেয়, কানেরও তৃপ্তি আনে। এই সৌন্দর্য নির্ভর করে উচ্চারণের প্রয়োজনীয় বিরাম গ্রহণে। ভাষার এই দৃশ্যরূপ এবং শ্রাব্যরূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান কালের অলঙ্কার শাস্ত্র (Rhetoric), কেবল লিখ্যরূপের মধ্যে কথাকলার (Rhetoric) বিকাশ সম্ভবও নয়। পূর্বে কথাকলা মূলত ভাষণ-কলা, বা বাচন-কলার (অর্থাৎ oratory-তে) মধ্যেই সীমিত থাকতো, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলা গদ্যের কথাকলার বিকাশে শ্রুতি ও দৃষ্টি দুয়েরই ব্যবহার লক্ষিত হয়। যে লেখা ভাষণের জন্যও রচিত হত তার মধ্যে ভাষণ-কলার (oratory) চিহ্নও বর্তমান থাকবে, কিন্তু যেহেতু সে-রচনা লিখিত হত, প্রকাশিত হত, তার মধ্যে লিখিত রচনার গুণও থাকতো।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য-শিল্পীদের মধ্যে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য-রচনায় আধুনিক অলঙ্কার শাস্ত্রের (Modern Rhetoric) প্রয়োগ-বিধির অনুসন্ধানও তাই সম্ভব। উভয়ের বহু রচনাই লিখিতরূপে প্রকাশিত হবার পূর্বে, তা বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত করা হত। ভাষার রচনাগুণ (style) সশব্দ উচ্চারণের উপর বহুলাংশেই নির্ভর করে। প্রয়োজনস্থলে উচ্চারণ-বিরতি নিয়ে সুখশ্রাব্য অথচ, অর্থক শব্দের ব্যবহার করে ভাষার সঙ্গীত-সৃষ্টিতে (Rhythm & music of language) উচ্চারণ অপরিহার্য। কেননা, গদ্যের শৃঙ্খলা ও সঙ্গীতময়তা, ভাব ও অর্থময়তা যেমন ভাষার ব্যাকরণের উপর (grammar) নির্ভর করে, তেমনি ভাষার সামগ্রিক অর্থাবেদনের উপরও (effect of the language) নির্ভর করে। প্রথমটির জন্য নির্মাণ (composition) দরকার, দ্বিতীয়টির জন্য অলঙ্করণ প্রয়োজন (Rhetoric)। বলাবাহুল্য, প্রথমটির ব্যবহারের উপরেই দ্বিতীয়টির ব্যবহার নির্ভর করে। চোখে-দেখা শব্দের ব্যবহার সার্থক কিনা, শ্রুতিতে তা নির্ধারিত হতে পারে। আবার কাণে-শোনা শব্দাবলীর দৃশ্যরূপ ভাষার গঠনক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য-দানের অধিকারী। হার্বাট রীড্ এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

> The quality of word is determined mainly by its vocal sounds that is the collocation of its vowels and consonants.[৩২]

ভাষার Rhythm' র জন্য গদ্যের ক্ষেত্রে সশব্দ উচ্চারণের যে প্রয়োজন আছে তার সমর্থনে অধ্যাপক ক্লীন্থ ব্রুক্স্ এবং রবার্ট পেন ওয়ারেন্ *Modern Rhetoric* : (1949) গ্রন্থেও বলেছেন—

> ......reading his composition aloud and listening to its rhythms proves to be one of the best practical means for spotting sentence elements that are not in the best order,[৩৩]

অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত অনুচ্ছেদগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করে তার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে। অক্ষয়কুমারের রচনার কিছু অংশ নীচে তোলা হল—

১. বক ও তাদৃশ কতকগুলি পক্ষী মৎস্যাদি জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ

ধারণ করে,… ? তিনি বক জাতির…স্রষ্টা ও পাতা। অতীব কৌশলে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন।

২. উষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ ও কোন কোন গুণ অতি অসাধারণ। তাহাদের খুর সমধিক প্রসারিত,…। উষ্ট্র আরব দেশের প্রধান ভারবাহী পশু।…এইরূপ দুর্গম স্থানে উষ্ট্রদিগকে…। তাহাদিগকে… বালুকা ভূমি পর্য্যটন করিতে হয়।…মরুভূমির মধ্যে…। তাহাদের পৃষ্ঠোপরি যে স্থূলকায় ককুদ্ দেখিতে পাওয়া যায়,…তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩. মানব! তুমি এমন কত উদাহরণ, প্রদর্শন করিবে ? অনন্ত কালেও তাহার সমুদায় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়।…তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কীর্তি অহর্নিশ প্রকাশ করিতেছে।

—চারুপাঠ (৩) : জীব-বিষয়ে…মহিমা, ১০২-১০৪।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ-তিনটির তিনটি পৃথক ভাব ও বক্তব্য। ১নং অনুচ্ছেদটি বকের আকৃতি ও আচরণ-বিষয়ক, ২নং অনুচ্ছেদটি উটের স্বভাব ও তার উপকারিতা-বিষয়ক, ৩নং অনুচ্ছেদটিতে স্রষ্টার সৃজনক্ষমতা-বিষয়ক। অথচ তিনটি অনুচ্ছেদ পর পর লিখিত, এবং একটি রচনার অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ-রচনার ব্যাকরণ অনুযায়ী তিনটি অনুচ্ছেদই মোটামুটি সুনির্মিত। কিন্তু অনুচ্ছেদের নির্মাণ ছাড়াও তার আবেদনেরও একটি দিক থাকে। অনুচ্ছেদ সামগ্রিক রচনার একটি অংশ, সুতরাং সমগ্রকে পেতে হলে অংশগুলির সংহতি প্রয়োজন। পারস্পরিক সংহতিতে পুষ্ট, অনুচ্ছেদগুলির সামগ্রিক অর্থাবেদনই মূল বক্তব্য বিষয়ের অর্থাবেদন। এদিক থেকেও উদ্ধৃত তিনটি অনুচ্ছেদ পরস্পর ভাবাবেদনে শৃঙ্খলিত। মূল বক্তব্য-বস্তুর সূত্রে গ্রথিত। রচনাটির মূল বক্তব্য-বস্তু 'জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা।' ১নং অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে তাই বকেদের সৃজনদেবতার ক্ষমতা ও শক্তির বিস্ময়বিমুগ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখক। 'অতীব কৌশলে…দিয়াছেন।' ২নং অনুচ্ছেদে স্রষ্টার এই সৃজনশক্তিতেই সৃষ্ট উটের বর্ণনার আরম্ভের প্রথম চরণে এবং শেষ চরণে স্রষ্টার সৃজনশক্তির পূর্ণ স্বীকৃতি। ৩নং অনুচ্ছেদে, মানবসংসারে স্রষ্টার অসীম সৃজনক্ষমতার কথা পুনরায়

বলেছেন। তনং অনুচ্ছেদটি যেন সিদ্ধান্তসূচক অনুচ্ছেদ (concluding paragraph), মূল বক্তব্য-বস্তুর সার। প্রতিটি অনুচ্ছেদই একটি ভাবের প্রবহমানতায় স্বতন্ত্র হয়েও একত্র। ভাষা-বিজ্ঞানে অনুচ্ছেদের এই স্বভাবকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

> ......paragraphing can make visible to him the divisions of the writers' thought. But paragraphing, obviously, can be of help to the reader only if the indicated paragraphs are genuine units of thought—not faked units—not mere random bits of writing arbitrarily marked off as units. For a paragraph undertakes to discuss one topic or one aspect of a topic[৩৪]

'Topic', বা বিষয়, অনুচ্ছেদ-রচনার অন্যতম মূল্যবান বিষয় হওয়ায় অনুচ্ছেদ-রচনার তিনটি দিক সম্পর্কে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যথা : একটি সূত্র-বাক্য, একটি প্রসঙ্গ-বাক্য, ও একটি বিবৃতি (a key sentence, a topic sentence, narration & explanation) অর্থাৎ একটি অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য বা ভাব তার পূর্বাভাসবহ একটি 'Topic sentence' বা প্রসঙ্গ-বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদটির শুরু হয়, তারপর সেই প্রসঙ্গ-বাক্যর বিবৃতি বা ব্যাখ্যা, অর্থাৎ মূল বক্তব্য ভাবের বিস্তার, অবশেষে 'a key sentence বা সূত্র-বাক্য, যা অনুচ্ছেদটির সিদ্ধান্ত-বাক্য (concluding sentence) কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদটির মূল বক্তব্যের পূর্বাভাস দেবে। কিন্তু যেহেতু 'The paragraph is the mould for a complete unit of thought' সুতরাং, একটি রচনার অনুচ্ছেদ-সজ্জারও কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক শিল্পনির্দেশ আছে। রচনার প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটির (Introductory paragraph) মত 'Topic paragraph' সমস্ত রচনাটির মূল বক্তব্য বিষয়ের পূর্বাভাসবহ হয়। তার শেষ চরণটি সূত্র-বাক্য (key sentence) পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সমগ্রভাব ও বক্তব্যকে শৃঙ্খলিত করে—আর সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি (concluding paragraph) রচনার মূল-বক্তব্যের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৫] অনুচ্ছেদের ভাষাতাত্ত্বিক এই সাংগঠনিক নিয়মে অক্ষয়কুমারের অনুচ্ছেদগুলির রূপসজ্জাও দেখা যেতে পারে।

১নং অনুচ্ছেদ : 'প্রতিদিন সমুদ্রের দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, ইহা দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া, আপাততঃ সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং কিরূপে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতেরা সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র যে উহার প্রধান কারণ, তাহাও তাঁহারা এক প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়ে যে কত দূর অবধারিত হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে।'

—চারুপাঠ (৩) জোয়ার-ভাঁটা : ১০৫।

২নং অনুচ্ছেদ : জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া, স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল ও জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল ভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জলভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিকট থাকে, তখন সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার হইতেও পারে কিন্তু আমরা দিন রাত্রে দুইবার ভাঁটা দেখিতে পাই। এ অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দেশ করা যাইতেছে।

—পূর্বে উল্লিখিত : ১০-৫-১০৬।

৩নং অনুচ্ছেদ : ('দুইবার জোয়ার' ও 'দুইবার ভাঁটা'র কারণ বলা হয়েছে, এই অনুচ্ছেদটিতে)।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ-তিনটিই 'জোয়ার-ভাঁটা' রচনার অন্তর্গত। ১নং অনুচ্ছেদটিতে জোয়ার-ভাঁটার কারণ ও ফলাফল সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বাভাস বর্ণিত হয়েছে। 'Topic sentence' বা প্রসঙ্গ-বাক্যরূপে 'প্রতিদিন সমুদ্রের···হ্রাস হয়,' বাক্যটিকে গ্রহণ করা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়ের আভাসবহ সূত্র-বাক্য (key sentence) এবং এই অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত-বাক্য (concluding sentence) রূপে 'এক্ষণে···হইতেছে' বাক্যটিকে ধরা যায়। অনুচ্ছেদটি সমগ্র রচনার বক্তব্য-বস্তুর আভাসও দেয়, অতএব এটিকে প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ, বা Introductory paragraph' বলা যায়। ২নং অনুচ্ছেদটি ১নং অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষয়ের কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে। সমুদ্রের জলের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। অনুচ্ছেদটির 'Topic Sentence' 'জ্যোতির্বিদ···পরিভ্রমণ করে।' চন্দ্র-আকর্ষণে একবার জোয়ার-ভাঁটার কারণ বর্ণনাই অনুচ্ছেদটির 'Narration' বা বিবৃতি। সূত্র-বাক্য বা key sentence—'এ অদ্ভুত···নির্দেশ করা যাইতেছে।' অনুরূপ ভাবেই ৩নং অনুচ্ছেদটির সংগঠন।

কিন্তু তিনটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য, ভাব স্বতন্ত্র; অথচ রচনার মুখ্য বস্তু বিষয়ের ভাব থেকে স্বতন্ত্র নয়, এবং পরস্পর স্বতন্ত্র হয়েও, অনুচ্ছেদ-তিনটি একত্রিত। অনুচ্ছেদ আকৃতির দিক থেকে কত বড়, বা কত ছোট হবে সে সম্পর্কে কোন স্থির নিয়ম নেই।[৩৬] অক্ষয়কুমারের রচনাতে তাই একটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদও যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি একাধিক বাক্যের একটি অনুচ্ছেদও রচিত হয়েছে। যেমন—

১. এই বচন-রচনার সময়ে আর্য্য শব্দ হিন্দুদিগের জাতিগত সাধারণ নাম ছিল বলিতে হইবে।

—ভাঃ উঃ সঃ (১) উপঃ ০ঃ ৭

২. উল্লিখিত রূপ দার্শনিক···জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি···, তবে বহুকাল···তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা···উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের···অভাব ছিল। একটি বেকন্···একটি বেকন্···আবশ্যক হইয়াছিল।

একটি তাদৃশ ··পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যদি···করিয়া ফেলে। তাহাদের ···আবশ্যক ছিল। সহস্র···বিফল ও বিশৃঙ্খল। একটি রণজিৎ···আবশ্যক।

ধীশক্তি…পারিতেন। কিন্তু…কার্য্য। রত্ন-গর্ভা ইয়ুরোপ…দুই সূর্য্য। ঐ দুইটি…সংজ্ঞা। ঐ দুইটি…রহিয়াছেন। ঐ উভয়ের…প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—তথাপি…করিয়াছ। তোমাদের…করিয়াছেন। কিন্তু… অধিগম্য নয়।'

—ভাঃ উঃ সঃ (২) ৫২।

প্রথম অনুচ্ছেদটি ১৫টি শব্দের একটি বাক্যতে সম্পন্ন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি চার শতাধিক শব্দে ১৯টি বাক্যতে সম্পন্ন।

ভাষার অলঙ্কার (Rhetoric) ও ভাষার ব্যাকরণ (grammar) এক না হলেও দুটিই পরস্পরের সহায়ক। অক্ষয়কুমারের অনুচ্ছেদগুলির সাংগঠনিক আলোচনার (composition) সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির আলঙ্কারিক দিকের আলোচনা করলেই বিষয়টি বোঝা যায়। যে কোন রচনার (ধরা যাক 'চারুপাঠে'র 'স্বপ্নদর্শন, বিদ্যাবিষয়ক' থেকে) যে কোন তিনটি অনুচ্ছেদ নেওয়া গেল—

১. এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি-অন্ত, কার্য্যকারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কল-কল-ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়ন-দ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল।* আমার বোধ হইল যেন, এক বিস্তীর্ণ নিবিড় ‥করিলাম। কৌতূহলরূপ-দীপ্ত-হুতাশন…লাগিল, এবং…লাগিলাম।

২. অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম।‥ নিরীক্ষণ করিতেছেন।…কহিলেন…'আমার নাম বিদ্যা'…। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি, চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে…পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে

> লাগিলাম।···শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম ···জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ স্থানের নাম কি···? তিনি···উত্তর করিলেন— 'এ, বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে···ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদায় সুমধুর রসস্ফীত-ফল-ভার অবনত হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধ হইতে সুধাময় মধুধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে, উহার নাম কাব্যতরু।···। ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ···ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।
>
> —চারুপাঠ (৩) ২—৪।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ-তিনটিও পূর্বে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির ন্যায় একই রচনার পর পর লিখিত তিনটি অনুচ্ছেদ। একমাত্র ১ নং অনুচ্ছেদটি ব্যতীত অন্য দুটি অনুচ্ছেদই সাংগঠনিক দিক থেকে ব্যাকরণসম্মত। ১ নং অনুচ্ছেদটির* চিহ্নিত স্থানে নূতন অনুচ্ছেদ হওয়ার অবকাশ আছে। অন্যথায়, প্রসঙ্গ-বাক্য (Topic sentence), বিবৃতি (Narration), key sentence বা সূত্র-বাক্য অনুযায়ী তিনটি অনুচ্ছেদের নির্মিতি ঠিক আছে। এবং তিনটি অনুচ্ছেদে চারটি স্বতন্ত্র বক্তব্যের শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, যার জন্য ১ নং অনুচ্ছেদে নিদ্রানুভবের পর উদিত চিন্তা ও স্বপ্নদর্শনের জন্য একটি পৃথক অনুচ্ছেদের আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নির্মাণের পর তার আবেদন (Rhetoric after composition)। দেখা যাক্ এই আবেদন কোথায়?

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এবং উচ্চারণ সহকারে পাঠ করলে শোনাও যাবে, ১নং অনুচ্ছেদে কতকগুলি অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ আছে, একটা উচ্চারণ-প্রবাহের ওঠা-নামার তরঙ্গ আছে, যা অনুচ্ছেদটির গদ্যে এক সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে 'এইরূপ সুস্নিগ্ধ···অভিভূত করিল' পর্যন্ত রচনাংশের ভাষায় এই সঙ্গীতময় স্পন্দন যেন শ্রুতিকে তৃপ্তিই দেয়। শব্দগুলি উচ্চারণের প্রবাহে একটা স্পন্দনের আবর্তন সৃষ্টি করেছে,—'···জগতের আদি-অন্ত, কার্য্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম।' আবার—

> জল-কল্লোলের কল-কল-ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায়··· নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া···অভিভূত করিল।

লুকাস এবং হার্বার্ট রীড্ দুজনেই রচনাগুণের (style) আলোচনা করতে গিয়ে 'sound' (সশব্দ উচ্চারণের ধ্বনি) শব্দটির বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, দেখা যায়। রচনার অলঙ্করণ (Rhetoric qualities of language) প্রসঙ্গে এই 'sound' শব্দটির সঙ্গে 'sense' কথাটিরও সমান গুরুত্ব আছে। 'Sound & sense'-র (শব্দ/ধ্বনি, ও জ্ঞান/অর্থ) গুণেই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ (১নং) টির স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'জলকল্লোলের কল-কল-ধ্বনি…হিল্লোল' পর্যন্ত।

হার্বার্ট রীড্ বলেন—

> In prose the primary function of the sound of the isolated word is its expressiveness. It must mean the thing it stands for not only in the logical sense of accurately corresponding to the intention of the writer but also in the visual sense of conjuring up a reflection of the thing in its completest reality.[৩৭]

'কল-কল-ধ্বনি', বৃক্ষপত্রের 'শর শর' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার অনুচ্ছেদটির সঙ্গীতময়তা-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। লুকাস বলেন—

> Both in verse and in prose the sound and rhythm can sometimes be made echoes of the sense.[৩৮]

জগতের আদি-অন্ত, কার্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, কর্মাকর্ম-র ব্যবহারে অর্থ, শব্দ ও আবেদনের ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে, বলা চলে।

কিন্তু বহুক্ষেত্রেই অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে শব্দগুলির স্বভাব অনুযায়ী ধ্বনি (যেমন, 'বৃক্ষপত্রের শর শর') নেই, 'vocal sound' উচ্চারিত ধ্বনি (যেমন, নিবিড়, নির্জন, নিস্তব্ধ বনখণ্ড) আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'sense' বা অর্থ-দ্যোতনা নেই, অথচ উচ্চারণের সুর-স্পন্দন আছে (যেমন, 'যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে') সে ক্ষেত্রে অলঙ্করণ (Rhetoric)-সৌন্দর্যের কারণ অবশ্যই স্বতন্ত্র। অনুপ্রাস-ব্যবহার অক্ষয়কুমারের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণের পুনরাবৃত্তিতে, শব্দের পুনরাবৃত্তিতে, এক বর্গের সন্নিহিত বর্ণের পুনরাবৃত্তিতে, যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের, স্বরের পুনরাবৃত্তিতে অক্ষয়কুমারের গদ্য বহু স্থানেই অনুপ্রাসিত। উদ্ধৃত

তিনটি অনুচ্ছেদই এ-বিষয়ের স্পষ্ট উদাহরণ। অবশ্য, স্বরানুপ্রাস, ব্যঞ্জনানুপ্রাস, যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের ব্যবহার, দল (syllable)-মাত্রিক শব্দের ব্যবহার, ল, ম, ন, ণ প্রভৃতি সঙ্গীত-স্বভাবিত বর্ণ-ব্যবহার, আর সশ্রুত শব্দ-ব্যবহার, বাক্-অর্থক বাক্য-বিন্যাস, যাই করা হোক না কেন, কোন লেখক সচেতন হয়ে তার ব্যবহার করেন না ; রচনার মূল সৌন্দর্য, উচ্চারণ-প্রবাহের প্রয়োজনীয় বিরতি গ্রহণ কোন লেখকের পক্ষেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বিশেষত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সাহিত্যে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা শ্রোতা যেমন বেশী ছিল, সাহিত্যিকরা লেখক অপেক্ষা বক্তা বেশী ছিলেন যেমন, তেমনি অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথও বক্তা ছিলেন, যদিও লেখকও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে সম্ভবত বলা চলে—

> Their literature was far more largely spoken or read aloud.[৩১]

তাই অক্ষয়কুমারের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে এই সুরপ্রবাহ, এই সঙ্গীতময়তা। অক্ষয়কুমারের রচনার এই গুণ তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক বা যুক্তিনির্ভর রচনাগুলিতে কম। ভাষাতত্ত্বে 'precision' বলতে যে রচনার গুণকে বোঝায়, এই জাতীয় রচনাগুলিতে তার ব্যবহার বেশী। 'জোয়ার-ভাঁটা' বিষয়ক উদ্ধৃত তিনটি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকেই তা বোঝা যায়। অর্থাৎ যত বেশী সংবেদনশীলতায় লিখেছেন তত বেশী অনুপ্রাস, তত বেশী অস্পষ্টার্থক (vague) শব্দ, তত বেশী সুরপ্রবাহ, সঙ্গীতময়তা, সমাসবদ্ধ পদ, তৎসম পদগুচ্ছ, উপমা ও রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক কথন-কলার (Figure of speech) ব্যবহার করেছেন। অক্ষয়কুমারের শব্দ, সমাস ও বাক্য-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত উদাহরণগুলি দেখলেই এ বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। অনুচ্ছেদ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

১। Chatterjee S. K. *The Origin and Development of the Bengali Language*. Calcutta, 1926, Vol. I, Introduction.

আরও দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেনের, ভাষার ইতিবৃত্ত (৭ সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৬২,

১৪৮, এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, (৪ সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৪২, ৬৬—৬৯।

অর্ধ-তৎসম নামক স্বতন্ত্র শ্রেণীর বাংলা শব্দের যে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, এক অর্থে তাও তদ্ভব শব্দ। 'তৎ'=সংস্কৃত হইতে 'ভব' (জন্ম) যার। ভাষাতাত্ত্বিক, আচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আলোকপাতও করেছেন: 'কারণ ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়াই আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান'।

দ্র: ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, (৪ সংস্করণ), ৬৯।

২। চা. পা. (৩) ১৮৫৯, ২।

৩। তদেব (১) ৪।

৪। বাহ্যবস্তু, (১) ৪।

৫। পদার্থবিদ্যা, কলিকাতা, ১৮৫৬, ৮।

৬। বাষ্পীয় রথারোহী, কলিকাতা, ১৮৫৪, ৯।

৭। চা. পা. (৩) ৭৯—৮০।

৮। Bringing together under a general principle or conception—'Cambridge Dictionary, 20th Century' London, 1955.

দ্র: শি. কু. দা. 'গল্পগুচ্ছের গদ্যরীতি' একতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৬১।

৯। "An order of mutual expectancy between linguistic elements at a more particuler level than that of syntax".='শব্দসঙ্গ' শি. কু. দা. তদেব, পাদটীকা, ১৩৪।

১০। রামমোহন রায়, গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮৩৩, ২১—২৩,

দ্রষ্টব্য রামমোহন গ্রন্থাবলী (ব্রজেন্দ্রনাথ), ২১—২৩।

১০ (ক)। তদেব।

১১। তদেব, ২১।

১২। ভা. উ. স. উপক্রমণিকা (২ ভাগ) ৩৬—৩৯।

১৩। বক্ষ্যমান আলোচনার সমাসবিশ্লেষণ-চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

১৪। Das, S. K. op. *cit.* 151, 173-176

১৫। যেমন, 'বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে'। (রবীন্দ্রনাথ, যোগাযোগ, ১২২৯, ২৮৫)

১৬। ভা. উ. স. (২), ৩৯।

১৬ (ক)। তদেব।

১৭। চা. পা. (৩), ২। (উদ্ধৃতিতে শব্দের বড় অক্ষর ব্যবহার বর্তমান লেখকের)।

১৮। Read, Herbert, English Prose Style. London, 1928 (1959), 85

১৯। দল—Syllable দ্রষ্টব্য, নীলরতন সেন, আধুনিক বাংলা ছন্দ, কলিকাতা, ১৯৬২, ২।

২০। Lucas, F. L., Style : the harmony of prose. London (1955), 220

২১। Read, Herbert., op cit. 52

২২। Brooks, Oleanth & Warren, Modern Rhetoric. U. S. A. 1949, 316-317

২৩। Lucas, F. L., *Op. cit.* (1956), 220

২৪। Lucas, Ibid. 220-, 21.

২৫। Rhythm is not a prior construction.* It is not an ideal form to which we fit our words. Above all it is not a musical notation to which our words submit,—Read, *op. cit.* 61

২৬। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ১৯৩৪, ৩২-৩৩

২৭। সা. সা. চ.' ১ (১৪), ১২৪৭, ১৯-২২।

২৮। রামমোহন রায়, বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), ২, দ্রষ্টব্য রামমোহন গ্রন্থাবলী (ব. সা. প.), ২।

* চিহ্ন বর্তমান লেখকের।

২৯। তদেব।

৩০। সুকুমার সেন, পূর্বে উল্লিখিত, ৫২-৫৩, ছাপা বাংলায় যতিচিহ্ন। বিশ্বভারতী পত্রিকা (জানুয়ারী—মার্চ) ১৯৬৪, ২৮৯।

৩১। শিশির কুমার দাশ, 'বাংলায় যতিচিহ্ন' ১৮০১—১৮৫০': বিশ্বভারতী পত্রিকা, (অক্টোবর—ডিসেম্বর) ১৯৬৩, ১৪৬—১৪৭

৩২। Read. H., *op. cit.*, 1

৩৩। Brooks & Warren., *op. cit.* 496

৩৪। Brooks & Warren, Ibid. 317

সপ্তম অধ্যায়

অক্ষয়কুমার : পরিভাষা

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যার মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মীয় পরিভাষা[১] লক্ষিত হয়; যেমন 'বল' (নপুংসক অর্থে), 'চন্দ্র' ('আদর্শ জ্ঞান' অর্থে), 'সূর্য' ('সমতাজ্ঞান' অর্থে)। বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত পরিভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে। উনবিংশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষা গঠনেরও প্রয়োজন হল অনেক বেশী। ধর্ম-সংক্রান্ত পরিভাষা গঠনের দিক থেকে লেখকদের তত বিব্রত হতে হয় নি। সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনা থেকে সোজাসুজি পরিভাষা গ্রহণ করাতে অসুবিধা হয় নি তাঁদের। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল বিশেষ করে বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত থেকে শব্দ নেওয়া হল অনেক। কিন্তু সব শব্দ সংস্কৃতেও পাওয়া গেল না। আবার সংস্কৃত থেকে গৃহীত শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হল। এইভাবে পরিভাষা গঠনের একটি দায়িত্ব এসে পড়লো লেখকদের ওপর।

ফেলিক্স কেরী (২০ অক্টোবর ১৮৭৬)-রচিত 'বিদ্যাহারাবলি' ১ খণ্ড, (১৮২০) এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সজনীকান্ত দাস 'বিদ্যাহারাবলি' সম্পর্কে লিখেছেন—

> তিনি (ফেলিক্স কেরী) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ম্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে।[২]

ফেলিক্স 'হারাবলি'তে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী যে 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ 'এ্যানাটমি'র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন তা কেবল গ্রন্থটির একটি অংশ নয়, সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। বিজ্ঞান পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রথম প্রয়াস ফেলিক্স কেরীর এই গ্রন্থেই। অবশ্য পরে এ বিষয়ে 'স্কুল বুক স্যোসাইটি'র অবদানও ছিল। একাধিক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে স্যোসাইটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ প্রসারিত করেছিলেন। ফেলিক্সের বইটি শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বই,

'ব্রিটিশদেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮১৯) স্কুল বুক স্যোসাইটির পক্ষে শ্রীরামপুরের প্রেসে ছাপা হয়েছিল।[৩] শোনা যায় রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) প্রকাশের স্বল্পকাল পূর্বে বা পরে 'জ্যাগ্রাফি' নামে—একখানি ভূগোল বইও স্কুল বুক স্যোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] এ ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক ভূগোল ও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।[৫] এ ছাড়া প্রথম বাঙ্গালী শব-ব্যবচ্ছেদক মধুসূদন গুপ্তের 'The London Pharmacopeia-র বঙ্গানুবাদ (১৮৪৯) প্রকাশিত হয় বিশপস্ কলেজ থেকে। স্বল্প মূল্যে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক রচনার কৃতিত্ব যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাপ্য তাদের মধ্যে স্কুল বুক স্যোসাইটি ছাড়া 'The Society for translating Europeon Sciences', 'Roy & Co.' 'শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস' 'ট্র্যাস্ট স্যোসাইটি' প্রভৃতি প্রকাশনীগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। J. D. Pearson-এর ভূগোল এবং জ্যোতিষবিষয়ক কথোপকথন (১৮২৪), ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯), এবং জন্ ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যাসার' (১৮৩৪), পিটার ব্রুটনের *A vocabulary of the various parts of the human body and medical and technical terms* (1825) প্রভৃতি রচনা এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং অক্ষয়জীবনীকার রাজকুমার চক্রবর্তী যে লিখেছিলেন—

> উহাই (ভূগোল : ১৮৪১) বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রচারিত ভূগোল। অক্ষয়কুমারই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় ভূগোলের পরিভাষা প্রণয়ন করেন—

তা সর্বাংশে সত্য নয় দেখা যাচ্ছে। কেবল ভূগোল নয়, পদার্থবিদ্যা (ইয়েটস্-রচিত), জ্যোতিষ (১৮১০, ১৮৩৩ : ফার্গুসনের : সংক্ষেপ করেন ইয়েটস্), রসায়নের বই 'কিমিয়া বিদ্যাসার' (জন্ ম্যাক্-রচিত) প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একাধিক বই তখন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি ১৮৫৬তে অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা' প্রকাশিত হবার পরও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে রাজনারায়ণ বসুকে পত্র দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—

> পদার্থবিদ্যা, সমাপ্ত হইলে. আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্র-বিষয়ক

একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যাসাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই, যেরূপ বলবীর্য্যবিহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায় না।[৬]

এতগুলি বই প্রকাশিত হবার পরেও যে অক্ষয়কুমার পরিভাষার অভাব বোধ করেছিলেন তার একটা কারণ সম্ভবত পরিভাষাগুলি তখনও সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে নি এবং অক্ষয়কুমার নিজেও হয়তো তার অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঙ্কলন' করার যে সমস্যা অক্ষকুমারও বুঝতে পেরেছিলেন, মূলত তা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির সমস্যা। ১৮৫৬তে অক্ষয়কুমার যে সমস্যায় ভাবিত হয়েছেন, প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ফেলিক্স কেরীও সেই একই সমস্যায় চিন্তিত হয়েছেন, 'বিদ্যাহারাবলি' লিখতে বসে। ফেলিক্সও লিখেছিলেন—

গ্রন্থে নির্ণীতমত্রামররভসজটাবিশ্বকোষেষু দৃষ্টৈঃ।
শিষ্টৈঃ প্রাচীন শব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থ্যাদি শারীরতত্ত্বং॥
যৎকোষানাপ্তনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যৌগিকৈস্তৎ।
যুষ্মাভির্ব্বেদ্যমুদ্যৎসুবিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং॥
দ্রক্ষ্যন্ত্যস্মিন্নবদ্যং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং।
সদ্যো বোধ্যং প্রসিদ্ধং বিদ্ধতু ভবতাং সম্মতং সন্নতঞ্চেৎ॥
কিন্ত্বেতদ্বচ্‌ম্যদ্যবশ্যং পদগতবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং।
কুর্ব্বীরংস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং॥[৭]

অর্থাৎ অমর, রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষ-সমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দ সকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমল বুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্য-রূপে পরিবর্জিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিষয় ও

তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্দ্বারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।[৮]

ফেলিক্স আরো লিখেছেন—

> অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্ব্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীতা (ভু) হইয়াছে কিন্তু যে ২ স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই ২ স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় তাবদ্‌গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি উপযুক্ত সংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থেতে যে ২ সংজ্ঞা অনুপযুক্ত বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্ত্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদ বিষয় হয় জানিবেন।[৯]

ফেলিক্স কেরীর এই মন্তব্য থেকে তাঁর সমকালীন বাংলা ভাষার পারিভাষিক সমস্যার একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পরিভাষা-সৃষ্টিতে প্রধানত তখন সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভারের সাহায্য নিতে হত এবং যে সমস্ত পরিভাষা, অর্থাৎ একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বস্তু, বা বিষয়জ্ঞাপক একটি বিশেষ শব্দ, সংস্কৃত ভাষা থেকেও গ্রহণ করা অসম্ভব হত সে ক্ষেত্রে সে পারিভাষিক শব্দটি নির্মাণ করা হত। ফেলিক্স অন্তত দু'প্রকারে এই পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করেছিলেন—

১. যৌগিক, ও সাধু শব্দ সকলের মিলন দ্বারা।

২. সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠন দ্বারা।

ফেলিক্স কেরীর রচনায় Anatomy-র পরিভাষা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, Solid-এর পরিভাষা ঘন, Liquid-এর দ্রব, Muscle-এর মাংসপেশী, Nerve-এর নাড়ী, Vein-এর শিরা এবং Chemistry-র রসায়ন বিদ্যা, Surgery-র অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা, Pharmacy-র ঔষধনির্মাণ বিদ্যা, Medical science-এর ঔষধচিকিৎসা বিদ্যা, Economics-এর অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি। এ সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের সময়ও পরিভাষা-সৃষ্টির যে অসুবিধা ছিল তার কারণগুলি এবার দেখা যেতে পারে।

২

পরিভাষা-সৃষ্টির নিজস্ব কতকগুলি উপায় আছে, সেগুলির অভাবে পরিভাষার সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না। বিশেষত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলির প্রয়োগ এক প্রকার অপরিহার্য কর্তব্যও। নিয়মগুলি হল—

১. যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ স্পষ্ট তাৎপর্য্য থাকে।

২. প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না।

৩. নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়,

৪. নূতন শব্দ প্রণয়ন করিতে হয়।[১০]

কারণ 'জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতনভাবে গঠিত হয়।'

অক্ষয়পূর্ব-যুগে বাংলা বৈজ্ঞানিক রচনায় পরিভাষা নির্মাণের এই সমস্ত নিয়মগুলির ব্যবহার লক্ষিত হয় না, সম্ভবত অক্ষয়কুমারও এই কারণেই বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলি লিখতে গিয়ে পরিভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অক্ষয়পূর্ব-কালের কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সৃষ্ট, বা ব্যবহৃত কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করলে অক্ষয়পূর্ব-কালীন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পূর্ণতা সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মাতে পারে। ফেলিক্স কেরী, জন ম্যাক্, পীটার বৃটন, এবং পীয়ারসনের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ-চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

এই বিশ্লেষিত পরিভাষাগুলি থেকে বোঝা যাবে যে, অক্ষয়কুমারের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ছিল এবং লেখকবিশেষের রচনায় পূর্বে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি হয় অপরিবর্তিত রূপে রক্ষিত হয়েছে, নতুবা পরিবর্তিত হয়ে নূতন শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক্ পীয়ারসনের 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপকথন' (১৮২৪) গ্রন্থে ব্যবহৃত ভৌগোলিক পরিভাষা Lake—হ্রদ (ভূ), continent—মহাদ্বীপ, Law of attraction—পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি, সম্পূর্ণ পরিবর্তিতরূপে

অক্ষয়কুমারের ভূগোল-বিষয়ক রচনাগুলিতে যথাক্রমে হ্রদ, মহাদেশ, এবং Law of gravitation—মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অনুরূপ-ভাবে ফেলিক্স কেরীর কিমিয়াবিদ্যা, রসায়ন, ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যা', বৃটনের রসায়ন অক্ষয়কুমারের পরিভাষায় স্পষ্টতর রূপে রসায়নবিদ্যা (Chemistry) ব্যবহৃত হয়েছে। Analysis-এর পরিভাষাও অক্ষয়কুমারের

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফেলিক্স কেরী	ম্যাক্	পীয়ারসন	বৃটন	অক্ষয়কুমার
১	Planet	×	×	গ্রহ	×	গ্রহ
২	Lake	×	×	হ্রদ (ভু)	×	হ্রদ
৩	Compass	×	×	কোম্পাশ	×	দিগ্‌দর্শনযন্ত্র
৪	Law of attraction	×	×	পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি	×	মাধ্যাকর্ষণ শক্তি
৫	Chemistry	কিমিয়াবিদ্যা, রসায়ন	কিমিয়া-বিদ্যা	×	রসায়ন	রসায়ন বিদ্যা
৬	Physiology	শরীরতত্ত্ব	×	×	শরীরসূত্র	শরীরবিদ্যা
৭	Electricity	×	বিদ্যুতীয় সাধন	বিদ্যুৎ	গুণতৃণ মণিভাব, তৃণ মণিভাব	তাড়িৎ
৮	Anatomy	ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	×	×	শরীর ব্যব-চ্ছেদ বিদ্যা	×
৯	Analysis	ভেদ	ব্যস্তকরণ	×	অনুক্রমচর্চ্চা	ব্যবচ্ছেদ
১০	Lips	চক্ষু	×	×	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ

নিজস্ব ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র পরিভাষা। চঞ্চু ফেলিক্স কেরী Lip-এর পারিভাষিক শব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন, অক্ষয়কুমার এই শব্দটিকে বিশেষ অর্থে পাখীর ঠোঁট Beak, Bi'l অর্থে ব্যবহার করেছেন, এবং Lips—ওষ্ঠ যা বৃটনের পরিভাষার তালিকায় স্থান পেয়েছে তাই ব্যবহার করেছেন।

এই পরিভাষাগুলির স্বভাব লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, অক্ষয়কুমারের পূর্বে পারিভাষিক শব্দের গঠনস্বভাব সম্পর্কে একটি স্থির, নিশ্চিত ধারণার অভাব যেন বিদ্যমান ছিল। যেমন, ফেলিক্স কেরী-কৃত Physiology-র পরিভাষা 'শরীরের মধ্যে যে ২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিদ্যা' অথবা Electricity-র পারিভাষিক শব্দ পীটার বৃটন ব্যবহার করেছেন 'গুণ তৃণ মণিভাব' বা 'তৃণমণিভাব' তেমনি জি. বি. পীয়ারসন Rainbow—'মেঘধনুক' ব্যবহার করেছেন। পরিভাষার এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অক্ষয়পূর্ব-কালীন বাংলা ভাষায় রচিত ও ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি পারিভাষিক শব্দের গঠনবৈশিষ্ট্যের সব কটি বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ ছিল না। দ্বিতীয়ত পরিভাষাগুলির সার্থকতা অনেক বেশী নির্ভর করে তাদের ব্যবহারের উপর, ব্যবহারিক যোগ্যতা সে ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দগুলির যে অন্যতম গুণ, তা সে সময় সব পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে ছিল না। তার অন্যতম কারণ বাংলা গদ্যের চর্চা তখনও খুব বেশী দিন হয় নি, এবং তার ফলে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদিও ব্যাপক হারে তখনও রচিত হয় নি। সম্ভবত সেজন্য অক্ষয়পূর্ব-কালীন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তা যেমন ভাবে, যতটুকুই রচিত হক না কেন, সেগুলির পুনর্চর্চা ও ব্যবহার বিশেষ হয় নি। লোকের ব্যবহারিক জীবনে সেগুলির ব্যাপক পরিচয় সংঘটিত হতে পারে নি। অথচ পরিভাষার প্রচলন ব্যাপক হলেই সে পারিভাষিক শব্দটি টিকে যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন—

> অনভ্যাস ও অপরিচয় হেতু প্রথম প্রথম কাণে বাজিবে, অভ্যাস ও পরিচয়ের সহিত সে দোষ থাকিবে না।[১১]

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কোন পরিভাষাই সম্পূর্ণ নির্দোষ ও যথাযথ হতে পারে না। পরিভাষা-নির্মাণে এই কারণেই যথেষ্ট সতর্কতার, বহু বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে থাকে। পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফেলিক্স কেরী হয়তো ঠিক যথাযথ, নির্দোষ শব্দ রচনা সর্বদা করতে পারেন নি, কিন্তু 'পরিভাষা'

(Terminology) শব্দটির পারিভাষিক শব্দরূপে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেটি পরিভাষা-সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক কর্তব্য যা তারি অর্থদ্যোতক শব্দ হয়েছে বলা চলে। শব্দটি 'সংজ্ঞাশব্দ'। অর্থাৎ, পারিভাষিক শব্দ এমন হওয়া উচিত যে, শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অভিপ্রেত বিষয়টির স্বভাবকে সে উদ্ঘাটিত করতে পারে। যেমন, Solar System 'সৌরজগৎ' ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য-সংসারের নিয়ম, কানুন, রীতি, নীতি সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই লোকে বুঝতে পারে। সাধারণত চার প্রকার উপায়ে পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করা যেতে পারে।—

১. ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করে: যেমন Iron—লৌহ Gold—সোনা।

২. প্রচলিত শব্দকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ: যেমন, 'অর্ণবযান' জাহাজ অর্থে, 'ব্যোমযান' এরোপ্লেন অর্থে।

৩. অন্যভাষা থেকে অনুবাদ: বিশ্ববিদ্যালয়—University, বাষ্পীয় শকট—Rail engine।

৪. অন্য ভাষার শব্দগুলিই গ্রহণ: যেমন, ওজোন (Ozone) বেলুন (Balloon)।

অন্য ভাষা থেকে অনূদিত শব্দ নিয়ে যখন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয় তখন ব্যবহারিক সুবিধার প্রতিও যেমন দৃষ্টি রাখা দরকার, তেমনি বাংলা ভাষার ধাতুগত মিলও যাতে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।[১২] এই আলোচনার কথা স্মরণ রেখেই অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির মূল্যবিচার করতে হবে।

৩

অক্ষয়কুমারের পূর্বে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও পরিভাষা-নির্মাতা হিসাবে অক্ষয়কুমারের একটি স্বতন্ত্র স্থান বাংলা ভাষার ইতিহাসে অবশ্যই আছে। প্রথমত অক্ষয়কুমার যত বেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সে সময় ব্যবহার করেছেন, উনবিংশ শতকে একজন গদ্যলেখক, ঠিক তত বেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন কিনা সন্দেহ। অক্ষয়কুমারের মোট রচনার বেশীর ভাগই বিজ্ঞানবিষয়ক।[১৩] অনিবার্যভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার

ব্যবহারও অক্ষয়কুমারের রচনাতে বেশী হয়েছে তাই। তাঁর সমগ্র পরিভাষা-গুলির বিষয়ানুযায়ী একটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা ২. ভূগোলবিষয়ক পরিভাষা
৩. সাধারণ বা বিবিধ-বিষয়ক পরিভাষা।

বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষার কয়েকটি উদাহরণ—

চুম্বক—Magnet, কঠিন—Solid, অনুবীক্ষণ যন্ত্র—Microscope, উদ্ভিদবিদ্যা—Botany, দূরবীক্ষণ—Telescope, দিগ্‌দর্শন—Compass, জ্যোতিষ—Astrology, প্রাণীবিদ্যা—Biology, মানমন্দির—Meteorology, মেস্মরতত্ত্ব—Mesmerism ইত্যাদি।

ভূগোলবিষয়ক পরিভাষার কয়েকটি উদাহরণ—

উপত্যকা—Valley, কুজ্মটিকা—Fog, কুমেরু—South pole, সুমেরু—North pole, প্রবাল—Coral, প্রবালদ্বীপ—Coral island, সৌর রামধনু—Solar rainbow ইত্যাদি।

সাধারণ—

অক্ষর—Type, অঙ্কন্যাস—Table, অবৈধ—Illegitimate, আসঙ্গলিপ্সা—Adhesiveness, ইতিহাসবেত্তা—Historian, উপচিকীর্ষা—Benevolence, ঘটনানুভাবকতা—Eventuality, জিজীবিষা—Lust for life, টঙ্কশালা—Mint প্রভৃতি।[১৪]

এই পরিভাষাগুলির সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য বিচারের পূর্বে এগুলির ব্যবহার সম্পর্কীয় আলোচনা আবশ্যক। অর্থাৎ, অক্ষয়পূর্ব যুগেও এগুলির প্রচলন ছিল কিনা দেখা দরকার। না থাকলে পরিভাষাগুলি অক্ষয়কুমারের মৌলিক রচনা বলে গ্রহণ করতে হবে। অক্ষয়পূর্ব-কালীন, প্রচলিত কয়েকটি অভিধানের তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। প্রথম বাংলা ভাষার অভিধান রচনা করেন ফস্টার,[১৫] সুতরাং তাঁর অভিধান এবং কেরীর অভিধান[১৬] এবং জনসনের অভিধান[১৭]—এই তিনটির সঙ্গে অক্ষয়-কুমারের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনার জন্য পরপৃষ্ঠায় একটি বিশ্লেষণ-চিত্র দেওয়া হল। গ্রন্থের প্রকাশ কালানুসারে মূল শব্দ, ফস্টার, কেরী, জন্‌সন্ ও অক্ষয়কুমার এই অনুক্রম রাখা হল।[১৮]

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফস্টার	কেরী	জন্‌সন্	অক্ষয়কুমার
১	Air Pressure	×	×	×	বায়ুভার
২	Analysis	পৃথক, ছাড়াছাড়ি	×	স্থূল হইতে প্রত্যেক অংশের পার্থক্য, সার সংগ্রহ	ব্যবচ্ছেদ
৩	Astrology	×	×	কাকচরিত্র, দৈব-জ্ঞান, গণকর্তা	জ্যোতিষ-বিদ্যা
৪	Atom	পরমাণু, অণু, অতিসূক্ষ্ম	পরমাণু	অণু, রেণু, পরমাণু	পরমাণু
৫	Balloon	×	×	বায়ুযান, বেলুন নামক বাষ্পযন্ত্র	ব্যোমযান
৬	Benevolence	×	×	দানশীলতা, দান, হিতেচ্ছা	উপচিকীর্ষা
৭	Biology	×	×	×	প্রাণীবিদ্যা
৮	Breast	ছাতি, বুক, বক্ষ, উরু স্তন, চুচী, মাঞ্চী	বক্ষ	বুক, ছাতি, স্তন, হৃদয়, অন্তঃকরণ	বক্ষঃস্থল
৯	Carnivorous	মাংসাশী	মাংসাশী	মাংসভোজী	মাংসাশী
১০	Casual,-ity	দৈবাৎ, অকস্মাৎ	×	দৈবকর্ম, ঘটনা, বা দৈব	অনুমিত
১১	Comet	ধূমকেতু	×	×	ধূমকেতু

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফস্টার	কেরী	জন্‌সন্‌	অক্ষয়কুমার
১২	Compass	বেষ্টন, বেড়ন	×	দিক্‌নিরূপক যন্ত্র	কম্পাস, দিক্‌-দর্শন যন্ত্র
১৩	Coral	পলা, প্রবাল, ঝন্‌ঝনিয়া	প্রবাল	প্রবাল, মুঙ্গা, পলা	প্রবাল
১৪	Destructive-ness	নাশ	×	ধ্বংস, নাশ, হানি, বিনাশ	জিঘিংসা
১৫	Electric	×	×	স্ফুলিঙ্গ নির্গমন-ধর্ম্মক কোন বস্তু	তাড়িৎ
১৬	Elements	×	×	মূল ধাতু, মূল সূত্র, বাসস্থান, অধিকার মিশ্রণের অংশ	রূঢ় পদার্থ
১৭	Faculty of form	×	×	×	আকারানু-ভাবকতা
১৮	Faculty of weight	×	×	×	গুরুত্বানু-ভাবকতা
১৯	Fin	ডাইনা, পাখরুয়া, পাখা	পক্ষ	মৎস্যের পাখা, মাছের ডানা	পক্ষ
২০	Gravitation	×	×	মধ্যভাগে ঝোঁকন, মাধ্যাকর্ষণ, গুরুত্ব-প্রযুক্ত মধ্যে আগমন	মাধ্যাকর্ষণ

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফস্টার	কেরী	জন্‌সন্‌	অক্ষয়কুমার
২১	Hotel	×	×	উত্তম সাধারণ বাসঘর, সরাই, পৌঁচ ঘর	পান্থশালা
২২	Idiot	×	×	হতবুদ্ধি, ক্ষিপ্ত-ব্যক্তি, খেপা, পাগল, জড়ভরত	জড়
২৩	Imitation	×	×	প্রতিলিপি, অনু-কার, অনুকরণ	অনুচিকীর্ষা
২৪	Intestines	আপন, আপনি	×	আঁত, আঁতড়ী, নাড়ী-ভুড়ি, অন্ত্র	অন্ত্র
২৫	Lunatic Asylum	×	×	উন্মত্ত ব্যক্তি, উন্মত্ত	ক্ষিপ্তনিবাস
২৬	Machine	×	×	যন্ত্র, কল	শিল্পযন্ত্র
২৭	Mental Philosophy	×	×	×	মনোবিজ্ঞান
২৮	Meteoro-logical office	×	×	×	মানমন্দির
২৯	Microscope	দূরবীণ, দৃষ্টিযন্ত্র	×	দৃষ্টিবিস্তার যন্ত্র যদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু বড় দেখায়, দূরবীণ বিশেষ	অনুবীক্ষণ যন্ত্র

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফস্টার	কেরী	জন্‌সন্‌	অক্ষয়কুমার
৩০	Natural History	×	×	×	প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত
৩১	Natural	×	×	×	নৈসর্গিক
৩২	Ocean	×	×	×	সমুদ্র
৩৩	Orphan	অনাথ, পিতৃ-মাতৃহীন	×	পিতৃমাতৃহীন বালক	অনাথ
৩৪	Ovule-shape	×	×	×	অণ্ডাকৃতি
৩৫	Philopro-genitiveness	×	×	×	অপত্যস্নেহ
৩৬	Phrenology	×	×	মুণ্ডাকৃতি দ্বারা স্বভাব ও স্বাভাবিক শীলতা নির্ণয়বিদ্যা	মুণ্ডতত্ত্ব-বিবেক
৩৭	Physics	×	×	পদার্থবিষয়ক বিদ্যা	পদার্থবিদ্যা
৩৮	Physiology	×	×	পদার্থ বা বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান বস্তু	শারীরিক বিধান-বিদ্যা
৩৯	Political economy	×	×	×	লোকযাত্রা-বিধান
৪০	Polygamy	×	×	×	অধিবেদন

	মূল ইংরেজী শব্দ	ফস্টার	কেরী	জন্সন্	অক্ষয়কুমার
৪১	Province	সুবা, স্থান, সরকার, চাকলা, জিলা ভারকার্য, দেশ	প্রদেশ	যুদ্ধে লব্ধ দেশ, প্রদেশ রাষ্ট্র, চাকলা, সুবা, নিজ অধিকার	প্রদেশ
৪২	Republic	×	×	প্রজাপ্রভুত্ব, সাধারণাধিকার	সাধারণ-তন্ত্র
৪৩	River	×	×	গাং, সরিৎ, নদী, স্রোতস্বতী	নদী
৪৪	Round-shape	×	×	×	গোলাকৃতি
৪৫	Secretiveness	×	×	×	জুগুপিষা
৪৬	Self-esteem	×	×	×	আত্মাদর
৪৭	Steam Carriage	×	×	বাষ্পীয় জাহাজ, বাষ্পের নৌকা	বাষ্পীয় রথ
৪৮	Telescope	×	দূরবীণ	দূরদর্শন যন্ত্র, দৃষ্টিযন্ত্র, দূরবীণ	দূরবীক্ষণ যন্ত্র
৪৯	Thunder	গর্জন, গজনক, গড়গড়ান, নাদন ছড়ছড়ানো	×	বজ্রনিস্বন, গড়গড়ি, মেঘগর্জন, মেঘনাদ, আকাশের ডাক	বজ্র
৫০	Volcano	জ্বালামুখী	×	স্ফুলিঙ্গ নির্গমন-ধর্মক কোন বস্তু	আগ্নেয়গিরি

অভিধানগুলির শব্দের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পারিভাষিক শব্দগুলির এই আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, অভিধানগুলিতে বহুক্ষেত্রেই 'সংজ্ঞা শব্দ' ঠিক দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয়েছে শব্দগুলির ব্যাখ্যা। সেইজন্য বহু শব্দের অর্থগত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন, Analysis-এর বাংলা Foster দিচ্ছেন 'পৃথক ছাড়াছাড়ি', জন্‌সন্‌ দিচ্ছেন 'স্থূল হইতে প্রত্যেক অংশের পার্থক্য'; যেমন, জনসন্‌ Microscope-এর বাংলা শব্দ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'দৃষ্টিবিস্তার যন্ত্র যদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু বড় দেখায়'; যেমন, Thunder-এর বাংলা ফস্টার দিয়েছেন 'গর্জন, গজনক, গড়গড়ান, নাদন, ছড়ছড়ান'। পরিভাষা যে একটি বিশেষ শব্দ একটি বিশেষ অর্থে অভিপ্রেত বিষয়কেই বোঝায়, অভিধানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি তা বোঝায় না। পরিভাষা কখনো বহু-সমার্থক ও তুল্যার্থক শব্দে গঠিত হয় না। পরিভাষার লক্ষণ নির্দেশ করে রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছিলেন, 'এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে, দুই শব্দ একার্থবাচী হইবে না।'[১৯] অর্থাৎ, Coral-এর পরিভাষা 'পলা' 'প্রবাল' 'ঝনঝনিয়া', 'মুঙ্গা' এতগুলি শব্দ হতে পারে না। 'প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইবে, তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না।' অর্থাৎ, ধরা যাক coral-এর পরিভাষা 'প্রবাল', এখন এই 'প্রবাল' পারিভাষিক শব্দটি কেবলমাত্র 'coral' অর্থেই ব্যবহৃত হবে, অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারবে না।

৪

অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য এইখানে। প্রধানত তাঁর কৃত পরিভাষাগুলি পারিভাষিক শব্দ-নির্মাণের পদ্ধতিসম্পন্ন, একটি শব্দ একটি শব্দের অর্থকেই সূচিত করে, একাধিক শব্দের সমার্থক শব্দ সৃষ্টি হয় নি সেগুলি, দ্বিতীয়ত শব্দগুলি 'সংজ্ঞা শব্দ' অর্থাৎ যে বিষয়ক শব্দটিকে বোঝায়, শব্দটি সেই বিষয়ক শব্দটির স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করে। যেমন, **'VOLCANO'** শব্দের পারিভাষিক শব্দ অক্ষয়কুমার 'আগ্নেয়গিরি' ব্যবহার করেছেন। এখন এই 'আগ্নেয়গিরি' শব্দটি 'জ্বালামুখী' বা 'দাবানল' বা 'অগ্নি উদ্গিরণ ক্রিয়াসম্পন্ন এক শ্রেণীর পর্বত'কে বোঝায় না, 'আগ্নেয়গিরি'র সমার্থক শব্দ আর নেই, **VOLCANO**'র বাংলা পরিভাষা ঐটি। 'The

Definite & precise equivalent word' হওয়াই পরিভাষার কর্তব্য। সেদিক থেকে ফেলিক্স্ কেরী, ম্যাক্, বুটন, পিয়ারসন্ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-রচয়িতাগণ সর্বদা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। পারেন নি, তার কারণ অবশ্য ব্যক্তিপ্রতিভার কোন দৈন্য নয়। নূতন বিষয়, আর প্রায় নবোদ্ভূত বাংলা গদ্যের অতি স্বল্পচর্চাই সেক্ষেত্রে বাধা ছিল। ফেলিক্স্ কেরী থেকে পীয়ারসন পর্যন্ত সকলেই বাংলা পরিভাষা-সৃষ্টি ও তার ব্যবহার করতে যে সচেষ্ট ছিলেন বাংলা ভাষার ইতিহাসে সেটিই খুব বড় গৌরবের কথা। অক্ষয়কুমার এই গৌরবের ধারাটি বহু-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক রচনায় বহু-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টি ও ব্যবহার করে, পূর্বসূরীদের কৃত পরিভাষাগুলি সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জনা করে, বা প্রয়োজনস্থলে অবিকৃত রূপে পুনরায় ব্যবহার করে আরো গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। বাংলা ভাষার পারিভাষিক শব্দের ইতিহাসে এই কারণেই অক্ষয়কুমারের স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ পারিভাষিক শব্দ গঠন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

> 'বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য।'[১০]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য পরোক্ষে অক্ষয়কুমার-কৃত পরিভাষাগুলির অকপট প্রশংসারূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি যে সমস্ত রচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল সে রচনাগুলির অধিকাংশই তখনকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনিবার্যভাবেই সে রচনাগুলির পাঠক ছিল বালক-বালিকাগণ। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক রচনায় সমৃদ্ধ 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড সে সময়ে, এবং পরেও (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্তও) বিশেষ সমাদৃত পুস্তক ছিল। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি নিতান্ত মূল্যহীন হলে বহু বৎসর কাল ধরে তাঁর গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তাও অটুট থাকতো না। তবে অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির সব কটিই সর্বাঙ্গসুন্দর, সহজ ব্যবহারযোগ্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। কোন পারিভাষিক শব্দনির্মাতার ক্ষেত্রেই সর্ববিষয়ক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। পারিভাষিক শব্দগঠনের সর্ববিধ লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সেই

পারিভাষিক শব্দটি অচল হয়ে যেতে পারে যদি, তার ব্যাপক ব্যবহার না করা হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

'......, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দ বিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।[২১]

সুতরাং অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলি পরবর্তীকালে কিরূপ ব্যবহৃত হয়েছিল তার পরেও পারিভাষিক শব্দগুলির মূল্যমান নির্ভর করে। অক্ষয়কুমারের পরে বাংলা ভাষায় পরিভাষা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায়,[২২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগেশচন্দ্র পারিভাষিক শব্দ-সমস্যা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।[২৩]

রামেন্দ্রসুন্দরও পারিভাষিকতা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যোগশচন্দ্রের পরিভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'এই গ্রন্থেও স্থূলতঃ ম্যাক্ সাহেবেরই প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।' ম্যাকের ভাষায় তাঁর পরিভাষা-নির্মাণের 'প্রণালী' ছিল—

I have preferred, therefore, expreseing the European in Bengalee characters, merely changing the prefixess and terminology, so decently to incorporate the new words into the language.

ম্যাকের পরিভাষার উদাহরণ: Barometer—বারোমেতর, Thermometer—তেরেমোমেতর, Chemistry—কিমিয়াবিদ্যা প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে এবং 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব রচিত পারিভাষিক শব্দের তালিকাটিতে প্রায় ৩৯৫টি পরিভাষার উল্লেখ আছে।[২৪] এ ছাড়া বুদ্ধদেব বসু, সমীরকান্ত গুপ্ত প্রভৃতিরও রবীন্দ্র-পরিভাষা-বিষয়ক আলোচনায় এ সম্পর্কে আরো তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।[২৫] রবীন্দ্রনাথ পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখেছিলেন—

বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে।[২৬]

অন্যত্রও লিখেছেন—

> বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের এই 'খট্‌কা' লাগার কারণ পরিভাষার স্বীকৃতিবহুল ব্যাবহারিক ক্ষমতা, ও স্পৃহানির্ভরতা। নূতন সৃষ্ট পরিভাষার সঙ্গে অভ্যস্ত পুরাতন জীবনের অসঙ্গতি প্রথমে হয়তো আসে, কিন্তু পরে তার বহুল প্রচলনের মধ্যে সেই প্রাথমিক অসঙ্গতিই ব্যাবহারিক জীবনের অপরিহার্যতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, 'রেডিও' আবিষ্কারে পূর্বে শব্দটির ব্যবহার সাধারণের নিকট অর্থহীন ছিল। প্রথম আবিষ্কৃত 'X-Ray' বা 'রঞ্জনরশ্মি'র মত প্রথম প্রথম বিষয়টির অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতার জন্য শব্দটি ব্যাপকভাবে চলতে পারে নি, কিন্তু ব্যবহারের ফলে এখন শব্দটি বস্তুটির মতই একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরিভাষার এই ব্যাবহারিকতার জন্যই তার প্রচলনের যে সাফল্য নির্ভর করে সে সম্পর্কে Fitz-Gerald-এর একটি মূল্যবান মন্তব্য এ সম্পর্কে দেখা যেতে পারে, Fitz-Gerald লিখেছেন—

> Most of the words appear at first as if they would prove most awkward in practices, but remembering similiar fear (which subsequently proved groundless) in similar matters, one is afraid to say that they are due to more than unfamiliarity.[২৮]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিজে পরিভাষা সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর 'শব্দকথা'র (১৯১৭) অন্তর্গত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', 'শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা' 'বৈদ্যক পরিভাষা', 'রাসায়নিক পরিভাষা' এবং 'বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধ ক'টি আলোচ্য-প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান। রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন—

> 'বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি (পরিভাষাগুলি) প্রত্যেকে সুনির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে।'
>
> —(বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রামেন্দ্র-রচনাবলী ৩, ১৪৩)

চলিত বাংলার কিছু শব্দ উক্ত অর্থে তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষারূপে সঙ্কলনও করেছিলেন; যেমন, Mass...বস্তু, Lens...পরকলা, Prism—কলম। রামেন্দ্রসুন্দর মনে করতেন নূতন শব্দ সঙ্কলনের জন্য ব্যাবহারিক সুবিধার প্রতি যত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তত বেশী সতর্কতা শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির প্রতি আবশ্যক নেই। প্রয়োজনে অভিধানের বাইরেকার শব্দও গ্রহণ করা যেতে পারে, এবং উচ্চারণের সুবিধার জন্য এ সকল শব্দের সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প-পরিবর্তিত রূপ গ্রহণেও বাধা থাকা উচিত নয়। যেমন, hundredth...of a metre'—সেন্টিমিটার, বা a hundred grammes—কিলোগ্রাম। বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনে শব্দ গ্রহণ করে বাংলা পরিভাষা গঠন করাতে কোথাও আপত্তি নেই বলে মনে করেছেন। তবে যে সমস্ত শব্দ একবার প্রচলিত হয়ে গেছে বাংলায়, সেগুলি আর নূতন করে সংস্কার করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি, যেমন অম্লজান (OXYGEN)। পরিভাষা-সৃষ্টি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে তাই রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা হল—

> সুবিধা সরলতা শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়া, একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।[২৯]

অক্ষয়কুমারের পরিভাষা তাঁর পরবর্তীকালে কিভাবে রক্ষিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে গেলে বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তিনি কি ধরণের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা দেখা আবশ্যক বলে মনে করি। পরিভাষা ঠিক কি ধরণের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বঙ্কিম স্বতন্ত্র কোন আলোচনা না করলেও বাঙ্গলা শব্দগঠন সম্পর্কে তিনি যে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা পরিভাষা-সৃষ্টির পক্ষেও ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হয়। বঙ্কিমের বক্তব্যধারায় তিনটি সূত্র লক্ষিত হয়—

১. রূপান্তরিত, প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। (অবশ্য তাই বলে 'মাথা'র পরিবর্তে 'মস্তক' ব্যবহার করলে বা 'ঘর'র পরিবর্তে 'গৃহ' ব্যবহার করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তবে অকারণে 'গৃহ'

'মস্তক' বা 'পত্র' 'তাম্র'র ব্যবহার না করাই উচিত)। 'ভ্রাতৃভাব' যত প্রয়োজন, 'ভাই ভাব' তত না।

২. তৎসম শব্দ, যা প্রচলিত হয়েছে, তার রূপান্তর বা তদ্ভব রূপ ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন, জল (Water), অম্লজান (Oxygen)।

৩. নূতন প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় গ্রহণ করা আবশ্যক, যেমন ইংরাজী Gravitation শব্দটির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 'মাধ্যাকর্ষণ' (সং শব্দ) শব্দটির প্রয়োজন অনুভূত হল।

অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অনুবৃত্তির সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা যাতে জন্মায় তার জন্য পরপৃষ্ঠায় আমরা একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ-চিত্র রাখ্‌ছি। এতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর এবং সাম্প্রতিক-কালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত, রাজশেখর বসু-সম্পাদিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা'র সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির কার্যকারিতা বেশ বোঝা যায়। বহু পরিভাষাই রক্ষিত হয়েছে, অবশ্য কিছু ঈষৎ-পরিবর্তিতরূপে। মোটের উপর অক্ষয়কুমারের বহুসংখ্যক পরিভাষা (অন্তত উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী ৭০% অধিক সংখ্যক) পরবর্তীকালে রক্ষিত হয়েছে। রক্ষিত হওয়া মানে পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অক্ষয়কুমারের প্রতিটি পারিভাষিক শব্দই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে এ কথা বলা সম্ভব নয়, বোধ হয় কোন পরিভাষা-নির্মাতার পক্ষেই এরূপ সর্বসাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। গঠন এবং প্রচলনভিত্তিক পরিভাষার সাফল্য। পরিভাষা-নির্মাণের নিয়মগুলিও যেমন এ ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়, তেমনি তার ব্যাবহারিক কর্তব্যগুলিও অবশ্য সম্পাদনীয়। নতুবা সুগঠিত পরিভাষা নূতনের অসঙ্গতিতে চিরদিনের জন্য অপরিচিত শব্দরূপে থেকে যাবে।

অক্ষয়কৃত ও ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির সঙ্গে আধুনিক বাংলা পরিভাষাগুলির অন্যতম একটি বড় পার্থক্য এদিক থেকে লক্ষণীয়। আধুনিক কালে বহু পরিভাষা গঠিত হয়েছে যেগুলি মূল ইংরেজী পারিভাষিক শব্দরূপেই স্থান পেয়েছে। অক্ষয়কুমারের পরিভাষায় কোন ইংরেজী শব্দ স্থান পায় নি। এমন কি, 'হাইড্রোজেন' অক্ষয়কুমারের পরিভাষায় 'হায়দ্রজন' রূপে ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে আধুনিক কালে, 'বেলুন', 'ট্রেন', 'ট্রাম' প্রভৃতি শব্দ অবিকৃত ইংরেজী

মূল ইংরাজী শব্দ	বঙ্কিমচন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ	রামেন্দ্র-সুন্দর	রাজ-শেখর	অক্ষয়কুমার
Galaxy	ছায়াপথ	নীহারিকা	ছায়াপথ	ছায়াপথ	ছায়াপথ
Solar (System)	সূর্যমণ্ডল	সৌরমণ্ডল, সৌরজগৎ	সৌরজগৎ	×	সৌরজগৎ
Comet	ধূমকেতু	ধূমকেতু	ধূমকেতু	ধূমকেতু	ধূমকেতু
Physics	পদার্থবিদ্যা	বস্তুতত্ত্ব	পদার্থবিদ্যা	পদার্থ-বিদ্যা	পদার্থবিদ্যা
Star-clu-sters	নক্ষত্রসমষ্টি	নক্ষত্রপুঞ্জ	নক্ষত্রপুঞ্জ	×	নক্ষত্রপুঞ্জ
Rail-Engine	লৌহশকট	(Under-ground Rail) পাতাল বাষ্পযান	বাষ্পীয়যান	×	বাষ্পীয় শকট
Chemistry	রসায়নবিদ্যা	×	রসায়নবিদ্যা	রসায়ন	রসায়নবিদ্যা
Gravita-tion	মাধ্যাকর্ষণী শক্তি	×	মাধ্যাকর্ষণ	মহাকর্ষ	মাধ্যাকর্ষণ
Aircraft (Baloon)	ব্যোমযান	×	ব্যোমযান	(বেলুন)	ব্যোমযান
Teles-cope	দূরবীক্ষণ	দূরবীণ	×	দূরবীক্ষণ দূরবীণ	দূরবীণ

শব্দরূপেই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করার অন্যতম কারণ সে-যুগীয় অভ্যাস (Periodic feature), H. H. Wilson তাই 'হ. হ. উইলসন' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, Max Mullar তাই 'মোক্ষমূলার' রূপে লিখিত হয়েছে। তাই পরিভাষা-নির্মাতাই সর্বক্ষেত্রে তাঁর পারিভাষিক শব্দের প্রচলন-সাফল্যের বা অসাফল্যের জন্য দায়ী থাকেন না। তা ছাড়া ভাষার মত পরিভাষারও নিত্যপরিবর্তন একান্ত স্বাভাবিক ধর্ম। চসার-ব্যবহৃত শব্দ, আর মুর-ব্যবহৃত শব্দ, ইয়েটস্‌-ব্যবহৃত শব্দ আর পোপ-ব্যবহৃত শব্দ একজাতীয় নয়। নিউটনের পরিভাষা আর আইন্‌স্টাইনের পরিভাষা একজাতীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তন যুগাশ্রয়ী এবং অনিবার্য। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারে শুধু নূতন নূতন পরিভাষারই জন্ম হয় না, পূর্বে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তার সংশ্লিষ্ট পরিভাষার পরিবর্তনও হয়। তাই বলা চলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলির বিনাশ নেই, পরিবর্তন আছে। অক্ষয়কুমারের পূর্বে ও তাঁর সমকালীন সময়ে Biology-র পরিভাষা ছিল 'প্রাণীবিদ্যা', অক্ষয়কুমারের পরবর্তীকালে এবং এখনও Biology-র পরিভাষা 'জীববিদ্যা'। কিন্তু তাই বলে আবিষ্কৃত প্রাণীবিদ্যা শব্দটির বিনাশ হয় নি, Zoology—'প্রাণীবিদ্যা' ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫

অক্ষয়কুমার-ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি শব্দের জাতে বেশীর ভাগই তৎসম শব্দে রচিত। তৎসম পরিভাষা সৃষ্টির অর্থ বাংলা ভাষার মৃত্যু নয়। অনেক সময় তৎসম শব্দ একান্ত অপরিহার্য। যেমন 'শব্দ' 'জল'। অক্ষয়কুমারের পরিভাষাগুলির পারিভাষিক গুণ সৃষ্টির জন্যেও তৎসম শব্দের প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ Journalistic-এর পরিভাষা 'খবুরে কাগুজে' ব্যবহার করেছিলেন। ultra violate ray-র পরিভাষা তিনি 'বেগনীপারের আলো' ব্যবহার করেছিলেন. কিন্তু ব্যাবহারিক প্রয়োজনের খাতিরে অক্ষয়কুমারের সাধারণতন্ত্র (Republic) নিয়োগকর্তা (Employer) সম্ভবত এখনও বেশী প্রচলিত।

আসলে তৎসম, বা তদ্ভবের সমস্যা এ ক্ষেত্রে তত বেশী গ্রাহ্য নয় যত বেশী ধর্তব্য পারিভাষিক স্বাভাবিকতা। শব্দ, জল, চেতন, অচেতন, আকাশ, মেঘ সেইজন্য যত স্বাভাবিক ও সমস্যাশূন্য, ঠিক তত অস্বাভাবিক ও সমস্যাকীর্ণ

শব্দ হল, নির্ণিমিৎসা, জুগুপিষা, জিজীবিষা, ঘটনাভাবুকতা, বা টঙ্কশালা। সম্ভবত এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিক শব্দ Delicate—সুশ্লক্ষ্ণ Easy chair—লঘু খট্টিকা,—Loving—কম্র, Pressed flat—পিচ্চট বা apparatus—উপস্কর, প্রভৃতি সাধারণ্যে স্বীকৃতির অপেক্ষায় এখনও। তাই ভালমন্দ, সাফল্য-অসাফল্য সব মিলিয়েও বলা চলে অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক বিজ্ঞান-বিষয়ক সরল এবং জনপ্রিয় রচনাদি লিখেছিলেন, তেমনি বাংলা ভাষায় অগণিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-নির্মাতা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা লেখকরূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের স্থান সবিশেষ উল্লেখ্য। অক্ষয়কুমারের পরিভাষার একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

১। আমাদের পরিচিত শব্দগুলির সাহায্যে দৈনন্দিন কাজকর্ম ভালভাবেই চলে যায়। কিন্তু যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে হয়,—কী দর্শন, কী ধর্ম, কী বিজ্ঞান বা সাহিত্য—তখনই প্রয়োজন হয় নূতন শব্দের। এই সব শব্দের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের ইঙ্গিত সংক্ষেপে এবং সূত্রাকারে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত এদেরই বলা হয় পরিভাষা।

২। সা. সা. চ. (৮ খণ্ড : ৮৮ সংখ্যা), ১৭-১৮।

৩। "Translating into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of England printed at the Serampur press for the School Book Society."

—তদেব, 81

৪। শিবনাথশাস্ত্রী, রামতনু, ১৯০৩, ৪৯।

৫। (1) May's Arithmetic (1818), (2) Ula Uta Bibaran (1825), (3) Lawson's History of the lion (1819), (4) Pashvabali (1852), (5) Pashvabali (1834), R. C. Mitra., (6) Pakhi Bibaran (undated), (7) Camel, Elephants (1851), (8) Astronomy (1833), (9) Padartha Bidyasar, Yates (1825) (10) Padartha Bidya, Yates (1834), (11) Bhugal Brittanta, Pearce (1818), (12) Map of the World (821).

"Animal Biography, Pashvabali, 162, 10 as, 1852. S. B, S. An old work by Lawson, re-written in elegant language, with additions by female education four years ago. It gives anecdotes illustrative of the following animals, and

their habits-lion, jackal, bear, elephant, rhinoceros, hippopotamus, tiger, and cat ; the previous edition of 1925 was compiled by J. Lawson and translated by W. Fearce".

৬। প্রবাসী, ৪ ভাগ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন (১৯০৪)

৭। বিদ্যাহারাবলী ৩ সংখ্যা (ডিসেম্বর, ১৮১৯) মলাট পৃষ্ঠা ২, দ্রষ্টব্য সা. সা. চ. (৮) ৮৮, ৩৭।

৮। তদেব।

৯। বিদ্যাহারাবলী ৩ সংখ্যা (ডিসেম্বর, ১৮১৯) মলাট পৃষ্ঠা ৩, দ্রষ্টব্য সা. সা. চ. (৮) ৮৮, ৩৭।

১০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', রামেন্দ্র-রচনাবলী (৩) ১৯৫০, ১৩৭

১১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'রাসায়নিক পরিভাষা', পূর্বে উল্লিখিত, ১৮৫। রবীন্দ্রনাথ, 'শব্দচয়ন', বিশ্বভারতী (এপ্রিল-জুন : ১৯৫৮) ৩১০,

১২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'রাসায়নিক পরিভাষা' পূর্বে উল্লিখিত ১৯২ রবীন্দ্রনাথ, 'শব্দচয়ন', বিশ্বভারতী (এপ্রিল-জুন : ১৯৫৮) ৩১০

১৩। 'অক্ষয়-গ্রন্থ-পরিচিতি'র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪। অক্ষয়কুমারের পরিভাষার একটি বিস্তৃত তালিকা বক্ষ্যমান অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল।

১৫। Foster, Foster's vocabulery (1799) in 2 vols. containing 18,000 words.

১৬। W. Oarey, A Dictionary of the Bengalee Language (1825) containing 30,000 words

১৭। Mendie's abridgenent of Johnson's Dictionary (1822) containng 30.000 words,

১৮। তুলনাচিত্রে উল্লেখ করা সমস্ত শব্দগুলিকে ঠিক 'পরিভাষা' বলা যায় না সত্য, যেমন hotel কিন্তু 'সাধারণ পরিভাষা' বিভাগের মধ্যে জনজীবনযাত্রার ব্যবহৃত, প্রচলিত বহু সাধারণ শব্দ পড়ে, যেগুলির একটি বিশেষ অর্থ থাকে, অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে তার প্রয়োগ হয় না। অথচ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। যেমন : Ocean, Province, River, Orphan প্রভৃতি।

১৯। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পূর্বে উল্লিখিত, ১৮৫।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বপরিচয়' ভূমিকা (১৯৩৭)।

২১। তদেব, 'শব্দচয়ন', বিশ্বভারতী পত্রিকা, (এপ্রিল-জুন : ১৪।৪, ১৯৫৮), ৩১০।

২২। যোগেশচন্দ্র রায় কটকের কটক কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত 'সরল রসায়ন' (১৯৯৮) নামক কেমিস্ট্রি বইটিতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহারও করেছেন।

২৩। যোগেশচন্দ্র রায়, 'সরল রসায়ন' (১৮৯৮) ভূমিকা, দ্রঃ রামেন্দ্র-রচনাবলী (৩), ১৯

২৪। বিশ্বভারতী পত্রিকা, (৪ বর্ষ : ৪ সংখ্যা এপ্রিল-জুন, ১৯৫৮) 'শব্দচয়ন', দ্রঃ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ৪ সংখ্যাঃ ১৯২৯-৩০।

২৫। বুদ্ধদেব বসু, 'সমালোচনার ভাষা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, তদেব, ৩৯টি শব্দ।

২৬। সমীরকান্ত গুপ্ত, শব্দ-শিল্পী—রবীন্দ্রনাথ, তদেব, ১৯৪টি। রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্বপরিচয়', ১৯৩৭, ভূমিকা,।

২৭। তদেব, 'শব্দচয়ন' দ্রঃ বিশ্বভারতী, পূর্বে উল্লিখিত, ৩১০।

২৮। রামেন্দ্রসুন্দর—পূর্বে উল্লিখিত, ১৪৯)।

২৯। রামেন্দ্রসুন্দর, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পূর্বে উল্লিখিত, ১৪৪।

অষ্টম অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ : রচনাপরিচিতি ও ধর্মসাহিত্য

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা যেমন নীতিবিষয়ক, এবং বিজ্ঞানবিষয়ক তেমনি দেবেন্দ্র-রচনার অধিকাংশই হল ধর্মবিষয়ক, এবং এই ধর্মবিষয়ক রচনাগুলি আবার মূলত বক্তৃতা এবং উপদেশ। দেবেন্দ্র-রচনার অন্য দুটি বিষয় হল পত্রসাহিত্য, এবং আত্মজীবনী-সাহিত্য। অক্ষয়কুমারের রচনায় এ বিষয়-দুটি ছিল না। সমগ্র দেবেন্দ্র-সাহিত্যকে বিষয়ানুসারে তা'হলে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।—

১. বক্তৃতা ও উপদেশ : ধর্মসাহিত্য। (১৮৫০-১৮৯৫)।

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ, (১৮৫০), ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ-বঙ্গানুবাদসহ ১, ২ ভাগ (১৮৫১), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৮২), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ (১৮৬০-'৬৭), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ১ প্রকরণ (১৮৬১), ২ প্রকরণ (১৮৬৬), ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট (১৮৮৫), ব্রাহ্ম-বিবাহ-প্রণালী (১৮৬৪), ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৮৬৪), ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি (১৮৬৫), ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ (১৮৬৫-৬৬), উপহার (১৮৮৭), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৫)।

২. পত্রাবলী (১৮৫০-১৮৮৭)।

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত কিছু পত্রের সঙ্কলন। সঙ্কলিত পত্রগুলির অধিকাংশই ১৮৫০-১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। প্রায় ১৪৬ খানি পত্রের এই সঙ্কলনে মহর্ষির নিজের লিখিত পত্রের সংখ্যা ১৩৪ খানি।

৩. আত্মচরিত (১৮৯৮)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ তে।[১] গ্রন্থটির একটি ইংরেজী অনুবাদ

> করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।[২] আণ্ডারহিলের মূল্যবান ভূমিকা এই অনূদিত জীবনচরিতের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করেছে। পুস্তকটির জাপানী অনুবাদও হয়। জাপানের তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিজো ইনাজু গ্রন্থটির অনুবাদ করেন।[৩]

কম বেশী পোনেরখানি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দুখানি গ্রন্থ বক্তৃতা, বা উপদেশাকারে রচিত নয়। বাকী সব ক'খানা গ্রন্থই দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, বা উপদেশাকারে রচিত, ও প্রচারিত। এ সব গ্রন্থগুলিই ধর্মবিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই সংখ্যার দ্বারাই অনুমিত হয় যে, ধর্মচিন্তাই দেবেন্দ্র-মানসের সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা ও উৎস। লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের স্বভাব-পার্থক্যও এখানে। একজন বিজ্ঞানবাদী মানবপ্রেমিক নীতিজ্ঞ, অন্যজন ধর্মবিশ্বাসী ঈশ্বরপ্রেমিক মহর্ষি। অক্ষয়কুমার যত বেশী মনস্ক, দেবেন্দ্রনাথ তত বেশী হৃদ্গত।

১

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা, বা উপদেশাকারে প্রকাশিত রচনাগুলি সম্পূর্ণ নূতন। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্যগন্ধী ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করেন। ইতিপূর্বে ধর্মমূলক রচনার সূত্রপাত রামমোহন করেছেন। কিন্তু রামমোহনের ধর্মবোধ যতটা যুক্তিগ্রাহ্য ছিল, ততটা অনুভব্য ছিল না। যেমন তাঁর ভাষা, তেমনি তাঁর ধর্মবোধ—দুটিই ঋজু, যুক্তিতে গ্রাহ্য, মননসমৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ছিল মরমী চিন্তাপ্রসূত। সাধকের চিত্তগত উপলব্ধি। রামমোহনের সঙ্গে পার্থক্য এখানে। রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এই ত্রিধর্মের কোন ধর্মকেই চরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেন নি। মনে-প্রাণে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু তাঁর ধর্মবোধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় ছিল বিশ্বানুভূতি, একটি সার্বজনীন সমতাবোধ। এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। ম্যাক্সমূলার লিখেছেন—

> There is a quiet courage, simple straight forwardness in all Rammohon Roy's acts. Some of his friends have misunderstood him, and claimed him for a Mohammedan,

or a Christian. He said himself, just before he set out for Europe, that on his death each sect, the Christian, the Hindu, and the Mohammedan would claim him as their own, but that he belonged to none of them. His religious sentiments are embodied in a pamphlet, written and printed in his life time, but according to his injunction, not published till after his death. This work discloses his belief in the unity of the Deity, his infinite power, his infinite goodness, and in the immortality of the soul.[8]

রামমোহনের এই সার্বজনীনতাই রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র। সাম্প্রতিক-কালীন রামমোহনের ধর্মবোধের নব মূল্যায়নও এই ধারণারই পোষকতা করে। এ বিষয়ে দুটি মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—

রামমোহনের বেদান্তমত বিশ্বধর্মের নামান্তর।[৫]

অপরদিকে অজিতকুমার চক্রবর্তীও মনে করতেন—

রাজা রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের সাধনা কি ছিল তাহা যদি এক কথায় আমায় বলিতে হয়, তবে বলিব তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা ছিল মুক্তির সাধনা। তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্য চিরজীবন তপস্যা করিয়াছেন। তাঁর মুক্তি কেবল মুক্তি নয়, তাঁর মুক্তি সর্বমুক্তি, বিশ্ব-মুক্তি, বিশ্বমানব-মুক্তি।[৬]

দেবেন্দ্রনাথও ধর্মচিন্তায় একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু রামমোহনের মত নিখিল বিশ্বের ধর্ম-সম্মিলনের একতাবোধ তাঁর ছিল না বোধ হয়। এদিক থেকে তিনি সম্ভবত একটু সংরক্ষণশীল ছিলেন।

উভয়ের ধর্মরচনার আস্বাদও তাই পৃথক। হিন্দুসমাজকে কুসংস্কার-মুক্ত করার প্রয়াস রামমোহনের জীবনের প্রধান কাজ ছিল। রচনাগুলিও তাঁর সেই সামাজিক, তথা মানবিক জীবনের কল্যাণের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল। সেখানে প্রয়োজন যত বড় ছিল, সাহিত্যের সুরভিত আবেদন তত বড় ছিল না। যুক্তিই কর্মের এষণা। সে ক্ষেত্রে হৃদয়ানুভাবকতার স্থান কম।

রামমোহনের ধর্মমূলক রচনাগুলিও তাই তর্ক-বিতর্কমূলক, যুক্তিতে শাণিত গদ্য। আর দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমূলক রচনাগুলি একজন ঈশ্বর-উপাসক সাধকের মর্ম-উৎসারিত উপলব্ধির প্রকাশ-রূপ। তা চিত্ত-উদ্ভূত বীণার সুরের মতন। আত্মচেতনার রঙে ভরা, তদ্‌গত।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের (১৮৫০) স্থান সেদিক থেকে বাংলাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতে সামবেদ গীত হত। সে গানের মহত্ত্বে আর জয়গানে প্রাচীনকালের ঋষিদের আশ্রম মুখরিত হত, এরূপ বর্ণনার অভাবও নেই। কিন্তু বিশেষ একটি ধর্মের মন্ত্র, মাহাত্ম্য একটি সভাকক্ষ থেকে, নির্দিষ্ট বেদী থেকে কোন যাজকের মত কোন ঋষি-লিখিতরূপে ভাষণাকারে পাঠ করবেন, তার বিশদ ব্যাখ্যা করবেন, এবং ঐ বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম্য-বিঘোষিত বিশেষ ধরনের প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতও গীত হবে এরূপ ধর্মীয় আচরণ, ব্যবস্থা ঠিক পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থক নয় বলেই মনে হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বিধির সঙ্গে যতটা খৃষ্টান ধর্মের বিধির মিল আছে ততটা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য-ধারার সঙ্গে মিল নেই। দেবেন্দ্রনাথ যদিও খৃষ্টান ধর্মের সচেতন বিরোধী ছিলেন,[৭] তথাপি তাঁর এই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বিধিটি খৃষ্টানধর্মপ্রচার-বিধিরই নিকটস্থ। উনবিংশ শতকের নবজাগরণে পাশ্চাত্য যে সকল প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল, এটিকেও তাদের অন্যতম কারণরূপে এদিক থেকে অভিহিত করা বোধ হয় যায়। এ বক্তব্যের সমর্থনও মেলে ইংরেজী 'সারমন'-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে। উদাহরণস্বরূপ একটি 'সারমনে'র কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল।—

> In the great ant-hill of the whole world, I am an ant; I have my past in the creation, I am a creature; But there are ignoble creatures. God comes nearer, in the great field of clay, of red earth, that man was made of, the humanity; But man was worse. then annihilated again. When Satan in that serpent was come, as Hercules, with his club into a potter's shop, and had broke all the vessels, destroyed all mankind, And had broke all the vessels, destroyed all mankind, And the gracious promise of a

messiah to redeeme all mankind, was shed and spread upon all, I had my drop of that dew of Heaven, my sparke of that fire of Heaven, dew of Heaven, in the universal promise, in which I was involved.[৮]

ভক্ত, ভগবানের ভক্তি ও কর্মের কথাই দেবেন্দ্রনাথও অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন।—

অল্প কি বৃহৎ যাহা কিছু সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। জড়েতে তিনি ওতোপ্রোত হইয়া আছেন, আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।······তিনি সত্যের আশ্রয়-ভূমি, তিনি আত্মার প্রতিষ্ঠা, তিনি আমার আশ্রয়।[৯]

আবার 'কালেক্টসে'র ভাষা ও বক্তব্যের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের এই ধর্মীয় উপদেশ ও বক্তৃতামূলক রচনার কত মিল আছে দেখা যেতে পারে।[১০]

'Almighty God, who seest that we have no power of ourselves to help ourselves : keep us both outwatdly in our bodies and inwardly in our souls ; that we may be defended from all adversties which may happen to the body, and from all evil; thoughts which may assault and hurt the soul ; through Jesus Chist our Lord. Amen.[১১]

আর দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

আমরা বাহিরের বস্তুতে পরমেশ্বরের সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই, অসীম আকাশে তাঁহার আনন্দলীলা, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁহারই শক্তি, সূর্য্যকিরণে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। আবার যখন আপনার অন্তরে দেখি তখন আপনার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল-লীলা প্রত্যক্ষ করি। তিনি আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হৃদয়ের প্রিয়ধন।[১২]

আবার, ঈশ্বর যে মানবের অন্তরেই বিরাজমান, অথচ মূঢ় মানবসন্তান সাংসারিক কর্তব্যপথে তুচ্ছ স্বার্থ-সম্পৃক্ত কর্ম করে তার উপলব্ধির, এবং সেই উপলব্ধিজনিত কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত-ভিক্ষার মিনতিতেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সারমনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, সারমনে অপরাধী ভক্ত-

সন্তান ভগবানের কাছে তার অপরাধের বোঝা ফেলে নিজকর্মের জন্য আত্মধিক্কার দিয়ে বলেছে—

> I have been a rebellious disloyal wretch, against the high authority and most rightful government of him who gave me breath, and whose creature I am. I will live no longer thus. Lo, now I come back unto thee, O Lord, thou art my Lord and God. Thee I now design to serve and obey, as the Lord of my life; thee I will fear, unto thee I subject myself, to live no longer after my own will, but thine.[১৩]

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ—

> তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এসো আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের সদ্য প্রস্ফুটিত প্রীতিপুষ্প বিকীর্ণ করি, তাঁহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে শীতল করি, সংসার দাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট কাতর মনে প্রার্থনা করি,—তিনি আমাদের আত্মাতে আত্ম-প্রসাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন। এসো, এই সময়েই আমরা তাঁহার অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া 'হৃদয়-থাল-ভার প্রীতিপুষ্প-হার' তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহা গ্রহণ করুন।[১৪]

কথা, ও সুর এক। পার্থক্য শুধু পুরুষ ও বচনের। পাশ্চাত্য 'সারমনে'র বচন এবং পুরুষ এক বচন ও উত্তম পুরুষ, আর দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে বহুবচন ও প্রথম পুরুষ।

ঈশ্বর মানবপিতা, এ বিশ্বাস পাশ্চাত্য সারমনের মধ্যে যেমন বিঘোষিত, প্রচারিত, দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলীর মধ্যেও তেমনি প্রকাশিত, প্রচারিত। পার্থক্য শুধু ভাষার এবং প্রকাশভঙ্গির। ইংরেজী ভাষায়, বিশদ ব্যাখ্যার কৌশলে পাশ্চাত্য সারমনে লিখিত হয়েছে।—

> When we be in trouble, we doubt of a stranger, whether he will help us or not: but our saviour commanding us to call God, 'Father', teacheth us to be assured of the love and good-will of God towards us. So by this word 'Father',

we learn to stablish and to comfort our faith, knowing most assuredy that he will be good unto us. For Christ was a perfect schoolmaster : he lacked no wisdom : he knew his Father's will and pleasure : he teacheth us, yea, and most certainly assureth us, that God will be no cruel judge, but a loving father."[১৫]

দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় এই 'ফাদারে'র পরিচয় হল—

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।[১৬]

সংসারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই 'পিতা'কে সম্পৃক্ত করে দেখার গভীর দৃষ্টিও দেবেন্দ্রনাথের উপদেশগুলিতে লক্ষিত হয়। যেমন এক জায়গায় লিখেছেন—

হে বিশ্ববিধাতা জগৎ-পিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে, আবার তোমারি প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক।[১৭]

ঈশ্বরের করুণা যেন জীবন ও মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত থাকে, ভক্ত যেন জীবনে, মরণে সর্বদাই সেই করুণা পেতে পারেন, এরূপ প্রার্থনার সুর ও শব্দও উভয় দেশীয় উপদেশের মধ্যেই লক্ষিত হয়। যেমন—

O may I hear those blessed sounds, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy 'Lord' and may this, thy family, receive the happy sentence. Come ye blessed children of my father, receive, 'the kingdom' prepared for you from the 'foundation of the world', grant this O merciful God! for Jesus Christ's sake.[১৮]

রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক মধু হউক, ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক,......। এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে, তখন আবার যেন প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গলছায়া লাভ করিতে পাই।[১৯]

ভাষার পার্থক্য আছে। উভয়ের দেখার পদ্ধতিতে স্বাতন্ত্র্য আছে। উভয়ের মিলও আছে। ঈশ্বরের করুণার অসীমতাবোধে, এবং সেই অসীম ঈশ্বর-প্রেমের কাঙালরূপে বহু হাজার মাইল দূরের দুই অপরিচিত ঈশ্বরপ্রেমিকের ভাবনার সাযুজ্য কতই না ঘনিষ্ঠ !

দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই এই ধর্মীয় উপদেশ, বা বক্তৃতাবিষয়ক। এই ধর্মবিষয়ক উপদেশ ও বক্তৃতাগুলি সাধারণ অর্থে সাহিত্য বলতে যে সমস্ত রচনাকে নির্দেশিত করে, ঠিক সেই সমস্ত রচনার সমপর্যায়ে আসে না। এগুলি ভাষার সাবলীলতায় শব্দ, বাক্য ও বিরতি-চিহ্নের সুসম ব্যবহার-জনিত রচনার সুষমামণ্ডিত। কিন্তু—

> The Sermon, however is less concerned with language than with life—less with the power of dramatic or poetic interpretation than with the great or little problems which it seeks to interpret. In this the sermon differs from all other forms of literature—that it deliberately propagates ideas. Its moral purpose is its outstanding quality.[২০]

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, ও উপদেশগুলি কেবল নীতি-উপদেশাত্মক নয়। ভাষা-বিশ্লেষণের অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে এগুলির ভাষার ঐশ্বর্যও কত বেশী, সাহিত্য-সুষমায়ও মণ্ডিত কত সহজে। স্যাম্প্‌সন্‌ মন্তব্য করেছেন—

> That, I suppose, is a fair summary of the layman's attitude; and yet, once committed to print (or even to ink) the sermon is literature This does not mean that a good sermon is a good work of prose, but it does mean that the sermon is a work of prose—a thing to be read as well as heard—subject to all the possibilities and potentialities of prose, and consequently vulnerable to literary criticism.[২১]

স্যাম্প্‌সনের এই মন্তব্য সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। বিশেষত দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। দেবেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলির ভাষা ও ভাষণকলা সাহিত্যসুষমা-সৃষ্টিতে সক্ষম। তারও প্রমাণ দেবেন্দ্রনাথের ভাষার বিশ্লেষণ, ও মূল্যায়নের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যে কোন ভাল গদ্যেরই রচয়িতা শ্রুতি ও দৃষ্টি মুক্ত

রাখেন। যে কোন ভাল গদ্যের উৎকর্ষ শ্রুতি ও দৃশ্যরূপ উভয়বিধ গুণের উপর নির্ভর করে, কেবল 'সারমন-গদ্য'র ক্ষেত্রে নয়। স্যাম্প্‌সনের এ মন্তব্য তাই একদেশদর্শিতাযুক্ত।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যে নীতি ও ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাদি রচিত হতে শুরু করেছিল ঠিক, কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে সে সকল পুস্তকাদির সঙ্গে দেবেন্দ্র-রচনার কোন মূল্যগত তুলনা হয় না। প্রথমত সেগুলি বেশীর ভাগই ছিল বাইবেল, বা ঈশপ্‌সের গল্পের বঙ্গানুবাদ। মৌলিক যে সকল রচনা ছিল, সেগুলিও 'সারমন-সাহিত্য' বলতে যা বোঝায় ঠিক তা ছিল না। গল্পচ্ছলে, পশুপক্ষীর রূপকে, অথবা বিধি-নিষেধের তর্জনী তুলে ভালমন্দ আচরণ করার ফলাফল সম্পর্কে উচ্চারিত গুরুজনের সাবধান-বাণী প্রকাশের মত সে সকল গ্রন্থে কতকগুলি উপদেশ প্রকাশিত হত। ফলে, ভাষার সুষমারও বিশেষ প্রয়োজন হত না। তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা গদ্যের সুষমিত ভাষারূপও তখন অপেক্ষার পথে ছিল। ফলে, উনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যের সূচনাকাল থেকেই প্রায় নীতি ও ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচিত হতে থাকলেও সেগুলি ঠিক সাহিত্য, সুষমিত 'সারমন-সাহিত্য' বা 'ধর্মসাহিত্য' রূপে গ্রাহ্য হতে পারে নি। বাংলা সাহিত্যকে সেজন্য আরও প্রায় ৫০ বৎসর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৫০-এ দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সেই প্রত্যাশিত সাহিত্য-সুষমা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যসাহিত্যে যেমন প্রথম বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষানির্মাতা, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রথম ধর্মসাহিত্যের প্রবর্তক।

২

বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান আরও দুটি কারণে উল্লেখ্য। সাহিত্য-গন্ধী আত্মজীবনীকার, এবং সু-পত্রসাহিত্যিকরূপে দেবেন্দ্রনাথের নাম বাংলা গদ্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা গদ্যের শুরু থেকেই, বলা চলে, বিষয়-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকলেই তা সাহিত্যধর্মী রচনা হয়ে ওঠে না। বিষয়কে সাহিত্যধর্মী করে তুলতে হলে তার 'রস-সম্ভোগে'র দিকেও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বাংলা গদ্যের 'বিষয়বস্তুর গৌরবে'র সঙ্গে রচনার রস-সম্ভোগের ব্যবস্থা করতে সময় লেগেছিল।

রামমোহনের গদ্যে তার পূর্ণতা আসে নি। অক্ষয়কুমারের গদ্যে, বিদ্যাসাগরের গদ্যে তার পূর্ণতা এসেছে। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে তার ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে। 'বিষয়বস্তুর গৌরব'-উজ্জ্বল অধ্যায়ও যেমন রচিত হয়েছে, 'রচনার রস-সম্ভোগে' সাহিত্যধর্মী রচনারও তেমনি সৃষ্টি হয়েছে। পত্ররচনা যে সাহিত্য-ধর্মী হতে পারে, আত্মচরিত যে সর্বজনীন মনের আনন্দ দিতে পারে তার সার্থক সমর্থন দেবেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সঙ্কলনে এবং জীবনচরিতে পাওয়া গেল। কেবল দুটি নূতন আস্বাদনীয় বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যই দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী এবং জীবনচরিত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ-রচনাগুলির ভাষাগত সৌকর্যও সমগ্র বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। বোনামিডব্রি মন্তব্য করেছিলেন—

> Men do not always speak with the same voice……we may expect a man's style to vary when the object in writing is different.

দেবেন্দ্রনাথের পত্রের ভাষা, আর তাঁর আত্মচরিতের ভাষাও পৃথক। স্বাতন্ত্র্য তাঁর ধর্মসাহিত্যের ভাষা থেকেও। পত্রের ভাষা সহজ-সরল, অনেক সময়েই আটপৌরে। চিন্তার অবাধ মুক্তিতে এলোমেলো শিথিল-বিন্যস্ত সৌন্দর্যে ভরা। অন্যদিকে আত্মচরিতের ভাষা তাঁর আত্মারই ভাষা। হৃদয়ের অনুভবের প্রকাশযোগ্য শব্দ, বাক্য, আর তাদের নির্বাচন ও সজ্জায় গঠিত ঋজু স্বতঃস্ফূর্ত ভাষার একটি গতিপ্রবাহ সমস্ত আত্মজীবনীর ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পৃথক পরিচ্ছেদে বিষয়-দুটির বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

১। ১৯২৭-এ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংশোধিত, পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়ে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬২তে।

২। ইংরেজী অনুবাদটির ভারতীয় সংস্করণ ১৯০২তে প্রকাশিত হয়, এবং লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৬তে।

৩। অন্নদাশঙ্কর রায়, 'জাপানে', ২য় সংস্করণ—১৯৬২-'৬৩, ৬৩।

৪। Max Muller F., *Rammohun to Ramkrishna*, Calcutta 1952, 17।

৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন কি শঙ্করের প্রতিধ্বনি?' তত্ত্বকৌমুদী ৮৮ বর্ষ, ৩, ৪ সংখ্যা: ১, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৫, '৬৬, ৩৫।

৬। অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রামমোহন রায়', তত্ত্বকৌমুদী, পূর্বে উল্লিখিত, ৩২।

৭। "It is singular that the one field of religious inspiration which was foreign to him was the Hebrew scriptures. He was never known to quote the Bible, nor do we find any allusion to Christ or His teachings in his sermons." Tagore Satyendranath, *The Autobiography of Maharshi Debendranath Tagore*, London, 1914, Introduction, 13.

৮। *Donne's Sermons*, London, 1919, 1.

৯। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ৯৭।

১০। "These are short prayers specially written for each Sunday of the year. Most of the English collects are translations from Latin orationes, used in the medieval English Church. but they are translations".

১১। Warner, allo, *A short Guide to English Style*., 96.

১২। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ৯১।

১৩। Macarthey, Edward Clarence, *Great Sermons of the World*, U.S.A., 182. 133.

১৪। পূর্বে উল্লিত ঃ ২·প্রকরণ, ১৩২, ৩৩।

১৫। Sampson, Ashley, *Famous English Sermons*, London, 1940, 77.

১৬। ব্রাহ্মধর্ম, ১ খণ্ড/১ অধ্যায়/অর্চনা—৭।

১৭। অনুষ্ঠানপদ্ধতি, (১৯১৭), ১২৪।

১৮। Hodson. Septimurs— *Sermon on the present state*, London, 1792, 179.

১৯। পূর্বে উল্লিখিত, ১২৫।

২০। Sampson, Ashley, *Famous English Sermons*, London, Introduction. xiii

২১। *Ibid*. viii

নবম অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ঃ পত্রাবলী

দেবেন্দ্রনাথের লিখিত কতকগুলি চিঠির সঙ্গে মহর্ষিকে লেখা কেশবচন্দ্র সেনের দশখানি চিঠি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লিখিত একখানি ইংরেজী পত্র, ম্যাক্সমূলারের ইংরেজীতে লেখা একখানি পত্র 'পত্রাবলী' নামে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত করেন। অধিকাংশ পত্রই ১৮৫০-১৮৮৭ সালের মধ্যে লিখিত। প্রায় ১৪৬ খানি পত্রের এই সঙ্কলন-গ্রন্থে মহর্ষি কর্তৃক লিখিত পত্রের সংখ্যা ১৩৪ খানি। অধিকাংশ পত্রই তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন। কিছু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সৌদামিনী দেবী, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লিখিত। সঙ্কলন, ও প্রকাশের তারিখ গ্রন্থটিতে নেই।

Francis Bacon বলেছিলেন—

Letter, such as written by wise men, are, of all the words of men, in my judgment, the best.

বিশ্বের বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির পত্র নানা কারণে যত্নসহকারে রক্ষিত, এবং পঠিত হতে দেখা গেছে।[১] ডঃ জনসনের পত্র, মূর ও বায়রনের পত্র, র'লার পত্র, মমের পত্র, রবার্ট ফ্রস্টের পত্র, রোজেনবার্গের পত্রগুচ্ছ, প্রভৃতি বহু পত্র, ও পত্রলেখক বিশ্বের দরবারে আদৃত। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ঐ সকল পত্রই পত্র-সাহিত্য নয়। পত্রকে 'সাহিত্য' শব্দের অভিধাভুক্ত করতে হলে পত্রধর্মের অতিরিক্ত সাহিত্যধর্মে পত্রকে সম্পৃক্ত করে দেখা দরকার। নচেৎ পত্র, আর পত্র-সাহিত্য হতে পারে না। প্রথমত তাকে পত্র হতে হবে। কিন্তু পত্রধর্মের অতিরিক্ত সাহিত্যধর্মেও তাকে স্বভাবিত হতে হবে। তবেই পত্র পত্রসাহিত্য হতে পারে, নতুবা নয়।

পত্র সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয়। তার আবেদন পত্রলেখক ও পত্র-প্রাপকের কাছে। অন্যদিকে সাহিত্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি হলেও তার আবেদন সর্বজনীন। সেখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। পত্র যখন ব্যক্তিমনের আনন্দ সর্বলোকচিত্তে সঞ্চারিত করে তখনি পত্র আর ব্যক্তি-বিষয় থাকে না, সর্বজনের মর্মলোকের আনন্দবোধের কারণ, সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু যেহেতু পত্র, সুতরাং তাকে পত্রের স্বভাবধর্মও মানতে হবে। সে স্বভাব-ধর্ম শুধু পত্রের আঙ্গিকে নয়, পত্রধর্মেও। রচনার মত পত্রও—

> a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition.[২]
>
> —Dr. Jhonson.

> a composition of moderate length on any particular subject or branch of a subject, originally implying want of finish, but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range.[৩]

বলা বাহুল্য চিঠিতেও এই এলোমেলো চিন্তার অবিন্যস্ত প্রকাশভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয় কোন বিশেষ মুহূর্তের, বা কোন বিশেষ বিষয়ের, বা কোন বিশেষ বিষয়ের কোন একটি বিশেষ দিক। এবং সেই প্রকাশিত অভিব্যক্তিতে থাকে একটি অপরিণত, একটি অপূর্ণতার ভাল লাগার আবেদন, যদিও এই অবিন্যস্ত, অনিয়মিত, এলোমেলো চিন্তার প্রকাশভঙ্গিতে থাকে একটি পূর্ণ, পরিণত রচনাশৈলী। এগুলো যত বেশী 'রস-সম্ভোগে'র তত বেশী 'বস্তুগৌরবের' নয়। যেন ছোট ছোট কতকগুলি রচনার টুক্‌রো গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ, আস্বাদনীয়, জটিল চিন্তাপূর্ণ, মননজাত নয়। যত বেশী ভাবের, তত বেশী ভাবনার নয়।[৪] রচনার এই সমস্ত গুণ রচনাসাহিত্যের পক্ষে সম্ভাব্য গুণ। কিন্তু পত্রসাহিত্যের পক্ষে এগুলি বিশ্লেষিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষত রচনার স্বভাবের সঙ্গে ও রচনাকারের ব্যক্তিমন, ও জীবনের যে সম্পর্ক অভিপ্রেত গুণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে,[৫] তা পত্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য।

সুতরাং পত্রের এই সমস্ত ব্যক্তিগত ভাল লাগা, মন্দ লাগা, কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত, ঘরোয়া কথা-প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সর্বজনমনে রসানুভূতি সৃষ্টির সহায়ক কিনা, বিভাবিত কোন আনন্দলোকের উৎসস্থল হতে পারে কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারলেই পত্রকে পত্রসাহিত্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাসাহিত্যে পত্রসাহিত্যের শুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে বলে একটি প্রচলিত ধারণা আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য অন্য। রবীন্দ্রনাথের

'ছিন্নপত্র'এর প্রথম প্রকাশ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। এবং ১৮৮৫-১৮৯৫ দশ বৎসর সময়ের মধ্যে লিখিত পত্রগুলি এতে সঙ্কলিত হয়েছিল। অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের পত্রলেখার কাল যখন প্রায় সারা (১৮৫০-১৮৮৭), রবীন্দ্রনাথের পত্রলেখার কাল তখন প্রায় শুরু। অতএব বলা চলে বাংলা পত্রসাহিত্যের ইতিহাসের শুরু দেবেন্দ্রনাথের হাতে, রবীন্দ্রনাথের হাতে নয়। দেবেন্দ্রনাথের লিখিত পত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পত্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে। বহু পত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘরোয়া কথাবার্তার পরিবর্তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণার কথা, প্রকাশিত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ মনের আনন্দোৎসার। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্তিমনের ঊর্ধ্বে সর্বজনমনের অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম। যেমন—

তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ-অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্বত গম্ভীর স্বরে বলিতেছে—

We rear our mighty fronts towards Heaven,
Where foot of mortal never trod ;
For me alone of natures works
Are chosen children of our God.
Ye verdant meads, ye flowing streams,
Ye in creation have your place,
Lo ! He that made you dee made you good ;
But only we have seen His face.

এই পর্ব্বতের উপরে আজকাল মেঘ বাতাস, বিদ্যুৎ বজ্র মুহুর্মুহু আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল, আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিল, যেন একেবারে সকল সৃষ্টির লোপ হইল, আবার পরক্ষণেই সম্মুখে উজ্জ্বল সবুজবর্ণ বনরাজি দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই, তাঁহার মহিমার অন্ত নাই। তাঁহার মহিমা যখন দেখিতে-

> থাকি তখন সকলি আর ভুলিয়া যাই।... ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ ইতি।[৬]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের স্বভাববৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিকে মহর্ষি ভালবাসেন কারণ সৌন্দর্যের সে ভরা সৃষ্টি, ঈশ্বরের আনন্দময় সৃষ্টি। বিচিত্র কার্যক্ষম পুরুষোত্তমের মহিমায় মুগ্ধ মহর্ষি। প্রকৃতিকে প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বভাবের জন্য তিনি ভালবাসলেও উপলব্ধি তিনি করেন যে 'ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্র'। অবশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগের জন্যই প্রকৃতি-প্রীতিও তাঁর ছিল। প্রমাণ 'পত্রাবলী'র পাঁচ সংখ্যক পত্রটি। পত্রটিতে মহর্ষির প্রাকৃতিক বর্ণনা—

> আবার আমি ঘটনাস্রোতে এই কুমারখালি অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার আর ভ্রমণের শেষ নাই। এবার আমি যেখানে আছি তাহার সম্মুখে মাঠ, পশ্চাতে মাঠ, উত্তরে মাঠ, দক্ষিণে মাঠ, লোকালয় মাত্র নাই, নির্জ্জনের একশেষ, গ্রাম ও বসতি তাহার বহুদূরে। এইক্ষণে প্রাতঃকাল, চতুর্দিকে পক্ষীর কলরব মাত্র শুনা যাইতেছে। পদ্মানদী হইতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

চিঠিতে অবিমিশ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভোগ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের আর কোন বাঙ্গালী গদ্যলেখক এভাবে সম্ভবত করেন নি। সমকালীন কোন কবির রচনাতেও এই নিসর্গপ্রীতি দেখা যায় না। বাচনভঙ্গির এই অন্তরঙ্গ রূপ বিংশ শতকে এসে আবার পাওয়া যায় পত্রে—মহর্ষির পুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে। যেমন—

> আমার ঠিক বাক্স-Phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চারদিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলি বাক্স, ছোট বড়ো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের, পশুচর্ম্মের এবং কাপড়ের—নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়—'[৮]
>
> সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত।[৯]

দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক, ২. ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক, এবং ৩. হাল্কা, লঘু হাস্যরস, পরিহাস-বিষয়ক। তিনটি উদাহরণ নেওয়া যাক।—

১. সম্প্রতি এখানে বর্ষাকাল বিরাজমান, পর্ব্বত হইতে বাষ্পসকল অনবরত নির্গত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদায় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়া পুনর্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে মেঘের সঞ্চার হইলেই বিলক্ষণ শীতের প্রভাব হয়, প্রায় বার মাসই উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।·········অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে।[১০]

২. স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় এবং বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ বোধ হয় যে, আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যয় করা ভ্রম কিনা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত না করিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে সেই স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, আর যাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় কদাপি ভ্রমমূলক নহে, সেই বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে। দুইই আত্মপ্রত্যয়। যদি স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় না থাকিত, তবে বিজ্ঞান দ্বারা তাহার প্রমাণ কদাপি হইত না।

এ প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় আনিলে তখন বিচার উপস্থিত হয়, বিচারের শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি কখনো আপনি হই নাই, এ শরীর ও মনোরূপ কৌশল আমার কৃত নহে।········· আমার যৌবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না, আমার জীবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। এই সকল আলোচনা করিয়া আমার মনেতে এমন প্রত্যয় উপস্থিত হইতেছে যে আমার কারণ ও নিয়ন্তা একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন।······একজন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।[১১]

৩. ১৫ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া ১১ মাসের কার্য্য সমাধা করিয়াছ। কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের তোমার বক্তৃতাতে তো কুইনাইনের গন্ধের লেশমাত্রও নাই। শরৎকালের শিশিরসিক্ত সেফালিকা পুষ্পের ন্যায় সেদিনকার প্রাতঃকালে তোমার হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সহজেই প্রভুর চরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল।[১২]

অথবা

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এবার কলিকাতায় বৃষ্টি হয় নাই, রৌদ্রের উত্তাপ দিন দিন বাড়িতেছে। হিমালয়ে যেমন আমার মস্তিষ্ক জমিয়া গিয়াছিল, এখানে সেইরূপ গলিয়া যাইতেছে।[১৩]

উদাহরণ ১'তে সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভোগের চিহ্ন বর্তমান। উদাহরণ ২'তে জীবন ও আধ্যাত্মিক দর্শনচিন্তার মুক্তি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ ৩'তে লঘু হাস্য-পরিহাসের আমেজ বর্তমান। সাধারণ কোন পত্রলেখকের পত্র এরূপ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের, সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার উর্ধ্বে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সর্বজনীন চিন্তার, বা আনন্দের উৎসস্থল হয় না। যখন হয় তখন আর তা সাধারণ পত্রলেখকের সাধারণ পত্র রূপে থাকে না। তা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে; পত্রসাহিত্য অভিধাযুক্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথের পত্রগুলি এদিক থেকে নিঃসন্দেহে পত্রসাহিত্য। এবং এদিক থেকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের আদর্শস্থল তাঁর পিতা, ও পিতার পত্রসাহিত্য একথা বলা চলে।[১৪] দর্শন, ধর্ম, ঈশ্বরানুভূতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, বিভিন্ন বিষয়ক পত্রের যে সাহিত্যরস-সম্ভোগ রবীন্দ্র-সাহিত্যধারাকে উর্বর, বিপুল করে তুলেছিল, বিশ্বপত্রসাহিত্যের ধারায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার উৎসমূলে দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রগুলির অবদান একান্ত করেই নেই, একথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা চলে না।

বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর স্থান বিশিষ্ট। কেবল ভাষার সম্পদে, অলঙ্করণের ঐশ্বর্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঈশ্বরানুভূতি এবং ধর্মবিষয়ক সাহিত্য-সুষমিত অভিব্যক্তিতেই দেবেন্দ্রনাথের পত্রগুলির মূল্যায়ন শেষ হয় না। বাংলাসাহিত্যে পত্রসাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ, যথার্থ ই দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, এ তথ্যের প্রমাণও মেলে এই পত্রগুলির পর্যালোচনায়। এ যাথার্থ্য, পূর্বে আলোচিত কেবল ভাষাসাদৃশ্যে, বাচনভঙ্গির মিলে বা অলঙ্করণ-চিন্তার দিক থেকে বিচার্য নয়, ভাবের দিক থেকেও। দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম-জগৎ আর জীবন-জগৎ উভয়কে সম্মিলিতরূপে গ্রহণ করে পরমব্রহ্মের প্রতি পরিণতি খুঁজেছিলেন। ৩ সংখ্যক পত্রে তাঁর বক্তব্যটি লক্ষণীয়—

সুন্দর শরীরের মধ্যে যদি মন সুন্দর হয় এবং সেই সুন্দর মন যদি পূর্ণ

সুন্দরকে ধারণ করে, তবে সে সৌন্দর্যের নিকটে কি অন্য কোন সৌন্দর্য লক্ষ্য হয়।[১৫]

'পূর্ণ সুন্দর' পুরুষোত্তম মানুষেরই মনে। কিন্তু সেই সুন্দর মনের মানুষটির দেহটিও যদি সুন্দর হয়। দেহটির সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষা কি কেবল মহর্ষির সৌন্দর্যপ্রিয়তার সমর্থন? না। দেহ, মন-ময় মানুষের অন্তরেই অসীমের অস্তিত্ব-স্বীকার। পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের সংখ্যাতীত শব্দে ও সুরে, কথায় ও গানে কি এই বোধ, বিশ্বাসের সমর্থনই পাওয়া যায় নি? রুদ্রের কঠোর মুখ-দর্শন, মৃত্যুর অন্ধকার-জ্ঞান, বেদনার সৌন্দর্য-সম্ভোগ প্রভৃতিতে-সজ্জিত না হলে শিবের সৌন্দর্য, জন্মের আলোর রূপ, সুখের সন্তাপ, প্রভৃতি দক্ষিণাভরণ পাওয়া যায় না, এই সত্যের উপলব্ধি রবীন্দ্রচেতনার মূলতম বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসবোধ তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? সে কি কেবল উপনিষদ-চিন্তায়? না। পিতা-দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন, 'দুঃখরূপ তিক্ত পান না করিলে আত্মা অমৃতপানের উপযুক্ত হয় না'।[১৬]

যেমন ধর্মবিশ্বাসে তেমনি শিক্ষাচিন্তায়, রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি যে তিনি মানুষের অন্তরের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির, (ধর্ম তথা অধ্যাত্মবোধের ক্ষেত্রে সীমা ও অসীমের মিলন) প্রাচ্যের প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের নবীন ভাবধারার, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে ভোগ ও গ্রহণের সম্মিলন পছন্দ করতেন। পূর্ণতার এই দ্বৈতাদ্বৈত-বোধে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস-বোধের অন্যতম প্রেরণাস্থল তাঁর পিতার পত্রাবলী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। কারণ দেবেন্দ্রনাথও রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

তোমার ভ্রাতাদিগের কি প্রকার লেখা পড়া হইতেছে? বোধ হয় তোমারই বিদ্যালয়ে তাহারা ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রকার তুমি দেখিয়াছ যে, আমি কতক বালককে ব্রাহ্মধর্ম অধ্যাপনা করিতেছি, সেই প্রকার তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে পড়াইলে অনেক উপকার হয়। অপরা-বিদ্যার সহিত তাহারদিগকে পরাবিদ্যার উপদেশ দিতে অবহেলা করিবে না। বালককালই বিদ্যা শিখিবার মুখ্যকাল।[১৭]

—যন্ত্রবিদ্যা (অপরাবিদ্যা) ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান (পরাবিদ্যা)।

পত্রাবলীতে সঙ্কলিত হয় নি অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে এরূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মহর্ষির লিখিত কিছু পত্র আছে। কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-বিবাহকে

বিধিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বিধিমতে বাধা দিয়াছিলেন। আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রস্তাব হইলে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত আহ্বান করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মত জ্ঞাপন করিয়া সরকারকে এক পত্র লেখেন।[১৮] পত্রটির ভাষা ইংরেজী। প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৈশাখ, ১৮৭২ সংখ্যায়।'[১৯] আবার জীবনের প্রায় শেষভাগে কেশব সেনের সঙ্গে ধর্মবোধের বিরোধ, অনৈক্য নিয়ে রাজনারায়ণ বসুকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। এ পত্রটিও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।[২০]

দেবেন্দ্রনাথের পত্রগুলির ভাষা-সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য 'দেবেন্দ্র-রচনার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেবেন্দ্র-রচনার গদ্যসুষমা তাঁর পত্ররচনার মধ্যেও বহুল পরিমাণে আছে। শব্দ-সাযুজ্য ('অন্ধ অন্ধকার' 'রৌদ্রের কিরণ ভঙ্গ') চিত্রকল্প (৫০, ৯৭, ১৩৪ সংখ্যক পত্র), ভাষার বর্ণনামূলক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য তাঁর চিঠিপত্রগুলিতে ছড়িয়ে আছে। বাংলা পত্রসাহিত্য-ধারায় দেবেন্দ্র-পত্রসাহিত্য এই সকল বিবিধ কারণে স্বতন্ত্র মূল্যায়নের যোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের এই অবদান চিরস্মর্তব্য।

১। *A Treasury of the World's Great Letters*, arranged by M. Lincoln Schuster, New York, 1960.

২। Hudson, William Henry, *An Introduction to the Study of Literature*, London, 1910, 443.

৩। Middleton Murry, *The Problem of Style* London, 1922.

৪। "brief notes set down rather significantly than anxiously",—Bacon: Hudson, *Op. cit.* 446.

৫। *Ibid*, 447. "The central fact of this true essay indeed is the direct play of this author's mind and character upon this matter of this discourse".

৬। পত্রাবলী, ১৩৪ সংখ্যক পত্র ২০৬-২০৭। ('মসুরী পর্বত' থেকে ১ শ্রাবণ, '৫৪ ব্রাহ্ম সম্বৎসর তারিখে সৌদামিনি দেবীকে লেখা।

৭। পত্রাবলী, পূর্বে উল্লিখিত, ৫, ৬। (শিলাইদহ থেকে রাজনারায়ণ বসুকে ২৭ মাঘ, ১৮৫২ খৃঃ তারিখে লিখিত)।

৮। ছিন্নপত্রাবলী, ১৯৬০, ২।

৯। তদেব, ৩০৫।

১০। পত্রাবলী, ৬৪, ৬৫।

১১। পত্রাবলী ১৫-১৭।

১২। তদেব, ১৫১।

১৩। তদেব, ২৭।

১৪। বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'উপসংহার' পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

১৫। পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ৩, ১৮৫২, ৫।

১৬। পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ১৭, ১৮৫৮, ১৮।

১৭। পত্রাবলী, ২, ১৮৫১, ৩। 'পরাবিদ্যা', 'অপরাবিদ্যা'র কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,। দ্রঃ 'শিক্ষার মিলন', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন'।

১৮। সা. সা. চ. ৩ (৪৫), ১৯৪৬, ৭০-৭১।

১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৭২, ১৫-১৬।

২০। তদেব, ১৮০৩, ১১৮-১১৯।

দশম অধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ : আত্মজীবনী

বাংলাসাহিত্যে গদ্যে রচিত আত্মজীবনী তথা জীবনী রচনার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে সকল জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে তা মূলত পদ্যে এবং উপজীব্য ছিল চৈতন্যদেবের লৌকিক, অলৌকিক কর্মকাণ্ড। দৈবী অনুপ্রেরণায় আর ধর্মীয় সীমায় সঙ্কীর্ণ, সত্য ও কল্পনার বিচিত্র উপস্থাপনায় এই জীবনীগ্রন্থগুলিকে বস্তুমুখীন রচনা বলা চলে না। শ্রীচৈতন্যের জীবন নিয়ে রচিত বাংলাভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের[১] ঐতিহাসিক মর্যাদা অবশ্য আছে। কিন্তু মর্ত্যলোকবাসী পুরুষের যে জীবনকথা এই চরিতগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা মূলত ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ কোন দিকের ব্যাখ্যা। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিও তার দার্শনিক আলোচনায় এবং তর্কবিচারে বাঙালী মনীষার নিদর্শন। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে জীবনীসাহিত্যের বিচারে এটিকেও আমরা বস্তুমুখী এবং তথ্যনিষ্ঠ রচনা বলতে পারি না। বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার-কল্পে, বৈষ্ণবধর্মের গৌড়ীয় রূপকার শ্রীচৈতন্যজীবনে বৈষ্ণব ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে বিশ্বাস করতেন। ভক্তদের এই বিশ্বাসবোধেই গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের চরিতসাহিত্যের ধারা। অনিবার্যভাবে তাই, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যক্তির জীবনেতিহাস যতটা রক্ষিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী বর্ণিত হয়েছে একজন ধর্মবিশ্বাসী সাধুর জীবনের সম্পর্কে অলৌকিক দৈবী বিশ্বাস ও কিংবদন্তী। সাধারণ পাঠকের নিকট জীবনীসাহিত্যের কোন রস এসকল রচনায় নেই। প্রথমত বৈষ্ণবধর্ম, দ্বিতীয়ত চৈতন্যদেবের অলৌকিক বা দৈবী ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা সে ক্ষেত্রে একটা বাধা বলেই মনে হয়।

বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১)[২] , রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত। গ্রন্থ-দুটিতেই পরিশিষ্ট অংশে মূল চরিত্রের বংশপরিচয় ও বংশতালিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় আরো যে সকল চরিতগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে 'দানিয়েল চরিত্র'[৩] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্যালিলিও চরিত্র' এবং

যুধিষ্ঠির, প্লেটো, বিক্রমাদিত্য, এ্যালফ্রেড, প্রভৃতির জীবনী নিয়ে রচিত 'জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫১-'৫২) এবং বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' (১৮৪৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্ধশত বৎসর ব্যাপী (১৮০০-১৮৫০) বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই সকল রচনাগুলি কিন্তু জীবনীসাহিত্য নয়। জীবনী রচনার আদর্শ সম্পর্কে গোটে (১৭৪৯-১৮৩২) তাঁর আত্মজীবনীর[৪] ভূমিকায় লিখেছেন—

> For the main task of Biography seems to be this : to exhibit the man in relation to the circumstances of his time and to show how far everything has opposed or forwarded his progress, what kind of a view of the world and of mankind he has formed from them, and how he, if an artist, poet or writer may outwardly reflect them.

বলাবাহুল্য, অর্ধশত বৎসর ব্যাপী রচিত জীবনীসাহিত্যগুলিতে এই যুগ-পরিবেশের সঙ্গে আলোচিত পুরুষ, বা ব্যক্তির জীবনের সম্পর্ক এবং সেই পুরুষ, বা ব্যক্তির সমকালীন জগতের পরিচয় তাঁদের শিল্পীচেতনায় সম্যক প্রতিবিম্বিত হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শ কয়েকটি জীবনী অবলম্বনে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এই রচনাগুলি জীবনীসাহিত্যের রসাপেক্ষা চরিত্রগঠনের আদর্শ ও উপদেশে অনেকটা নীতিমূলক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যের সঙ্গে এই সমস্ত রচনার পার্থক্যও এখানে। আন্দ্রে মরিস যথার্থই বলেছেন—

> There was a time when 'lives' were written with a moral purpose to exemplify the rewards of virtue and the failures of wickedness Modern biographers think that the true story of man's life always contains a moral lesson, but that the reader should be left to discover it for himself.[৫]

এই ধারায় জীবনচরিত বিংশ শতকেও লেখা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রসংগ্রহ' (১৯৫০) এ সম্পর্কে উল্লেখ্য পুস্তক। বইটির ভূমিকায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় জীবনচরিতের মাধ্যমে চরিত্রগঠনপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

যাহাতে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র আমাদের বিদ্যালয়সমূহের উচ্চ

> শ্রেণীর ছাত্রদের সমক্ষে ধরিয়া দিতে পারা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি চরিত্র-চিত্রণাত্মক রচনা বাঙ্গালাভাষার আদর্শ হিসাবেও ছাত্রদের পড়ানো যায়, এই উভয় উদ্দেশ্য লইয়া 'চরিত্রসংগ্রহ' গ্রন্থখানির সঙ্কলন করিয়াছি।[৬]

কিন্তু মনে রাখা দরকার জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। আত্মজীবনী আত্মরচিত, কিন্তু জীবনী অন্য-চরিতকথা। লেখক যখন ভাষায় নিজ জীবনের কথা ব্যক্ত করেন তখন সৃষ্টি হয় আত্মজীবনীর। অপর পক্ষে, লেখক যখন অপরের জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তখন লিখিত হয় জীবনীগ্রন্থ। কাজেই জীবনী রচনার দায়িত্ব অপেক্ষা আত্মজীবনী রচনার দায়িত্ব কঠিন।[৭] জীবনীরচয়িতার স্বাধীনতা ও সুযোগ অনেক ; তিনি তাঁর উপজীব্যের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন। তাঁর নিজ জীবন তাঁর লেখার বিষয়বস্তু নয়, কাজেই দূর থেকে অন্যের জীবন তাঁর সামনে যেমন প্রতিভাত হয় তেমনই তিনি লিখেও যেতে পারেন। গ্রন্থকার এবং গ্রন্থনীয় বিষয়ের দূরত্ব এবং যদি লেখক ও রচনার বিষয়বস্তুর কালগত কোন ব্যবধান থাকে, তাহলে তার দুই দূরত্বই এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রচনার সুযোগ। কিন্তু আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে এই লেখক ও লেখার, গ্রন্থকার এবং গ্রন্থনীয় বিষয়ের কোন ব্যবধান থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী সেখানে এক। অথচ সার্থক আত্মজীবনী-সাহিত্য-সৃষ্টিতে এ ব্যবধান আবশ্যক। নতুবা নিরপেক্ষ রচনা হয় না এবং এই কারণেই আত্মজীবনী রচনা কঠিন। জীবনী রচনায় যে স্বাধীনতা, যে সুযোগ এখানে তা খুবই কম। জীবনীসাহিত্য-সৃষ্টিতে লেখক পরিমিতিবোধে বর্ণনীয় জীবনের ঘটনার গ্রহণ ও বর্জন করে পছন্দমত, প্রয়োজনমত কাহিনী সাজিয়ে তুলতে পারেন। বিষয় ও বিষয়ীর ব্যবধান থাকায় এই কাজ সহজে করা চলে। অন্যদিকে, যাঁর জীবন তিনিই তার লেখক হওয়ায় এই অভিপ্রেত ব্যবধানটির অভাবে আত্মজীবনী-লেখকের পক্ষে গ্রহণ ও বর্জনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পালন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীই তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। আবার পাঠকের নিকট লেখকজীবনের যে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, লেখকের নিকট সেটাই হয়তো অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা বলে গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। হয়তো তাই সংরক্ষণ-কলায় জীবনের বর্ণনা

দেওয়া জীবনীকারের পক্ষে যত সহজ আত্মজীবনীকারের পক্ষে তত কঠিন। হয় মায়া, নয় নির্মমতা সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আসে।

সম্ভবত এই সকল কারণেই বাংলাসাহিত্যে সার্থক আত্মজীবনী-রচয়িতার সংখ্যা এত কম। কালানুক্রমিক ইতিহাসানুসারে রাসসুন্দরী (১৮১০) -রচিত 'আত্মজীবনী' (১৮৫০) সম্ভবত প্রথম বাংলাগদ্যে রচিত আত্মচরিত-গ্রন্থ। রাসসুন্দরীর বইটি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> সরল সুন্দর এবং অনাড়ম্বর ভাষায় এই সহৃদয়া মহিলা বিশেষ অমায়িকতার সহিত নিজ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাসকল লিখিয়া, নিষ্কপটতা এবং বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে নিজ জীবনকথা-বিষয়ক এই রচনায় সত্যকার রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই রচনাকে যথার্থ সাহিত্য-পদে উন্নীত করিয়াছেন।[৮]

বাংলা গদ্যে আত্মজীবনী রচনার ধারায় নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৯১৪) ৫ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮), এবং কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭-১৯০৭) আত্মজীবনী 'রা স. র ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮)[৯] এবং আমাদের আলোচ্য দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আত্মজীবনীর স্বভাবানুযায়ী নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' সুখপাঠ্য এবং আদর্শ চরিতগ্রন্থ নয়। আত্মচরিতের স্বভাব নির্দেশ করে উইলিয়ম হেনরী হাডসন্ লিখেছেন—

> কোন লেখকবিশেষের রচনা পাঠান্তে অনেক সময়েই পাঠকচিত্তে ঐ বিশেষ লেখকের জীবনী জানবার এক অদম্য কৌতূহল জাগ্রত হয়, সে কৌতূহল লেখকের রচনার জগৎকে ছাড়িয়ে লেখকের ব্যক্তিজীবনে প্রসারিত হয়। জানতে চায় সে লেখককে, লেখকের জীবনকে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য, উত্থান আর পতনকে। জানতে চায় লেখকের দ্বন্দ্ব-মুখর জীবনের সন্ধিক্ষণগুলি, লেখকের অমর রচনাগুলির জন্মরহস্য।[১০]

হাডসনের এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমত আত্মজীবনী-লেখকের জীবন ও তাঁর কর্ম সমকালীন যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবে; দ্বিতীয়ত লেখার গুণে, বক্তব্য উপস্থাপনার কৌশলে পাঠক স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে গ্রন্থপাঠে উৎসাহী হবেন। ঐ রচনার মধ্যেই লেখকের মন ও জগতের

একটি বিস্তৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে। আত্মজীবনী এদিক থেকে কেবল লেখকের জীবনকাহিনীই নয়, সে জীবনের অন্তর-রহস্যও। তাতে জীবনীকারের ব্যক্তি-জীবনালেখ্য থাকবে, কিন্তু রচনাকারকে তা উপলব্ধি করতে হবে। অহং এবং অহঙ্কারের পার্থক্য নিয়েই সেক্ষেত্রে আত্মজীবনীকারকে অগ্রসর হতে হয়। অহংকে দেখার জন্য নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে আনতে হয়, নিজেকে নিজের জীবনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে দেখার মত। এই ব্যবধানের অভাবেই অহঙ্কার আসে, নিজের প্রতি অধিক ভালোবাসায় নিজের সব কিছুর প্রতি অধিক মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু আত্মজীবনীও সাহিত্য। সাহিত্যের আবেদন সর্বজনমনে। তার জন্য ঘটনার গ্রহণ, বর্জন ও বিন্যাস প্রয়োজন হয়, তাই জীবন ও জীবনীরও পার্থক্য আবশ্যক। আত্মজীবনী রচনার এই বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে একজন আত্মজীবনীলেখক বলেছেন—

> I recognize it of course, but not wholly; it seems almost that I was reading some familiar piece written by another, who was near to me and yet who was different.[১১]

তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন—

> It is mine and not wholly mine, as I am constituted today; it represents rather some past self of mine which has already joined that long succession of otherselves that existed for a while and faded away, leaving only a memory behind.[১২]

আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীকারের মধ্যেকার সম্পর্কটি হবে এই রকম। নিজের অথচ নিজের নয়, বিলীয়মান অথচ দেদীপ্যমান. তা একার একক অনুভূতি, কিন্তু একক জীবনসার নয়। তা সর্বজনমনের। গোধূলির গোলাপি আভার মত স্বপ্নসুন্দর, স্মৃতিময় অথচ সত্য, অথচ ক্ষণে ক্ষণের। লেখকসত্তা, আর জীবনীতে বর্ণিত জীবনসত্তা পরস্পরের নিকট-সম্পর্কিত, কিন্তু যেন দূরের। সবটুকু পরিচিতির অভাব যেন আছে—এই নিরাসক্ত মানসিকতার অপরিহার্যতা আত্মজীবনীরচনার ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। বলাবাহুল্য, উনবিংশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে, এই নিরাসক্ত মানসিকতার অপরিহার্যতায় খুব স্বল্প কয়েকখানি আত্মচরিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' এদিক থেকে একান্ত ব্যর্থ রচনা। যদিও আত্মজীবনী-

গ্রন্থ রচনার ধারায় 'আমার জীবন' সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। ৫ খণ্ডে সমাপ্ত, প্রায় ছ' বৎসর কাল ধরে লিখিত এই আত্মচরিত সম্পর্কে জনৈক গবেষক লিখেছেন—

> 'আমার জীবন'এ যদি ভাবাবেগোচ্ছল হৃদয়বান কবি নবীনচন্দ্রকে হাসি-অশ্রুর আলো অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতাম, তবে কত না আনন্দ হইত। কিন্তু সমগ্র কবি-জীবনের নেপথ্য-চিত্র না হইয়া উহার অধিকাংশই উচ্চ রাজপদে সমাসীন ডেপুটি নবীনচন্দ্রের রাজকর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিকের রোজনাম্চা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার জাতীয় কবির উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির চিত্র আত্মপ্রচার ও দম্ভ প্রকাশের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।[১৩]

আত্মঘোষণার কারণ আত্মজীবনীকে সর্বজনমনের আস্বাদনীয় করে তুলতে হলে যে বর্জনের প্রয়োজন হয় নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে' তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজের কাছে যে ঘটনা অতি প্রিয় মনে হয় অপরের কাছে তা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হতে পারে। অতএব সম্ভাব্য ঘটনা, যার সার্বজনীন আবেদন আছে তারই সাহিত্যিক উপস্থাপনা আত্মজীবনীর উৎকর্ষের কারণ। এই উৎকর্ষের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদরূপে আজও পরিগণিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী বা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' কেবল তাঁদের ব্যক্তিজীবনের আলেখ্যচিত্র নয়, ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশ ও জাতির নব জাগরণের ইতিহাসও। সে যুগের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিজীবন যেভাবে সম্পৃক্ত ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের জাতীয় সভ্যতার জাগ্রত ইতিহাসরূপে গ্রন্থ-দুখানির যে সার্বজনীন আবেদন রয়েছে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আত্মজীবনী, তথা জীবনীগ্রন্থ-রচনা সম্পর্কে এই যুগবৈশিষ্ট্য, লেখকের জীবনের বহির্ঘটনাবলী, তা লেখকের মনোজীবনের পর্যালোচনার তুলনায় যতই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর, অতিরিক্ত বলে পাঠক মনে করুন না কেন, সমালোচকের দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, আত্মজীবনীকার বা জীবনীগ্রন্থের বর্ণনীয় ব্যক্তির সাহিত্যিক মানসিকতার পক্ষে তা হয়তো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। প্রকৃত-

পক্ষে যে ব্যক্তির জীবনকথা আত্মজীবনী বা জীবনীর আকারে বর্ণিত হয় তার, সমকালীন যুগপরিবেশটিও সেই ব্যক্তির জীবনেরই অঙ্গ, তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সকল উত্থানপতনের ইতিহাসের মধ্যেই তাঁর জীবন বিকশিত। অতএব এসকল ঘটনা গ্রহণ, আত্মজীবনীকার তথা জীবনীকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনও।[১৩] তার জন্য দরকার হলে নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা, যার কোন রকম সার্বজনীন আবেদন থাকতে পারে না, (যেমন, নবীনচন্দ্র সেনের ডেপুটি-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা) তা বর্জন করাও প্রয়োজন।[১৪] রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯), এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮) এদিক থেকে সাহিত্যসম্পূর্ণ আত্মচরিত গ্রন্থ।

২

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) বাংলা আত্মচরিতের ইতিহাসে এক অনুপম সংযোজন। তা একাধারে তাঁর সাধকজীবনের কথা ও সাহিত্য-সুষমার আকর। এ গ্রন্থ মহর্ষির আত্মার উন্মীলনের লিপি-আলেখ্য। যে যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়েছিল তাঁর সাধনার জীবন, সে যুগের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাজনীতিরও যেমন সরস বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তেমনি এই সভ্যতার উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মাস্বাদনেরও যে আনন্দানুভূতি, তার পূর্ণ পরিচিতিও তুলে ধরেছেন এবং এই আত্মকথন আত্মদম্ভের প্রকাশ নয়। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যেকার অপরিহার্য নিরাসক্তি অত্যন্ত সহজ ভাবে পালন করেছেন তিনি। গ্যেটের জীবনীগ্রন্থ সম্পর্কে যে উক্তি তারই বাস্তব মূল্যায়ন যেন লক্ষিত হয় দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে। গ্যেটে বলেছিলেন—

> Biography should be given a rank far above history, since it delineates the living individual as well as his century and the vital impact of the one upon the other.[১৫]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'তে মহর্ষির ব্যক্তিসত্তার প্রকাশও যেমন উজ্জ্বল, তেমনি তাঁর সমকালীন যুগের, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের নবজাগরণমুখর বাংলা, তথা অখণ্ড ভারতবর্ষের ধর্ম, শিক্ষা, ও সংস্কৃতির একটি পরিচিতিও সুস্পষ্ট। একদিকে যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে আত্মমগ্ন হয়ে মহর্ষি অনন্ত

আকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্রের আলোকে জীবনের রহস্যসন্ধানে সাধনামুগ্ধ হয়ে উঠেছেন,[১৬] তেমনি অপরদিকে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাভাষার মাধ্যমে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন।[১৭] একদিকে যেমন বেদ, উপনিষদ চর্চা করেছেন, তেমনি সারা ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও ব্রহ্মবাদী মনে পুতুল পূজার বিরোধিতা করেছেন; যেমন স্রষ্টার প্রতি নিবিড় বিশ্বাসে পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে হিমালয় পর্যন্ত সর্বত্র করুণাময় ব্রহ্মেরই লীলারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন আর ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে তাঁর সেই উপলব্ধির বাণী প্রচারিত করেছেন, তেমনি খৃষ্টানধর্ম প্রচারের হাত থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষার জন্যও এগিয়ে এসেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথের সার্থক স্বপ্ন।[১৮] এ ছাড়া 'দেশহিতার্থী সভা'র (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫১) সম্পাদকরূপে, 'ভারতবর্ষীয় সভা'র (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১) অবৈতনিক সম্পাদকরূপে, কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্তৃক স্থাপিত 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র (১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৪) সভাপতিরূপে এবং দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতকের গঠনোন্মুখ সভ্যতা ও সংস্কৃতির একজন কর্মীপুরুষ রূপে যে পরিচিত, তারও নির্ভরযোগ্য সমর্থন তাঁর 'আত্মজীবনী'। আবার তাঁর আত্মজীবনী যে তাঁরই আত্মার পরিচিতি তারও প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন। দেশী ধর্মীয় শাস্ত্রাদি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদিরও প্রভূত চর্চা[১৯] করে নিজের অধ্যাত্মচিন্তার একটি স্বতন্ত্র রূপও দিয়েছিলেন, 'আত্মজীবনী' তাঁর এই অধ্যাত্মসাধনারই বাণীরূপ। হাফিজের দর্শনে সেখানে তাঁর ধর্মালোকিত চিত্তেরও যেমন অনাবরণ প্রকাশ, তেমনি ঊনবিংশ শতকের আন্দোলন-মুখরিত নববঙ্গের পরিচয়ও সেখানে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু এই দ্বৈতরূপে চিহ্নিত মহর্ষির জীবনালেখ্যটি থেকে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের গূঢ় রহস্যটিকেও আলোকোজ্জ্বল দেখা যায়।

কেবল ব্যক্তি, আর দেশকাল নিয়েই জীবনী বা আত্মজীবনী সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর-রহস্যটিও পরিস্ফুট করা দরকার। গ্রীক মনীষী, তথা পৃথিবীর প্রথম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার প্লুটার্ক এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আলেকজাণ্ডারে জীবনীর ভূমিকায় বলেছিলেন যে—

As portraits are more exact in the lines and features of the

face, in which the character is seen, than in the other parts of the body, so I must be allowed to give my more particular attention to the marks and indications of the soul of man.

একই উপলব্ধি মহর্ষির পুত্রেরও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।[২০]

প্লুটার্ক বলেছেন—

My design is not to write histories but lives.

৩

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী তাঁর ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা তাঁর মর্মলোকের বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত বেশী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মহর্ষির মরমী মনের ধারণায়, ঈশ্বর-উপলব্ধির নিবিড়তায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে বিশ্বাসী মনে আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁর অন্তরোৎসারিত ধ্যানধারণার যে কথা ব্যক্ত হয়েছে তা তাঁরই ব্যক্তিচিন্তার, ভাবনার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অন্তরঙ্গ প্রকাশ-ভঙ্গিমায় সে চিন্তা-ভাবনার কথা আর কেবল মহর্ষির হয়ে না থেকে তা সার্বজনীন চিত্তে, মনেও একটি আবেদন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে তার কারণ, মহর্ষির এ সমস্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে মহর্ষি তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে অযথা একীভূত করে না ফেলে, তাকে নিরাসক্ত ধ্যানমগ্ন ঋষির মত প্রয়োজনীয় দূরত্বে রেখে তৃতীয় সত্তার মত তার আস্বাদন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাই দৃষ্টির অবকাশে এ বসুন্ধরাকে ভালবেসেছেন, তার কোলের মানুষ, প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন, তাই বাংলা থেকে বিহার, বিহার থেকে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে সিমলা কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ-সন্ধানের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছেন। সে পথপরিক্রমায় কখনো প্রচণ্ড শীতের ভোরে বরফজলে অবগাহন করেছেন, কখনো সূর্যোদয়ের অরুণাভায় ব্রহ্মশ্লোক আবৃত্তি করেছেন। কখনো হাফিজের কবিতাচরণের দার্শনিক আবেদনে বিমুগ্ধ হয়েছেন, কখনো বেদ কখনো বেদান্তের চর্চায় নিযুক্ত থেকেছেন। সে পথ-পরিক্রমায় কখনো প্রিয়জনের বিয়োগব্যথার সংবাদ এসেছে, কখনো নিজের

উপলব্ধির রঙে রঙীন ধর্মের সংসারে বিশ্বাসের বিপ্লব এসেছে। কিন্তু তাঁর সাধনার পথ-চলার আনন্দ তাতে ব্যাহত হয় নি। ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তির অপার মহিমায় মন মগ্ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইভ্‌লিন্ আণ্ডারহিল অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেছেন, তিনি লিখেছেন—

> To certain types of mind the spiritual adventures of man will seem always the most absorbing of all studies; the most real amongst the confusing facts of life. These will, when they are offered the history of personality, ignore much that the practical man might consider essential, that they may seek at once for those secret guiding lines, the laws of that interior growth, which condition the relation of the self to the world of eternal things.
>
> In the life of Maharshi Debendranath Tagore such readers will find a new document of absorbing interest.[২১]

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মহর্ষির মরমী মনের ধ্যানধারণায়-ভরা তাঁর আত্মচরিত সাধকের বিবেকবাণীর মত। কিন্তু এ কথাও ঠিক, যা নিয়ে তাঁর মরমী চিন্তার প্রকাশ সেই জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানুষ, তারও প্রতি মহর্ষির প্রসন্ন দৃষ্টির অভাব ছিল না। যেমন বিশ্বাস করেছিলেন—

> যখন তাঁহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি, তখন বলি, 'তুমি অন্তরতর অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা'। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি, 'তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে'। যখন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি, তাঁহার স্বীয় ধামে সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি, 'তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং। তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছ।[২২]

তেমনি ভালবেসেছিলেন প্রকৃতিকে। প্রমাণ—'আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুলসকল

শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত-কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মসনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত।[২৩]

প্রকৃতি-প্রীতি জগতের শ্রেষ্ঠ, প্রায় সকল লেখকদেরই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। বাংলাসাহিত্যের সূচনা থেকে অদ্যাবধি গদ্যে, কাব্যে তার সংখ্যাতীত উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রকৃতি-চিত্রণের আন্তরিকতায় সম্পূর্ণ যে সকল লেখক খ্যাত, তাঁদের অধিকাংশই রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের লেখক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রকৃতির যে বিশাল বৈচিত্র্য, অপার রহস্যমাধুরীর সৃষ্টি করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে অনুপম। একজন রবীন্দ্র-সমালোচকের একটি উক্তিকে এই অনুপম সৃষ্টি-সৌন্দর্যের একটি কারণ-রূপে সম্ভবত গ্রহণ করা যায়। তিনি লিখেছেন—

> "No poet that ever lived (I shall use this phrase again) has had a more constant and intimate touch with natural beauty", than Rabindranath.[২৪]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি বলেই তাঁর গদ্যতেও কবিতাসঙ্গ-রূপে প্রাকৃতিক বর্ণনার সমারোহ থাকবে, এরূপ সাধারণ ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা গদ্যে যে স্বল্প প্রাকৃতিক বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অক্ষয়কুমার (১৮২০) ও বিদ্যাসাগরের রচনার কথা বাদ দিলে, আরও একজনের রচনার প্রাকৃতিক বর্ণনা ও তার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের অন্তর-দৃষ্টি চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি দেবেন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগ দু'প্রকারে হয়ে থাকে। হয় কেবল প্রকৃতির রূপোল্লাসের মধ্যে, নতুবা প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের আন্তর সৌন্দর্যসম্ভোগে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার সম্ভোগ, তার আনন্দ হৃদয়-ভরা। বর্ণবহুল, রূপোজ্জ্বল চিত্রের সন্দর্শনে নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়—

> ......, not as in the hour of thoughtless youth ; but hearing of ten times the still, sad music of humanity.[২৫]

প্রকৃতিকে তন্ময়চিত্তে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা, তথা স্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকৃতির রহস্য অনুভব করার যে সাহিত্যিকসৌকর্য রবীন্দ্রসাহিত্যের

অন্যতম একটি বড় দিক বলে বিবেচিত হয়। বলাবাহুল্য, তার প্রথম দর্শন মেলে কবির পিতার রচনায় মহর্ষির 'আত্মজীবনী'তে। 'আত্মজীবনী'র বহু জায়গায় মহর্ষির প্রকৃতিবিমুগ্ধ মানবজীবন দর্শন, তথা স্রষ্টার সৌন্দর্যসৃষ্টি অবলোকনের আত্মপ্রসন্নতা পরিস্ফুট। যেমন, মানুষের নিত্য দিনের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রার পটভূমিতে প্রকৃতির বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্ভোগ করেছেন—

> এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। কোন পর্ব্বতে আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ-বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে দীপ্তি পাইতেছে।[২৬]

মানবসংসার আর বিস্তৃত প্রকৃতির আরও নিবিড়, আরও পাশাপাশি অবস্থিতির বর্ণনা—

> খাদের নীচে যাইতে যাইতে দেখি যে, মধ্যে মধ্যে সেখানে লোকের বসতি, মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র। কোনখানে গোরু-মহিষ চরিতেছে, কোন-খানে পার্ব্বতীয় মহিলারা ধান ঝাড়িতেছে। আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।[২৭]

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও এই প্রকৃতি ও মানুষের মাখামাখি বর্ণনা লক্ষিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের পরিণত কালে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার বলে তার প্রকাশরূপ শুধু উজ্জ্বলতর। নতুবা পিতার প্রকৃতিচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব পুত্রের রচনায় দুর্নিরীক্ষ্য বস্তু নয়। যেমন—

> দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী, তাঁহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর, আরো দূরে দেখা যাইত তরু-চূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্ব-দিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে।[২৮]

একটি দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক বর্ণনায় মহর্ষির লিপিনৈপুণ্য, সাহিত্যিক সৌন্দর্য-সৃষ্টির যে নজীর স্থাপন করেছে তা পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক বর্ণনার

যে সকল পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে তুলনীয়। সম্ভবত এরূপ বর্ণনা পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শস্থলও।[২৯] বর্ণনাটি হল—

> …এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, 'চল, আমরা পিনিসে যাই, ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়।'
>
> মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি, এবং দুই জন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে।……এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙিয়া ফেলিল।…… পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল, এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল, যে দুইজন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে, তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল, সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙুল মাত্র জল হইতে ছাড়া।……আমি আর রাজনারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। আবার একটা ভারি দমকা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, 'আবার তাইরে, তাই!' বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল।……কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল, 'থামা থামা'। তখন সূর্য্য অস্ত গেল ; মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল ; পিনিস থামিল কিনা, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছিনা।[৩০]

সমাসোক্তি অলঙ্কারের আশ্রয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভোগের নিদর্শনও মহর্ষির 'আত্মজীবনী'তে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

> আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই।

আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম।[৩১]

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই সমাসোক্তির আশ্রয়ে মহর্ষির যে সৌন্দর্যসম্ভোগ তা কেবল তার রূপতৃষ্ণা নয়, অন্তরেরও পিপাসা। তাঁর 'চক্ষু'ও যেমন খুলেছে, 'হৃদয়'ও তেমনি বিকশিত হয়েছে। নয়ন ভরে এ শোভা দর্শনও করেছেন, চিত্ত জুড়ে এ শোভার আস্বাদনও করেছেন। এ রূপ আর অরূপের, দ্বৈতাদ্বৈত চেতনার আনন্দময় অভিব্যক্তির মত। প্রকৃতিচেতনায় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রবাদ একটি বিশেষ আস্বাদনের বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ-ময় প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগে ইন্দ্রিয়চেতনার স্থান সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নয়। রোমান্টিক যুগের ইংরেজী সাহিত্যের সুতীব্র রোমান্টিক মানসিকতার ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র কবি ছিলেন কীট্স। কীট্সের 'সেন্স্যুয়াস্নেসের' চিহ্ন তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রেও সমভাবে ছিল বিদ্যমান। তাঁর 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল' কবিতাটির সেই বিখ্যাতচরণ-ক'টি এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে। যেখানে তিনি অসংখ্য সুন্দর ফুলের স্বভাব ও বর্ণ-বিষয়ে লিখেছেন—

I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness, guess each sweet
Where with the seasonable month endows
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild ;
White hawthorn, and the pastoral eglantine ;
Fast-fading violets cover'd up in leaves ;
And mid-May's eldest child
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies of summer eves.

দেবেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন না, সাধক ছিলেন। গদ্য-রচনা তাঁর সেই ব্রহ্ম-সাধনারই ভাষাচিহ্ন। অথচ 'আত্মজীবনী'র যত্র তত্র এই তীব্র ইন্দ্রিয়পর-তন্ত্রতাপুষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভোগের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। আমরা

সেই সংখ্যাতীত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে দু-একটি উদাহরণ নিলেই বিষয়টির মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবো। যথা—

> ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বারা উদ্ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস।

'আম্র-মুকুলের গন্ধ', 'লেবু ফুলের গন্ধ' 'কোমল সুগন্ধের হিল্লোল', 'করুণাময়ের নিশ্বাস' প্রভৃতি শব্দ ক'টির ব্যবহারে বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও যেমন প্রত্যক্ষবৎ আঘ্রাণীয় করে তুলেছেন, তেমনি মহর্ষি তাঁর মরমী হৃদয়ে করুণাময় ঈশ্বরের সৃজনশক্তির অপার মহিমার যে উপলব্ধি করেছেন, তারও প্রকাশ-রূপটি 'করুণাময়েরই নিশ্বাস' শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে স্পর্শবৎ প্রত্যক্ষযোগ্য করে তুলেছেন। আরও কিছু বর্ণনাংশ, বা খণ্ড প্রকৃতি-চিত্রণ এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে। যেমন, 'রাত্রিতে আমি আমার শয়নঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম, রাত্রির সেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল লাগিত।' বা 'বরফে শীতল বায়ুর নিশ্বাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম।' বা 'বোয়ালি পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্যপাত্রের ন্যায় সূর্য্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে।' আবার—

> এখানে তিন শত হস্ত উর্দ্ধ হইতে জলধারা পড়িতেছে, এবং প্রস্তরের উপরে প্রতিঘাত পাওয়া রাশি রাশি ফেনা উদ্গীরণ করিতেছে, এবং বেগে স্রোত নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি একখানা শিলাতলে বসিয়া এই জলক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। যেমন এই জল-প্রপাতের অতি শীতল কণাসকল খদে (ভু) নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্ম্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল। আমি ধীরে ধীরে সেই শিলাতলে অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম।[৩২]

স্রষ্টা, ও সৃষ্টির সম্পর্কে প্রকৃতির সৌন্দর্যরহস্য-বিশ্লেষণ যে মহর্ষির প্রকৃতি-চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারও পরিচয় 'আত্মজীবনী'তে লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি বিশ্বাস করতেন, তাঁর প্রাণের ঠাকুর, জগৎস্রষ্টা এ পৃথিবীর সর্বত্র

বিরাজমান। বহিঃপ্রকৃতির সব কিছুতে তাঁর কল্যাণরূপ বিস্তারিত। তিনি লিখেছেন তাই—

তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ, তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ। হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র 'প্রকাশ' করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ।[৩৩]

এই বিশ্বাসেই মহর্ষি লিখেছেন—

তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিন রাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম।[৩৪]

অথবা—

বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীতকালে বহু তুষার-ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চয্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য।[৩৫]

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগ মহর্ষির পুত্রের রচনাতেও লক্ষিত হয়। গদ্যে ও কাব্যে তার বহু নিদর্শন মেলে। আমরা একটি মাত্র উদাহরণ নিয়ে তাঁর এই বিশেষ রীতির প্রকৃতিচেতনার পরিচয় নিতে পারি। যথা—

মৌনী তুমি, মুগ্ধ তুমি, স্তব্ধ তুমি, চক্ষু ছলোছলো,—
কথা কও, বলো কিছু বলো,—[৩৬]

'মৌনী', 'মুগ্ধ' প্রকৃতি (উষা)কে চক্ষুভরা জলে কিছু কইতে, কবির এত অনুনয় কেন? কারণ—

হে উষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন্ মহা-অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর।

তোমারে দিয়েছে বর
তোমার অজ্ঞাতে
সুপ্তি ঢাকা রাতে,
তব শুভ্র আলোকেরে করিয়া স্মরণ
আগে হতে করেছে বরণ।[৩৭]

স্রষ্টার সৃষ্টিতে অপার কৌতূহল। সৃষ্টির মুখ দিয়ে (উষার) কবি, প্রভুর বিচিত্র সুন্দর সৃজনক্ষমতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছেন। নবীন উষার প্রসন্নোজ্জ্বল মুখচ্ছবিও তাঁর সৃষ্টি, আবার সেই সৃষ্ট সৌন্দর্যের সীমা বিস্তৃততর করে তুলতে ভোরের আলোর পূর্বে ফুল ফোটানোর মেলাও তাঁরই সৃষ্টি। কবির অন্তর চাইছে এ-সত্য নির্বাক্ প্রকৃতিও বুঝুক। অপার সৃষ্টিরহস্যের প্রতিষ্ঠা আসুক, বন-প্রকৃতির মরমেও। রবীন্দ্রনাথের এই স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতিচেতনার এই যে স্বরূপ, এ তাঁর নিজেরই উপলব্ধি, সন্দেহ নেই। তবুও প্রাগ্‌রচনার কোনও রকম মিল যদি তাঁর এই মানসিকতায় লক্ষিত হয়, তা নিঃসন্দেহে দেবেন্দ্রনাথের দান। 'আত্মজীবনী'র মূল্য এদিক থেকে অবশ্যই স্বীকার্য।

প্রকৃতপক্ষে 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটির সাহিত্যিক সুষমার অন্যতম বড় কারণই হল মহর্ষির প্রকৃতিচেতনা। 'আত্মজীবনী'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রায় ছড়িয়ে আছে এই বিচিত্র প্রকৃতিচেতনার স্বর্ণশস্য। বৃষ্টির গুড়ির মতন, ফুলের পাপড়ির মতন, সবুজ ঘাসের মতন তা বিস্তৃত, সুন্দর অসংখ্য টুক্‌রো টুক্‌রো চরণাংশে, শব্দে, শব্দগুচ্ছে। যেমন, 'ছাদের উপরে রৌদ্রেতে', 'রাত্রেতে', 'দমকা ঝড়', 'আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে', 'পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে', 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল', 'মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম,' 'সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ', 'সেই বাষ্পসমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে।', 'সে সমুদায় ভূমি শ্বেতপ্রস্তরের, একটি তৃণ নাই, না ফুল আছে, না ফল আছে, কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।', 'দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার আলোক।', 'লেবু ফুলের গন্ধ', 'কোমল সুগন্ধ', 'নীলোজ্জ্বল সমুদ্র,' 'ঘোর অন্ধকার,' 'শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষা,' 'শরৎকালের বিকাশ', 'মধুমাস বসন্ত', 'জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপ', 'স্ট্রবেরি ফলসকল খণ্ড

খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায়', 'শিশিরসিক্ত লতা,' 'শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছ', 'ঘনপল্লবাবৃত বৃক্ষ' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশও যেমন, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রহস্য-উদ্ঘাটক শব্দের ব্যবহারও 'আত্মজীবনী'তে মহর্ষির প্রকৃতিপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন, শ্বেত, গোলাপি, নীল, পীত, হলুদ, রক্তবর্ণ, সূর্যরশ্মি, পূর্ণ চন্দ্র, গঙ্গা, নদী, সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, নক্ষত্রখচিত আকাশ, মেঘ, ছায়া, সিন্ধু, সজল, তৃণশূন্য প্রভৃতি।

৪

'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্রনাথের আত্মার পরিচিতি, ঠিকই। কিন্তু সাহিত্য-গ্রন্থ হিসাবে 'আত্মজীবনী'র মূল্য চিরন্তন। এ গ্রন্থে তাঁর মরমী মনের ঈশ্বর-চিন্তা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রকৃতিচেতনারও যেমন প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি গ্রন্থটিকে সার্বজনীন চিত্তের আনন্দরূপে পাঠক্ষম করে তুলতে সাহায্য করেছে মহর্ষির ভাবপ্রকাশের রীতিতে নাট্যরসের সঞ্চার। অপ্রত্যাশিত ঘটনার চকিত চমকে নাটকের নাটকীয়তা-সৃষ্টি পাঠক ও দর্শকের, তথা শ্রোতা ও সমালোচকের কৌতূহল ও বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে। 'আত্মজীবনী'র বর্ণনাভঙ্গীতে এইরূপ চকিত চমক মাঝে মাঝে লক্ষিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ—

১. ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল—'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপরে একেবারে বিরাগ জন্মিল।

— আত্মজীবনী, ৩-৪।

২. সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

— তদেব, ৭।

নাটকের প্রাণ দ্বন্দ্ব। অন্তর-জিজ্ঞাসার অনিরুদ্ধতায় এবং বাইরের ঘটনা-

বলীতে অন্তরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। দ্বন্দ্ব বিপরীত বিষয়ে, বিপরীত বস্তুতে বা ঘটনায় আপোষবিহীন মনোবিক্ষোভ সৃষ্টি করে। মনোবিক্ষোভই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব অন্তরে খুব বেশী হলে দ্বন্দ্বিত ব্যক্তির আচরণেও কখনো কখনো প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাব। তখন অবশ্য সেটা বহির্দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। আচরণে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। 'আত্মজীবনী'র প্রধান চরিত্র বহু স্থলেই দ্বন্দ্বমুখর। যেমন, ১৮৫৬ সালের ঘটনাবলীতে মহর্ষির অন্তর্বেদনা। ভাষায়—

> এতদিনে, এই দশ বৎসরে, আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার, আমাকে জড়াইতে লাগিল।

এই 'নূতন বিপদভার, ঋণভার'-এর কারণ গিরীন্দ্রনাথ 'নিজ খরচের জন্য অনেক ঋণ' করেছিলেন, এবং—

> এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়—এমন কি, ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর-এক জনকে আনুকূল্য করিতেন।
>
> — আত্মজীবনী, ১৬০।

এবং এই উদ্দেশ্যে নগেন্দ্রনাথ একবার দশ হাজার টাকার এক ঋণপত্রে মহর্ষির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে এলে মহর্ষি বলেছিলেন, 'জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না।' ফলে অভিমান করে নগেন্দ্র মহর্ষির গৃহত্যাগ করে ছোটকাকা রমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে চলে যান। বাইরের এই ঘটনায় মহর্ষির অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।—

"এই সকল ঘটনায় আমার মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল।" ভগ্নমন মহর্ষির মনে ভ্রাতৃস্নেহ, এবং কর্তব্যবোধের টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। একদিকে স্নেহের ভাইকে অর্থ সাহায্য করিতে না পারার বেদনা, অন্যদিকে ঋণভারের পাষাণ। নূতন ঋণ গ্রহণ না করা কর্তব্য, কিন্তু তাতে ভ্রাতৃবিরোধ অনিবার্য। মহর্ষির হৃদয় চায় ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, কিন্তু বাস্তব ঘটনা তাঁকে কর্তব্যে কঠোর করে। এই মনোযন্ত্রণার উপর নূতন আঘাত এল মহর্ষির প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে। ধর্মের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অন্যতম পুরোধা অক্ষয়কুমারের কাছ থেকে।—

'ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত।

—আত্মজীবনী, ১৭৮

দেবেন্দ্রনাথের সকল কর্মের বিশ্বস্ত, দক্ষ সহকর্মী ছিলেন অক্ষয়কুমার। অথচ ধর্মবোধে উভয়ের মানসিকতার পার্থক্য ছিল বহু। আচরণে তা যখন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, মহর্ষি অন্তরে আঘাত পেলেন। একদিকে প্রগাঢ় বন্ধুবিশ্বাস, অন্যদিকে নিজের ধর্মবিশ্বাস। দুয়ের আপোষ, সামঞ্জস্য তিনি খুঁজে পেলেন না। বিরোধে অন্তরে বিক্ষোভ এল। দ্বন্দ্বে চিত্ত বিদীর্ণ হল। অস্থির চাঞ্চল্যে 'বিষাদ' ও ঔদাস্য এল তাঁর। অন্তরে শান্তি পাবার জন্য 'আত্মার মূলতত্ত্ব' জানতে অনুসন্ধিৎসু হলেন। মহর্ষির ভাষায় সে দ্বন্দ্বের রূপ—

এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না।[৩৮]

সংলাপ নাটকের প্রধান এবং কাহিনী-নির্মাণের অন্যতম উপকরণ। 'আত্ম-জীবনী'তে অনেক সময়েই এই সংলাপ ব্যবহারের রীতি রক্ষিত হয়েছে। যেমন—

আমি বলিলাম, 'কোথা হইতে তুমি এখানে ?' সে বলিল, 'আমি একটা বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি'।...জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত বৎসরের বিপদ ?' সে বলিল, 'সাত বৎসরের।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি করিয়াছিলে ?' সে বলিল, 'আর কিছু নয়, একটা কোম্পানীর কাগজ জাল করিয়াছিলাম।[৩৯]

এই সংলাপ কখনও কখনও স্বগতোক্তির রীতিতেও প্রকাশিত। যেমন মহর্ষি নিজের উপলব্ধির কথা ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলছেন। অবশ্য নিজের মনের কথা অর্থে, সমস্ত 'আত্মজীবনী'ই স্বগতোক্তি-কথন। কিন্তু কথন আর লিখন এক নয়। লেখাতে সংলাপ অবশ্য প্রয়োজন নয়, স্বগতোক্তিতে প্রয়োজন। এখানে স্বগতোক্তির রীতি লক্ষিত হয়। যেমন—

তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি

বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ, তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ।[৪০]

নাট্যকার বক্তব্য বিষয়কে চরিত্রের সংলাপ ও আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে সোজাসুজি উপস্থিত করেন। কিন্তু নাটকের রসবস্তু, মর্মকথা সর্বদা এই সংলাপের মাধ্যমে পূর্ণরূপে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিক যেমন নিজের বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসাটি পর্যন্ত তুলে দেবার সুযোগ পান, নাট্যকার তা পান না। অতএব স্বগতোক্তির মাধ্যমে সেই না বলা কথার গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করতে নাট্যকাররা প্রায়শই প্রয়াস পেয়ে থাকেন।[৪১] 'আত্মজীবনী'রও সব কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে উত্তম পুরুষ, ও মধ্যম পুরুষের এক বচনে মহর্ষি স্বগতোক্তির রীতি গ্রহণ করেছেন দেখা যায়।

নাট্যসাহিত্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তার গতি বা 'এ্যাক্শন'। ঘটনাস্রোত চরিত্রগুলির আচরণ আর কথন সম্বল করে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। সে চলার পথে কৌতূহল, আশঙ্কা, প্রত্যাশা, অপ্রত্যাশা, ভাগ্য-লিখন প্রভৃতি নাট্যবৈশিষ্ট্যের মুহুর্মুহু আবির্ভাব সত্ত্বেও সামগ্রিক নাট্যগতি পরিণতির দিকে এগিয়েই চলে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—

'রাজসিংহ' প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।[৪২]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রযোজ্য। সমস্ত গ্রন্থটিতে একটি তীব্র নাট্যগতি আছে, যার আকর্ষণে পাঠক রুদ্ধনিশ্বাসে অতি অনায়াসে পাঠ করে যায় গ্রন্থটি। কোন অংশই অতি-কথনে বা স্বল্প-কথনে শিথিল-পাঠ্য হয়ে ওঠেনি।

৫

বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' দোসরবিহীন গ্রন্থ। ভ্রমণ-সাহিত্যের সরসতায়, গল্পরসের নিবিড়তায়, নাটকীয় উপাদানে এ গ্রন্থ তাঁর

মরমী প্রাণের কথা। দরদে ও তথ্যে, মননে ও ঘটনার বিবৃতিতে উনবিংশ শতকের সুললিত গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভ্রমণ যে কেবল দেশ-দর্শনের আনন্দ নয়, আত্মার উন্নতিবিধানে চরিত্রসংগঠনে বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাও দেয়, তার প্রমাণ 'আত্মজীবনী' গ্রন্থখানি। তাঁর ভ্রমণের সংকল্পই ছিল আত্মার উন্নতিতে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করার জন্য।—

> সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না ; জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব ; বিদেশে, বিপদে, সংকটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।[৪৩]

১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের প্রথম প্রয়াস। পরে ১৮৪৭-এ কাশী ভ্রমণ (বেদচর্চার জন্য), বিন্ধ্যাচল মির্জাপুর কুমারখালি ভ্রমণ, মেমরি গমন, ১৮৪৮-এ নৌকায় দামোদর নদ ও বর্ধমান ভ্রমণ, এবং স্রষ্টার সৃষ্টিতে বিমুগ্ধ মনে বর্ধমানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ধর্মালোচনা, পরে ১৮৫১-এ কটক পাণ্ডুয়া পুরী ভ্রমণ, ১৮৫৯-এ আসাম ভ্রমণ, ('পূজা এড়াইবার জন্য' আশ্বিন মাসে), ১৮৫৪'র আশ্বিন-অগ্রহায়ণ-এ দিল্লী এলাহাবাদ, ১৮৫৫-এ (আশ্বিন) ঢাকার পথে সুন্দরবন হয়ে ফিরে আসা, ১৮৫৬-এ নৌকায় কাশী, ও কাশী থেকে এলাহাবাদ আগ্রা দিল্লী মথুরা লাহোর অমৃতসর (১৮৫৭), ১৮৫৭-এ কালকা সিমলা সুব্ধু, ১৮৫৮-এ ভজ্জী ভ্রমণ প্রভৃতি একাদিক্রমে দশ-এগার বৎসর নিয়মিত ভ্রমণের কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই দীর্ঘদিনের ভ্রমণ-অভ্যাস মহর্ষির ভ্রমণের নেশার জন্য যতটা সফল হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনার চিন্তার মুক্তি ঘটেছিল এই ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক ভ্রমণের মধ্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মহর্ষির প্রায় সমস্ত ভ্রমণ-সূচীর যাত্রারম্ভের কাল আশ্বিন মাস, যখন বাঙ্‌লা দেশ-ভরা দুর্গাপূজার ব্যাপক আয়োজন থাকে চলতে। বিশেষ কোন সীমিত মূর্তির মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যান করা মহর্ষির ধর্মচিন্তার বহির্ভূত ছিল। প্রতিমা-পূজাকে তিনি শ্রদ্ধা দিয়ে গ্রহণ করতে পারতেন না। সম্ভবত এইজন্য তিনি পূজার সময় বাঙলা দেশের বাইরে যেতে চাইতেন।

তা ছাড়া, সমগ্র ভ্রমণের তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা প্রধানত তাঁরই মরমী মনের অধ্যাত্মবোধের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভোগ যখন করেছেন তখনও যেমন তা ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা বলে বোধ হয়েছে, তেমনি ভ্রমণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাও তাঁর অধ্যাত্মবোধে বিশুদ্ধ বলে মনে হয়েছে। একটি মাত্র উদাহরণই আমাদের এই ধারণার সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট। সুঙ্ঘ্রী ভ্রমণকালের (১৮৫৭) একটি বর্ণনায় মহর্ষি লিখেছেন—

> যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার-পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পরে এক পাল অজা অবি চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল, এবং বলিল যে, 'ইস্‌সে দুধ মিলেগা'। আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। 'সভ্‌নাঁ জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাই'। সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই।[৪৪]

সর্বত্র সর্ব বিষয়েই করুণাময় ব্রহ্মের স্পর্শ উপলব্ধি করার এই যে অধ্যাত্মবোধ, মহর্ষির 'আত্মজীবনী'তে তার বর্ণনা সুপ্রচুর। ভ্রমণ-বর্ণনাতেও এই সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন। এ তাঁর মরমীবাদেরই ভাষারূপ বলা যায়।

বাংলাসাহিত্যে 'আত্মজীবনী' গ্রন্থখানির স্থান তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ। একজন সাধকের পবিত্র সাধনার বাণীরূপে কেবল নয়। এর ভাষা ও অলঙ্কার,[৪৫] ভাব ও রচনাশৈলীর অনুপম উপস্থাপনায়, গল্পের রসে, নাটকের আবেদনে, ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনায়, ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবেশনায় এ গ্রন্থ সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক অতুলনীয় সংযোজন। সব মিলিয়ে এ গ্রন্থ সাহিত্য। ব্যক্তিমনের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার স্বর্ণশস্যে ভরা সর্বজনমনের চির আনন্দের উৎস। এবং এই কারণেই লক্ষ্য করা যায়, গ্রন্থখানি মহর্ষির জীবনের ১৮ বৎসর থেকে ৪১ বৎসর পর্যন্ত ২৩ বৎসর জীবনের যে অভিজ্ঞতার কথায় পূর্ণ, তা তাঁর সমগ্র জীবনের

মূল্যবোধে রচিত নয়। সাহিত্যধর্মী গ্রন্থ-রচনায় রচনাকারকে সংযত হতে হয়। সকল ঘটে-যাওয়া ঘটনা অপেক্ষা সম্ভাব্য, ঘটতে-পারতো ঘটনা তাঁকে গ্রহণ করতে হয় বেশী। কারণ, তার আবেদন রচনাকারের একক হৃদয়ে নয়, পাঠকসম্প্রদায়ের বহুজনচিত্তের কাছে। অতএব প্রয়োজন সেখানে ঘটনার গ্রহণ এবং বর্জন। আত্মজীবনচরিত সাহিত্যধর্মী করে তুলতে হলেও এই গ্রহণ-বর্জনের প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যগ্রন্থ-রচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি যত সহজ, আত্মজীবনী-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তত সহজ নয়, খুবই কঠিন। তার প্রমাণ নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' পাঁচ খণ্ড। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' তাঁর জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত। মনে রাখা দরকার, মহর্ষি নিজে স্বেচ্ছায় জীবনের এই খণ্ডাংশ নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেন। 'আত্মজীবনী'র রচনাকাল এবং প্রকাশকালে মহর্ষির বয়ঃক্রম ছিল, যথাক্রমে ৭৭ ও ৮১; পরিণত বয়সের জীবন-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পশ্চাতের ফেলে-আসা অতীত জীবনের কথা-রোমন্থনে পূর্ণ তা। মহর্ষির পুত্র, রবীন্দ্রনাথ জীবনচরিত-রচনার ক্ষেত্রে এই পরিণত বয়স এবং গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা তাকে সাহিত্যধর্মী করে তোলা প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। লিখেছেন—

> নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র নিজের কাছে অপরাহ্নের আলোকে ছবির মতো দেখা দেয়। অন্যান্য নানা ছবির মতো সেই আপন জীবনের ছবিও সাহিত্যের পটে আঁকা চলে।

এবং

> জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোন শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটা সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক-জীবনের ধারা।[৪৬]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান সূত্র ঈশ্বরানুভূতি। ব্রহ্মাস্বাদনই হল তাঁর জীবনের ব্রত, ধর্ম ও কর্ম। 'আত্মজীবনী' সেই জীবনের লিপি-আলেখ্য। সুতরাং সেই প্রধান সুরটি প্রকাশের জন্য তাঁর জীবনের যতটুকু ঘটনা আপনা থেকে তাঁর স্মৃতিতে এসেছে, অন্তরে যে সমস্ত ঘটনা ঐ সুর প্রত্যক্ষতর করতে সাহায্য করেছে, কেবল মাত্র সেই সকল ঘটনার বর্ণনাই

'আত্মজীবনী'তে স্থান পেয়েছে। 'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্রনাথের আত্মার জীবনানুভূতি। সেখানে তাঁর অন্তরালোকে উদ্ভাসিত যা, তা তাঁর হৃদয়ের আনন্দ-বেদনার নির্যাস। অনিবার্যভাবেই তাই সেই অন্তরের আলোস্নাত ঘটনাগুলি বহির্জগতের সকল ঘটনার সঙ্গে এক হতে পারে না। মরমী সাধকের দৃষ্টিতে যে সকল ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়েছে সেই সকল ঘটনাই স্থান পেয়েছে, 'আত্মজীবনী'তে। সেটিই স্বাভাবিক। গ্রহণের জন্যই এই বর্জন প্রয়োজন হয়েছে।

'আত্মজীবনী' তাঁর আংশিক জীবনের ইতিহাস কিনা সেটি বড় কথা নয়। বড় হল 'আত্মজীবনী' জীবনী-গ্রন্থ রূপে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ধর্ম ও কর্মের, তথা তাঁর সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সঙ্গতিপূর্ণ, অপরিহার্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রাহ্য কিনা। আর, গ্রন্থটিতে যে ঘটনার কালানুক্রমিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নি, তার কারণ, গ্রন্থটি একান্ত করে জীবনের পুরাবৃত্ত নয়। ইহা জীবনের জবানীতে চিত্তের উপলব্ধি, অনুভবের প্রকাশরূপ এবং স্থানে স্থানে এতবেশী তদ্গত যে মরমী সাধকের মন্ত্রের মত হয়ে উঠেছে। ইতিহাস যতটা তার চেয়ে বেশী আস্বাদনীয় হৃদয়ানুভূতি। ঐতিহাসিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ সালতমামীর তালিকা অপেক্ষা স্বাধীনচারী মনের মাধুরীতে পূর্ণ সাহিত্যের সুষমায় মণ্ডিত বেশী। এতে পুরানো দিনের স্মৃতি-ছবি আছে, আর রচনাকালের হৃদয়ানুভব আছে। তাই 'আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে।'[৪৭] 'আত্ম-জীবনী'তে এরূপ এলোমেলো ঘটনাসজ্জা স্বাভাবিক। কারণ—

> Life itself has nothing but a time-line, and even that is reduced to a semblance of order only by the artificial divisions of clock and calendar. And the individual time-line is certainly broken by memory and by anticipation. The pleasure of good conversation would be destroyed if conversations were organised—forced to proceed in a definite direction, instead of being brittle, broken by interruptions.[৪৮]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র এই এলোমেলো সজ্জা, ঘটনার গ্রহণ ও বর্জন তাঁর আত্মচরিতের সাহিত্যিক সুষমার অন্যতম কারণ। বিশ্বের সকল বড়

লেখকদের আত্মচরিতেরই এই গুণ। জীবনের বিশ্বাসযোগ্য, তথ্যবহুল ইতিহাস নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সত্য উদ্‌ঘাটনই হল আত্মচরিতের ধর্ম। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীকারের ভাষায় এই সত্যের স্বরূপ হল—

> But for me, truth is the sovereign principle which includes numerous other principles. This truth is not only truthfulness in word, but truthfulness in thought also, and not only the relative truth of our conception, but the Absolute Truth, the Eternal Principle, that is God ৪৯

এবং এই জন্যই তাঁর আত্মচরিত-গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে চিরাচরিত ঘটনার আনুগত্যে ছিল অনিচ্ছা।—

> If I had only to discuss academic principles, I should clearly not attempt an autobiography ৫০

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবনস্মৃতি' প্রসঙ্গে এই গ্রহণ-বর্জন বিষয়ক এলোমেলো ঘটনা-সজ্জায় আত্মজীবনী-গ্রন্থের সাহিত্যসুষমা সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> জিনিসটাকে ('জীবনস্মৃতি') সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন ব'লে একটা বিশেষ গল্প যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার তো বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু আপরিতোষাদ্‌ বিদুষাং ইত্যাদি।৫১

'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্র-জীবনের কর্ম, তত্ত্ব আর সংগঠনের সমন্বয়। মরমী সাধক সারা জীবন ধ'রে যে পৌত্তলিক বিশ্বাস এবং অদম্য চেতনার সাম্য খুঁজে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তারই কর্মচিহ্ন তাঁর রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থগুলি, তাঁর আচরিত ঘটনাগুলি। তাঁর সেই বিশ্বাস-বোধই তাঁর ধর্মতত্ত্ব। আর এ-তত্ত্ব কেবল তাঁর নিজের অন্তরের একটি বিশ্বাসরূপে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার প্রচারের জন্য তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা, পাঠশালা ও পত্রিকারও ব্যবস্থা করেছিলেন। সমগ্র 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে এই তিনের একটা সমন্বয় লক্ষিত হয়। সমন্বয়-সূত্রটি মহর্ষির অধ্যাত্মবিশ্বাস। সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিটি পরিচ্ছেদ এই শৃঙ্খলাসূত্রে গ্রথিত। জ্ঞান, কর্ম ও

উপলব্ধির সাহিত্যবাণী। তা মহর্ষির ধর্মসাধনার, কর্মের এবং কীর্তির অথচ সর্বজনমনের সাহিত্য। তা সাধকের উপলব্ধি, কর্মীর কীর্তি, ধর্মের সমন্বয়। অথচ 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভে' মণ্ডিত আত্মচরিত।

১। আনুমানিক ১৫৪৬ খৃঃ —১৫৫০-এর মধ্যে রচিত। দ্রঃ বিমানবিহারী মজুমদার, চৈ. চ. উপাদান।

২। হরিশ্চন্দ্রের প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮৫৩), রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রের নব সংস্করণ।

৩। মর্টন টি. এস. 'দানিয়েল চরিত্র' (১৮৩৬): দ্রঃ লঙের ক্যাটালগ।

৪। *DICTUNG UND WARHEIT*: *Poetry & Truth* (1881).

৫। Mouris Andrey, *Aspects of Biography*. দ্রঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত-সাহিত্য, ১৯৬৪, ২৬৮।

৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চরিত্র-সংগ্রহ, ৮ সংস্করণ: ১৯৫০ ভূমিকা, ৩।

৭। "It is a hard and nice subject for a man to write of himself: it grates his own heart to say anything of disparagement, and the reader's ears to hear anything of praise for him"—Abraham Cowley: Nehru, Jawaharlal. *An autobiography*, 1962, 1.

৮। পূর্বে উল্লিখিত, ২২।

৯। ঢাকা থেকে প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ছদ্মনাম ছিল রামচন্দ্র দাস। ছদ্মনামের সংক্ষিপ্তরূপে বইটি প্রকাশিত হওয়ায় সেকালে পাঠকসমাজে যথেষ্ট কৌতূহলও সৃষ্টি হয়েছিল। দ্রঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, পূর্বে উল্লিখিত।

১০। Hudson W. H., *An Introduction to the Study of Literature*: London, 1910, 27.

১১। Nehru Jawaharlal, *The Discovery of India*, Allahabad, 1945, 3rd Edn. Calcutta, 1947, Preface: viii

১২। *Ibid.* viii

১৩। সুবোধচন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতি, কলকাতা, ১৯১৯, ২৮১।

১৪। "We must not mistake our interest in the external facts of literary biography—which is generally an idle, often a vulgar interest for an interest in literature itself; out knowledge of these things, however wide and accurate, for literary culture."—Hudson, W. H., *op. cit*, 28.

১৫। Goethe, Jhhann Wolfgang. *Poetry and Truth*.

Lewisohu, Lendwig, *Goethe: the story of a man*, U. S. A., 1946 (Vol. I, discarded preface, XIV).

১৬। আত্মজীবনী (সম্পাঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী) ১৯৬২, ১-১৩।

১৭। তদেব (১৮৪৭-এ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা) ৬২-৬৭।

১৮। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অক্ষয়কুমার, ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনার অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৯। 'আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম'।—আত্মজীবনী, ১৩।

Baron Paul Heinrich Dietrich *Julien offroy de la Metrie* (1709-1751),
Von Holabach (1732-1789), *System de la nature*,
Johon Lock (1632-1704) *Essay concerniug Human Understanding*.
David Hume (1711-1776) *Enquiry concerning Human Understanding*.
প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দর্শনগ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথ পড়েছিলেন।—'তদেব' পরিশিষ্ট, ১০, ২৭২।

২০। রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি (১৯১২), র. র., বিঃ সংঃ ১৭ খণ্ড, ২৬৩।

২১। Underhill, Evelyn, *Introduction to the biography of Maharsi Debendranath Tagore.*
Trntd. S. N. Tagore & Indira Devi ; London, 1914, IX

২২। আত্মজীবনী, ১১৩।

২৩। তদেব, ১৮৭।

২৪। Thompson, Edward. J., *Rabindranath Tagore : his life and work*, Calcutta, 1961, 57 (1st published, 1921).

২৫। Wordsworth, *Lines composed a few miles above* tintern abbey. (1798) :

Williams, W. E., *A selection* : *Wordsworth*, London, 1954, 39.

২৬। আত্মজীবনী, ২১০।

২৭। তদেব, ১৯২।

২৮। জীবনস্মৃতি, র. র., বিঃ সং, ১৯৫৪, ২৭১।

২৯। রবীন্দ্র-গদ্যে ঝড়ের এবং বৃষ্টির বহু বর্ণনা আছে। উদ্ধৃত ঝড়ের উদাহরণের পাশে কেবলমাত্র ছিন্নপত্রের ২৪, ২৫, ৪৭, ৪৮, ৫৯ সংখ্যক পত্রগুলি আলোচ্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৩০। আত্মজীবনী, ৭২।

৩১। তদেব, ২০৯।

৩২। তদেব, ১৯২-১৯৩।

৩৩। তদেব, ১৪১।

৩৪। তদেব, ১৫০।

৩৫। আত্মজীবনী, ২১১। এ ছাড়া ৩৬ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদের মেঘ, বৃষ্টির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে, ২২৯ পৃষ্ঠায় সিমলার নির্জন পর্বতশিখরের বর্ণনায়, ৩৫ পরিচ্ছেদের বোয়ালির জলপ্রপাতের বর্ণনায় ২১৩ পৃষ্ঠায়, এবং আরো অনেক জায়গাতেই এই ঈশ্বরের অপার মহিমায় প্রকৃতির স্বভাব-বৈচিত্র্যের কথা ব্যক্ত।

৩৬। রবীন্দ্রনাথ, 'দান': বিচিত্রিতা, র. র.: বিঃ সং. ১৭ খণ্ড, ১৯৫৪, ১৬।

৩৭। রবীন্দ্রনাথ, 'দান', পূর্বে উল্লিখিত, ১৫-১৬।

৩৮। আত্মজীবনী, ১৭১।

৩৯। আত্মজীবনী, ১৫২

৪০। তদেব, ১৪২। তুঃ (ভাবের দিক থেকে) রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি: ৩০ সংখ্যক গান, 'এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ'।

৪১। "It is the dramatists' means of taking us down into the hidden recesses of a person's nature, and of revealing those springs of conduct which ordinary dialogue provides him with no adequate opportunity to disclose. It may be necessary for our complete comprehension of his action that we should know certain of his characters from the inside. He cannot himself dissect them, as the novelist does."—Hudson, *op. cit.*, 259.

৪২। রবীন্দ্রনাথ, 'রাজসিংহ' (১৮৯৩): আধুনিক সাহিত্য।

৪৩। আত্মজীবনী, ৬৮।

৪৪। তদেব, ২১২।

৪৫। দেবেন্দ্রনাথের ভাষা, ও অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

৪৬। রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, ২ পাণ্ডুলিপি, র. র., ১৭ বিঃ সংস্করণ ১৯৫৪, পৃঃ ৪৫৮।

৪৭। ক. 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের (১৯৬২ সংস্করণে) ১৫ পৃষ্ঠার 'অনন্তআকাশ' থেকে 'অনন্তের পরিচয়' পাবার ঘটনা-বর্ণনায় 'বহুপূর্বের' অভিজ্ঞতা বর্ণনার কাল ১-৩১ বলে সতীশ চক্রবর্তী মনে করেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে মহর্ষি এ বিষয়ে কোন কালানুক্রমিক শৃঙ্খলা রক্ষাও করেন নি, তার পরিচয়ও দেন নি।

খ. গ্রন্থ-আরম্ভে 'গোপীনাথ ঠাকুর দর্শনে'র যে বর্ণনা তা মহর্ষির অতি শৈশবকালের। এ ঘটনার সঙ্গে 'দিদিমার দিদিমাকে' পেয়ে তাঁর কোলে চড়ে জগৎলীলা প্রত্যক্ষ করার কালের কোন সামঞ্জস্য নেই। একটি শৈশবের স্মৃতি, অন্যটি পরিণত বয়সের জীবন ও জগৎ দর্শন। মাঝে বহু বৎসরের ব্যবধান।

গ. বিদ্যালয়ের পড়াশুনোর কাল (১৮২৭-'৩২), রামমোহনের বিলাত যাত্রা (১৮৩০), তাঁর মৃত্যু (১৮৩৩), মহর্ষির বিবাহ (১৮৩৪), অলকাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু (১৮৩৮), প্রভৃতি বহু ঘটনা 'আত্মজীবনী'তে বর্ণিত হয় নি।

৪৮। Phelps, William Lyon. *Autobiography with Letters*, London, 1939 preface, VIII

৪৯। M. K. Gandhi, *An Autobiography*, (1927), 1963 edn. Introduction, X.

Translated in English from original, Gujarati by Mahadev Desai.

৫০। *Ibid.*

৫১। র. র.: ১৭, গ্রন্থ-পরিচয়, ১৯৫৪, ৪৫৪।

দেবেন্দ্রনাথ : ভাষা

অক্ষয়কুমারের রচনারীতির স্বভাব নির্ধারণে যেমন ভাষা-বিশ্লেষণের কতকগুলি অপরিহার্য বিষয় আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর স্বভাব নির্ধারণের জন্যেও আবশ্যক তাঁর ভাষার পূর্ণ বিশ্লেষণ। প্রধানত শব্দ, শব্দগুচ্ছ (ক্লস্), শব্দসজ্জা, বাক্যবিন্যাস, অনুচ্ছেদ-বিশ্লেষণ, অলঙ্করণ প্রভৃতি ভাষাবিচারের উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য পরিচ্ছেদটি গঠিত হবে।

১

তদ্ভব, তৎসম, দেশী, বিদেশী শব্দে সম্পূর্ণ বাংলা শব্দসম্ভারের যে ঐশ্বর্য তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন্দ্রনাথের রচনার শব্দসম্পদের পূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অক্ষয়কুমারের রচনায় যেরূপ তৎসম শব্দের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা গেছে, এবং বিদেশী শব্দের, বিশেষত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের রচনায় কোন্ শ্রেণীর শব্দ সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, কোন্ শ্রেণীর শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নি, বা হলেও খুব কম ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষ্য করা আবশ্যক, এবং তার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের রচনার কিছু অংশ যথেচ্ছভাবে তুলে তার শব্দের বিশ্লষণ করা আবশ্যক। আমরা নীচে দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাগ্রন্থ থেকে যে কোন কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি।—

১. সম্প্রতি এখানে বর্ষাকাল বিরাজমান, পর্ব্বত হইতে বাষ্পসকল অনবরত নির্গত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদায় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে মেঘের সঞ্চার হইলে বিলক্ষণ শীতের প্রভাব হয়, প্রায় বার মাসই উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।······ অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দূর

পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। প্রতি পর্ব্বতই মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে; কাহাকেও শঙ্কা নাই।[১]

২. মৃত্যু তোমাদের ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই বেদ্য সকলের সন্তজনীয়, অমৃত পুরুষকে জান এবং তাঁহার শরণাপন্ন হও। সংসারে যত প্রকার বিপদ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ, মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তাহারই মৃত্যু, যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয়সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনাসকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মৃত্যুভয়, এই মৃত্যুপীড়া হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি। মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, কিন্তু সেই অমৃতস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যুভয়, সংসারপারে সেই অমৃতধাম। এখানে মৃত্যুভয়ে ভীত হই, আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য। আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি।[২]

৩. তিনি যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিকভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল—দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল, এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না—যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যভূমি রাক্ষসভূমি ছিল, ভ্রষ্টাচারের পিশাচসকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা অজ্ঞাত শত সহস্র শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞান-প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়।[৩]

৪. তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার, তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম,

তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক, ও স্বপ্রকাশ, তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক, তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন, তুমিই মহোচ্চপদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বন-রহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হই। হে পরমাত্মন! মোহকৃতঃ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর, এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।[৪]

৫. এই সংকীর্ণ অন্ধকার নির্ব্বাত মন্দিরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ যাত্রীদের অসম্ভব ভীড়। স্ত্রীলোকদিগের এখানে ভদ্রতা রক্ষা করা দায়। আমি সেই ভীড়ের তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে, নীত হইতে লাগিলাম, এক স্থানে নিমেষ মাত্রও দাঁড়াইয়া থাকা অসাধ্য বোধ হইল। তখন আমার সঙ্গের জমাদার ও পাণ্ডা আমার তিনদিকে একের হাত আর-একজন ধরিয়া রেল করিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে স্বয়ং জগন্নাথের রত্ন-বেদী আমার রক্ষক হইল। আমি তখন নিরাপদ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জগন্নাথের সম্মুখে বৃহৎ একটা তাম্রকুণ্ডপূর্ণ জল, তাহাতে জগন্নাথের ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়াকে দাঁতন করাইল, আবার তাহাতেই জল ঢালিয়া দিল, ইহাতেই জগন্নাথের দন্তধাবন ও স্নান হইয়া গেল।[৫]

৬. শীঘ্রই স্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁহুছিয়াই একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো-বোটের জন্য দ্বিতীয় স্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্য কার্গোবোট আনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই টেলিগ্রাফ পাইয়া অস্থির হইল। সে বলিতে লাগিল, 'আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, গবর্ণমেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই। এতটা পথ আসিয়া আবার

আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ বড় অন্যায়। কাপ্তেনের বাড়ী যাইবার জন্য মনে ব্যগ্রতা ছিল, এদিকে স্টীমার কার্গো-বোটকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলে স্টীমারের সাহেব বিবিদিগেরও ফিরিয়া যাইতে হইবে; অতএব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, 'এ টেলিগ্রাফে কিছু এমন বলিতেছে না যে, এইখানেই কার্গো-বোট রাখিয়া স্টীমার চলিয়া যাইবে…'।৬

দেবেন্দ্র-রচনার এই ব্যবহৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুলির শতকরা হিসাবটি নীচের রেখাচিত্রে স্পষ্ট করা হল—

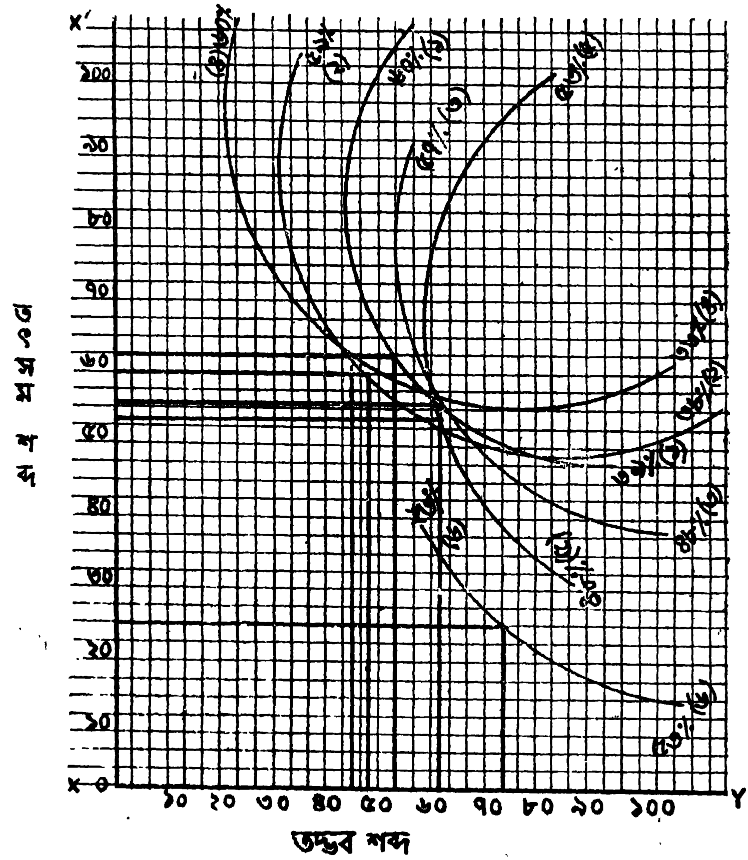

X – X রেখায় তৎসম শব্দের শতকরা হার। এবং X – Y রেখায় তদ্ভব শব্দের শতকরা হার দেখানো হল। ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের

যথাক্রমে তৎসম, এবং তদ্ভব শব্দের শতকরা হার হল, ৬০% – ৩৯%, ৫৯% – ৩৮%, ৫৭% – ৪৮%, ৬০% – ৩৩%, ৫৩% – ৪৮%, ২৩% – ৫৩%।

রেখাচিত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দেবেন্দ্র-রচনাতেও তৎসম-শব্দের ব্যবহারই বেশী। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির সব কটিতেই এই তথ্যের সমর্থন মেলে, কেবলমাত্র ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটিতে তদ্ভব, তৎসম শব্দাপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের কার্ভটিও তদ্ভব শব্দের দিগন্তে ঊর্ধ্বমুখী। দেবেন্দ্র-রচনার শব্দসম্পদের সঙ্গে অক্ষয়-রচনার শব্দসম্পদের একটি বড় পার্থক্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ইংরেজীসহ অন্য বিদেশী শব্দের ব্যবহারও করেছেন। অক্ষয়কুমারের রচনায় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, এবং অন্য বিদেশী যে শব্দের ব্যবহার, তাও এত সামান্য যে তাতে অক্ষয়কুমারের শব্দ-ব্যবহারের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আর সৃষ্টি করে না। দেবেন্দ্রনাথের রচনার যে ৬টি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে তদ্ভব ও তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দ-ব্যবহারের শতকরা হার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদে যথাক্রমে দেশী ০%, ১%, ১%, ২%, ৭%, এবং ৪% এবং বিদেশী যথাক্রমে ০%, ০%, ১%, ০%, ০%, ও ২০%।

শব্দের এই গোত্রগত বিভিন্নতা রচনার বিষয়গত বিভিন্নতানুযায়ী কম বেশী ব্যবহার হয়েছে কিনা সেটিও লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমারের রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সাহিত্য বা নীতিবিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে যত বেশী তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে তত বেশী তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয় নি।

দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ানুযায়ী উদ্ধৃত রচনাংশগুলির মধ্যে ২ সংখ্যক রচনার অনুচ্ছেদটি জীবনদর্শন-বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অন্তর্গত। এই অনুচ্ছেদটিতে তৎসম শব্দের শতকরা ব্যবহারের সংখ্যা ৮৯%, তদ্ভব ৩৮%। ১ অনুচ্ছেদটি প্রাকৃতিক বর্ণনা-বিষয়ক। এবং এই অনুচ্ছেদে তৎসম শব্দের সংখ্যা ৬০%, এবং তদ্ভব শব্দের সংখ্যা ৩৯%। আবার ৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদটিতে তৎসম শব্দমাত্র ২৫%, তদ্ভব শব্দ ৫৩%, বিদেশী শব্দ ২০%, দেশী শব্দ ৪%। বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই গল্প, ঘটনামূলক আত্মজীবনীর এই অনুচ্ছেদটির শব্দসম্পদ অন্য পাঁচটি অনুচ্ছেদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদটিতে দেশী শব্দ সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই (৭%), কিন্তু তৎসম ৬০% ও

তদ্ভব ৩৩% ব্যবহৃত হওয়ায় গড়পড়তা তৎসম শব্দের ওঠা-নামার স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম বিশেষ করে নি। অর্থাৎ ৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদটি ব্যতীত অন্য সব কটিতেই তৎসম শব্দের ওঠানামা ৬০%-৫০%-এর মধ্যেই থেকেছে, আর তদ্ভব শব্দের গড়পড়তা প্রায় ৪০% ক থেকে ঙ পর্যন্ত সর্বত্রই প্রায় এক রয়েছে। ৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদটিতে এই শব্দ-ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য, তার কারণ অনুচ্ছেদটির বিষয়। সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গে স্টীমার ও তার আনুষঙ্গিক বর্ণনা ও কথা অনুচ্ছেদটির বক্তব্য বিষয়। বলাবাহুল্য, অনিবার্যভাবেই তাই 'স্টীমার', 'কাপ্তেন', গবর্ণমেণ্ট' 'টেলিগ্রাফ', 'কার্গোবোট' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অক্ষয়কুমারের রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে কতকগুলো সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা অক্ষয়কুমারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল, বহু সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ শব্দহিসাবে এত সার্থক হয়েছে যে তার পরিবর্তে অন্য কোন তদ্ভব বা দেশী, বিদেশী শব্দ-ব্যবহার অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করতো। যেমন 'জল', 'আকাশ', 'আনন্দ'। দেবেন্দ্রনাথের রচনার ক্ষেত্রেও এই বিদেশী শব্দগুলির পরিবর্তে অন্য কোন তৎসম, তদ্ভব, বা দেশী শব্দের ব্যবহার রচনার অস্বাভাবিকতাই সৃষ্টি করতো। যেমন, 'স্টীমার', 'টেলিগ্রাফ', 'কাপ্তেন' বা 'ক্যাপ্টেন'। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ-ব্যবহার সকল লেখক সমান ভাবে পেরে ওঠেন না।[৭] গঙ্গা-বক্ষে নৌকাভ্রমণের বর্ণনায় 'দাঁড়ি', 'মাঝি', 'পাল', 'হাল', 'লগি' 'গুণ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার যেমন পরিবেশ-প্রত্যাশিত, তেমনি সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় 'কাপ্তেন' 'স্টীমার' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার একান্ত প্রত্যাশিত। এগুলির ব্যবহারের অভাবে, বা অন্যগোত্রীয়, পরিবর্তিত শব্দের ব্যবহার করলে নিঃসন্দেহে শব্দের প্রকাশশীলতা আহত হত, ভাষার স্বাভাবিক সুষমা বিনষ্ট হত। তৎসম শব্দের ব্যবহারমাত্রেই রচনা যেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে না, তেমনি বিদেশী শব্দের ব্যবহারেও রচনার ভাষা গতিবিমুখ হয়ে পড়ে না। আসলে, তদ্ভবই হোক আর তৎসমই হোক, ভাষার শব্দসম্পদে যদি শব্দ-ব্যবহারের কলানৈপুণ্য থাকে তাহলে রচনার ভাষাতে কোন অস্পষ্টতা আসে না। দেবেন্দ্রনাথের এই শব্দ-ব্যবহারের রীতি বিশ্লেষণকালে তাই লক্ষ্য করা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী শব্দের ব্যবহারে অক্ষয়কুমারের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথ সারা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছেন, বহু অবাঙ্গালীর সংস্পর্শেও এসেছেন এবং এই ভ্রমণ এবং বহু জনগণের সংস্পর্শ—ছুটির কোনটিই অক্ষয়কুমারের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় নি। দেবেন্দ্র-রচনায় বিদেশী শব্দের ব্যবহারে, তাঁর জীবনের এই ভ্রমণ এবং ভারতীয় জনগণের সংস্পর্শের পরোক্ষ একটা প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। তাই, অক্ষয়-রচনায় এই কারণেই বিদেশী শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই-ই।

বিদেশী শব্দ, বিশেষত ইংরেজী শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগে দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সেযুগেও কত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় এসে গেছে। কেবল এসেই যায় নি, এত স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃতও হয়েছে যে ঐ সকল ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে কোন বাংলা শব্দের ব্যবহার করলে তা ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্টও করে। যেমন, 'স্টীমার', 'ক্যাপ্‌টেন'। 'জলযান' বা 'জলযান-চালক' শব্দ-ছুটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে অচল। দেবেন্দ্রনাথ এদিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধিই করেছিলেন। কোন ভাষাই অপর কোন ভাষার শব্দসম্পদ কিছু মাত্র গ্রহণ না করে সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সেই গৃহীত বিদেশী শব্দের সার্থক প্রয়োগের উপরেই ভাষার গ্রহণশক্তি ও ঐশ্বর্যসৃষ্টির কার্যকারিতা নির্ভর করে। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এই দিক থেকে সেই বিদেশী শব্দগ্রহণের মাধ্যমে আপন ভাষার ঐশ্বর্যই গড়ে উঠতে দেখা গেল।

অন্যদিকে দেবেন্দ্র-রচনায় তৎসম শব্দ অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃত তৎসম শব্দ অপেক্ষা অল্প ব্যবহৃত হলেও নিতান্ত অল্প ব্যবহৃত হয় নি। দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে তৎসম শব্দই সবচেয়ে বেশি। তার কারণ, সম্ভবত ছুটি—

১. সে সময়, অর্থাৎ ১৮১৭-১৮৫৫-য় বাংলা গদ্য নির্মাণোন্মুখ, পূর্ণতা তখনো আসে নি। অতএব ভাষার আদর্শস্থল ছিল হয় সংস্কৃত, নতুবা ছুরুচ্চার্য সংস্কৃতবহুল বাংলা।

২. দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই ধর্মবিষয়ক, যার মূলে আছে উপনিষদ এবং বেদ,—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী। তা ছাড়া, ঠাকুর পরিবারেও সংস্কৃতচর্চার একটা রেওয়াজ ছিল। উপনিষদের চর্চা দেবেন্দ্রনাথ নিজে শুরু করেন, কাজেই সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর একটা অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল বলা চলে। এবং সেদিক থেকে

ধর্মীয় সাহিত্য-রচনায় তিনি যে তৎসম শব্দ বেশী ব্যবহার করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শব্দের Colligation বা সামীপ্য, এবং Collocation বা সাযুজ্য[৮]-র আলোচনা থেকেও দেবেন্দ্রনাথের শব্দসম্ভারের এই স্বভাবের পরিচয় স্পষ্টতর হয়। ভাষার স্বাভাবিক ক্রমের ব্যতিক্রমে লেখকেরা কী ভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন রাখেন তার বিশদ আলোচনা অক্ষয়কুমারের শব্দ-সামীপ্য ও শব্দ-সাযুজ্যের বিচার-প্রসঙ্গে করা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার পূর্ণ আলোচনা আবশ্যক। 'রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন' (হইয়া পড়িয়াছে) কিংবা 'জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ' প্রভৃতি শব্দ-সাযুজ্যের যে ব্যবহার দেবেন্দ্র-রচনায় দৃষ্ট হয়, তাকে তাৎকালিক বাংলা গদ্যের নূতন শব্দ-সাযুজ্যের চিহ্ন বলে অভিহিত করা চলে। একটি শব্দের পর প্রত্যাশিত আর একটি শব্দ (যেমন, জন + কোলাহল) না ব্যবহার করে অপ্রত্যাশিত অন্য আর একটি শব্দ ব্যবহার করে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ আরো স্পষ্টতর করে তোলার (যেমন, জন-কল্লোল) যে শব্দ-সাযুজ্যগত বৈশিষ্ট্য তাতে দেবেন্দ্রনাথের রচনার ঐশ্বর্য কিরূপ হয়েছে এখানে লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে। নীচে Collocation বা শব্দ-সাযুজ্যগত ক'টি উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল।—

ক. মৃত্যুপীড়া (মৃত্যু শব্দের পর 'ভয়' শব্দসঙ্গই প্রার্থনীয়, প্রত্যাশিত; দেবেন্দ্রনাথ 'পীড়া' শব্দসঙ্গ বসিয়েছেন। খ. রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন (হইয়া পথে পড়িয়াছে)। গ. তরুণ বয়স্ক বৃক্ষ ('বৃক্ষ'র পূর্বে যে বিণ্ বসেছে, সাধারণতঃ সেটি 'মানুষ' 'লোক' বা 'ছেলে' প্রভৃতি মানুষবাচক শব্দের শব্দ-সাযুজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়)। ঘ. ভীড়ের তরঙ্গ (জলতরঙ্গ স্বাভাবিক, বায়ুতরঙ্গও ব্যবহৃত হয়, ভীড়ের নূতন শব্দ-সাযুজ্য)। ঙ. ভ্রষ্টাচারের পিশাচ। চ. চিরবিহারী। ছ. তরুণ সূর্য্যকিরণ (সাধারণতঃ 'তরুণ তপন' ব্যবহৃত হয়)। জ. সূর্য্যের অভ্যুদয়। ঝ দুঃখ-ক্লেশে-আবৃত ('জর্জরিত' স্বাভাবিক)। ঞ ইহা দেদীপ্যমান। ট. পাপের মোচয়িতা। ঠ. প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ। ড গুরুতর গ্রন্থ। ঢ. অগ্নিদেবতা যজ্ঞে স্তবনীয় নহেন। ণ তুষারজীর্ণ-বসন, প্রভৃতি।

দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যবহৃত এই সমস্ত শব্দ-সাযুজ্যের সর্বদাই যে সুপ্রয়োগ হয়েছে এরূপ নয়। যেমন, প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ, 'পুষ্প প্রস্ফুটিত'ই স্বাভাবিক, 'কিরণ বিকীর্ণ' স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে 'প্রীতি'কে 'পুষ্প' তুল্য জ্ঞান

করে রূপক-অলঙ্কার রূপে যখন কল্পনাই করেছেন লেখক, তখন তা 'বিকীর্ণ' না হয়ে 'প্রস্ফুটিত' হলেই হয়তো ভাষার সুষমা অধিক বজায় থাকতো। তেমনি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পরিবর্তে 'গুরুতর গ্রন্থের ব্যবহারও বিশেষ সুখকর হয় নি। 'কলিগেশন' বা 'কলোকেশন'-এর ব্যবহারের প্রতিও হয়তো তাঁর সেই অসচেতন লেখকমনই দায়ী। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের 'কলোকেশন'-এর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 'কলোকেশন'-এর একটি তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে, কার রচনায় কত সার্থক, সুন্দর শব্দ-সাযুজ্য (কলোকেশন) ব্যবহৃত হয়েছে। শ্মশানকে অক্ষয়কুমার 'মৃত্যুভূমি' কল্পনা করে যে নূতন 'কলোকেশন'-এর সৃষ্টি করেছেন, দেবেন্দ্রনাথের 'মৃত্যুপীড়া' 'মৃত্যুভয়' নামক প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে নূতন সৃষ্ট শব্দ-সাযুজ্য রূপে ব্যবহৃত হয়ে তার তুলামানই রচিত করেছে বলা চলে। বরং অক্ষয়কুমার ক্রিয়াপদের শব্দ সাযুজ্যে অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অস্পষ্ট অর্থ সৃষ্টি করেছেন, (যেমন, 'দৃষ্টি হইল' 'দুঃখ ঘটনা হয়') দেবেন্দ্রনাথের ক্রিয়াপদের শব্দ-সাযুজ্য তেমন কোন অস্পষ্টার্থ সৃষ্টি না করে প্রায়ই ভাষার স্বাভাবিক ক্রমানুসরণ করে স্বাভাবিক এবং স্পষ্টার্থক করে তুলেছে। যেমন, 'দীপের আলো বাহির হইতেছে', 'আমি তাহাকে পাথেয় দিতে চাহিলাম', 'নৌকা তীরে লাগিল', 'ছায়া পড়িয়াছে', 'তুমি পুষ্পেতে আছ, গন্ধেতে আছ', 'সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি', 'শ্লোকের আবৃত্তি হইল', 'সমাপ্ত হইল', প্রভৃতি

কতকগুলি শব্দ-সাযুজ্য দেবেন্দ্রনাথের রচনার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। অক্ষয়কুমারের 'স্থির সমুদ্র', 'স্বাস্থ্যক্ষয়' 'সুখসম্ভোগ' প্রভৃতি সার্থক, সুন্দর শব্দ-সাযুজ্যের মত দেবেন্দ্রনাথেরও রচনায় কিছু সার্থক, সুন্দর শব্দ-সাযুজ্যের ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন, 'পাপের মোচয়িতা', 'তুষারজীর্ণ বস্ত্র/বা বসন,' 'চিরবিহারী' (অমর অর্থে), 'দুর্ব্বল-বুদ্ধি', 'সত্যালোক' 'মোহবাক্য,' 'আনন্দ অধ্যায়,' 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত-হৃদয়' 'স্তবনীয় স্তোত্র'। অক্ষয়কুমারের শব্দ-সাযুজ্যের প্যাটার্ণের বা ছাঁদের মত দেবেন্দ্রনাথের শব্দ-সাযুজ্যের একটি ছাঁদ, বা প্যাটার্ণ আছে। যেমন—

বিশেষ্য ছাঁদের/Pattern Noun

১. জীবন-স্বপ্ন, ২. ভীড়-তরঙ্গ, ৩. দেবপথ। ৪. মৃত্যুর প্রতিকৃতি ৫. সমাধি-স্তম্ভ।

বিণ্‌ ছাঁদের/Pattern Adjective

১. বিমল স্তুতিবাদ, ২. তরুণ-সূর্য্যকিরণ ৩. তুষার-জীর্ণ-বসন, ৪. মহোচ্চতার অভিমান, ৫. জ্ঞানোজ্জ্বলিত-হৃদয়।

ক্রিয়া ছাঁদের/Pattern Verb

১. মহিলা গান করেন (মহিলা কীর্তন* করেন/অথবা, মহিলা গান গাহেন, স্বাভাবিক)। ২. ন্যায়-উপার্জিত বিত্তের দ্বারা জীবন ধারণ করিবেক। ৩. নিদ্রা যাইতে পার নাই। ৪. ক্লেশ হইয়া থাকিবেক।

শব্দ-সাযুজ্যের এই আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ বা অক্ষয়কুমারের রচনায় উভয়ের শব্দ-সাযুজ্যগুলিই প্রধানত তৎসম শব্দে গঠিত এবং অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আরো একটি সাদৃশ্য এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার যে, উভয়েই নূতন শব্দ-সাযুজ্য কিছু সৃষ্টি করেছেন, ব্যবহারও করেছেন। তবে উভয়ের সৃষ্ট এই শব্দ-সাযুজ্যের মধ্যেকার পার্থক্যও আছে। অক্ষয়কুমারের সৃষ্ট শব্দ-সাযুজ্যগুলি বেশীর ভাগই বিজ্ঞানবিষয়ক আর দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্ট শব্দ-সাযুজ্যগুলি জীবন ও জগৎসম্পর্কীয়, ধর্ম-প্রাসঙ্গিক। যেমন, অক্ষয়কুমারের 'আকাশযান', 'সৌরজগৎ' অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের 'সুখস্পর্শ বায়ু', 'স্নিগ্ধ রশ্মি', 'ছায়াপুরুষ', 'শ্বেত মাঠ', 'পুণ্য পদবী,' প্রভৃতি।

দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যবহৃত শব্দ-সাযুজ্যগুলির চরিত্রানুযায়ী মোট পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা, ১. তৎসম, ২ তদ্ভব, ৩. গতানুগতিক, ৪. সমকালীন ৫. এবং নূতন শব্দ-সাযুজ্য। যে কোন দশটি শব্দ-সাযুজ্য নিয়ে এই শ্রেণী-করণানুযায়ী একটি বিশ্লেষণ-চিত্র আমরা প্রস্তুত করতে পারি। ইহা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

দেখা যাচ্ছে, দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্ট নূতন শব্দ-সাযুজ্যের সংখ্যা কম নয়, এবং সেগুলির প্রয়োজন, সার্থকতাও আছে। গতানুগতিক এবং সমকালীন প্রচলিত শব্দ-সাযুজ্যের ব্যবহার দেবেন্দ্র-রচনায় অপেক্ষাকৃত কম। এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসে, এবং তাঁর সম্পদ-সৃজনে বিশেষ উচ্চ স্থানের অধিকারী। সচেতন সাহিত্যের সাধক না হয়েও মহর্ষি যে ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে ফেলেছেন তা শুধু বেদ, উপনিষদের বঙ্গানুবাদ নয়, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদও। দেবেন্দ্র-রচনায় এই দুর্লভ সম্পদের আরো বিস্তৃততর পরিচয় ক্রমশ আলোচিত হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সমাস-ব্যবহারের

	শব্দসাযুজ্য	তৎসম	তদ্ভব	গতানুগতিক	সমকালীন	নূতন
১	বিমল স্তুতিবাদ	+	−	−	−	+
২	তরুণ সূর্য্য-কিরণ	+	−	−	−	+
৩	মহোচ্চতার অভিমান	+	−	−	−	+
৪	দেবপথ	+	−	−	−	+
৫	স্তবনীয় স্তোত্র	+	−	−	−	+
৬	মোহবাক্য	+	−	+	+	−
৭	দুর্ব্বলবুদ্ধি	+	−	+	−	+
৮	পাপমোচয়িতা	+	−	−	−	+
৯	গুরুতর গ্রন্থ	+	−	−	−	+
১০	তুষারজীর্ণ বসন	+	−	−	−	+

প্রকাশ শীলতায় উল্লিখিত সংখ্যার শব্দ-সাযুজ্যগুলি সার্থক। ১, ৩, ৪, ৫ ও ৮।

চিহ্ন সঙ্কেত : + আছে, − নাই।

মধ্য দিয়ে কিভাবে এই সম্পদের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে সেটি লক্ষ্য করা যাবে।

২

অক্ষয়কুমারের শব্দসম্ভারের পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলাসাহিত্যে সমাস-ব্যবহারের রীতি, ও প্রয়োজন প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে লক্ষিত হয়েছে যে, সমাস-ব্যবহার বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যদি লেখক হিসাবে রচনায় খুব কম বা খুব বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহলেই সে রচনার

একটি স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। সেদিক থেকে, অক্ষয়কুমারের রচনাগুলিতে ব্যবহৃত সমাসের যেরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হয়েছিল, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের রচনাগুলিরও ব্যবহৃত সমাসগুলির বিশ্লেষণ কর্তব্য।

সমাসের স্বভাবের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের রচনায় যেমন বাংলা সমাস ও তৎসম সমাস বা সংস্কৃত সমাসের দুটি বিভাগ লক্ষিত হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের রচনায় স্পষ্টতর সেরূপ দুটি বিভাগ লক্ষিত হয় না। দেবেন্দ্র-রচনায় সংস্কৃত সমাসের ব্যবহারই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। মোটামুটি তিনটি বিভাগে তাঁর ব্যবহৃত এই বাংলা সমাসগুলির একটি শ্রেণীবিন্যাস করা চলে। যেমন—

১. নির্মাণের দিক থেকে, অর্থাৎ ক'টি শব্দে এক-একটি সমাসবদ্ধ পদ রচিত হয়েছে তার হিসাব ও বিচার।

২. ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার, (সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারের পরিবর্তে)

৩. সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস, কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাবহারিক দিক থেকে সমাস বলে মনে হয় না।

নির্মাণের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের রচনায় যেরূপ দুইটি শব্দ থেকে পাঁচটি, ছ'টি, সাতটি শব্দে পর্যন্ত গঠিত সমাসবদ্ধ পদ লক্ষিত হয়েছে, দেবেন্দ্র-রচনায় ঠিক এত বৈচিত্র্য লক্ষিত না হলেও ছোট এবং দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ অনতিলক্ষ্য নয়।

দু'টি শব্দে গঠিত সমাসবদ্ধ পদ—

১. অমৃত-পুরুষ, মৃত্যুভয়, মৃত্যুপীড়া, অমৃতধাম, জগন্নাথ, অবিদ্যা-অরণ্য, সংসার-সাগর, ইত্যাদি!

তিনটি শব্দে গঠিত সমাসের ব্যবহার—

২. কলিকাতাভিমুখে, তাম্রকুণ্ডপূর্ণ। বা তুষার-জীর্ণ-বসন, সুখ-স্পর্শ-বায়ু।

তিনটি শব্দের উর্ধ্বে—

৩. অতি-প্রাচীন-জীর্ণ-শরীর-বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, নিবিড়-অন্ধকারাবৃত-পিশাচ-ভূমি, ব্রাহ্ম-সমাজ-রূপ-বীজ, প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমারের রচনায় যেমন সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের পরিবর্তে ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার লক্ষিত হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের রচনাতে সেরূপ ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার বহুল লক্ষিত হয়। যেমন—

১. ভ্রষ্টাচারের পিশাচ, (তুমিই) জগতের জ্ঞানস্বরূপ, মহোদতার (ভু)

অভিমান, অন্ধকারের কাল, ভীড়ের তরঙ্গ। (এগুলি ঠিক সমাস না হলেও সমাস-সংক্রান্ত উপাদানের ব্যবহার। তাই সমাস-প্রসঙ্গেই এগুলির আলোচনা করা হল)।

কিছু সংখ্যক সমাস দেবেন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষিত হয় যেগুলি সমাসরূপে ব্যবহৃত না হলেই রচনার অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হত, রচনা আড়ষ্ট হত। যেমন, 'ঘাত-প্রতিঘাত', 'জড়শক্তি', 'গ্রহ-উপগ্রহ'। 'জীবজন্তু' 'মহাসভা', 'জলজন্তু', 'মহাসমুদ্র', 'যুগযুগান্তর,' 'দীপালোক', 'ধর্মবিজ্ঞান, 'কায়মনোবাক্য', 'বিষয়স্পৃহা,' বা 'একাগ্রচিত্ত', 'জীবন যাত্রা'।

এই সমাসবদ্ধ পদগুলি ভেঙ্গে যদি পৃথক পৃথক রূপে লিখিত হত তা'হলে অবশ্যই ভাষা-সুষমা, সহজগতি-হারা হত, আড়ষ্ট হয়ে যেত ভাষার প্রবহমানতা। আসলে, সমাসবদ্ধ পদ বা তৎসম শব্দে গঠিত সমাস ও শব্দ যাহাই ব্যবহৃত হোক্ না কেন, তা যদি ভাষার ব্যাবহারিক ঐশ্বর্যসম্মত হয়, তার ব্যবহার স্বাভাবিকই হয়, তার ভাষার ব্যাবহারিক ঐশ্বর্যকে আহত করে যে শব্দ ও যে সমাসই ব্যবহৃত হোক্ না কেন, তা অবশ্যই সার্থক প্রয়োগে সহজ হতে পারে না, ভাষাকে যেন কিছুটা বন্ধুর করে তোলে। দেবেন্দ্রনাথের রচনার সমাসবদ্ধ কিছু পদ ভেঙে বা সমাসভঙ্গ কিছু শব্দ সমাসাবদ্ধ করে দেখলেই সমাস সম্পর্কে এই মন্তব্যের সার্থকতা মিলতে পারে। যেমন—

> সূর্য্যদিগের মধ্যে আবার বর্ণভেদ কত—কোনটা লোহিত, কোনটা বা পীত, কোনটা বা নীলবর্ণ। ইহাদিগের সংখ্যাই বা কত, ইহাদের একদণ্ডের জন্য বিরাম নাই; সকলেই অসীম বেগে ধাবিত হইতেছে।

এবং

> বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর শোভার আগার এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—তিনেরই স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। একদিকে তাঁহার যেমন পিতৃভাব মাতৃবাৎসল্য, তেমনি আর একদিকে তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং'।

সমাসবদ্ধ করে ও সমাসভঙ্গ করে লিখলে যেরূপ দাঁড়ায় তা হল—

> সূর্য্যদিগের···বর্ণের ভেদ কত···পীত,···বা নীল রূপ বর্ণ।···বা কত, ···নাই, সকলেই অসীমাবেগে ধাবিত হইতেছে। এবং বিশ্বের স্রষ্টা

'পরম যে ঈশ্বর' 'শোভাগার রূপ এই জগতে'…তিনেরই…দিয়াছেন।

একদিকে…'পিতার ভাব', 'মাতার বাৎসল্য'…'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং'।

অতএব দেবেন্দ্রনাথের সমাস-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একটি স্বাভাবিকতা যে সর্বত্রই আছে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। যে সমস্ত তৎসম শব্দে গঠিত সমাস তিনি ব্যবহার করেছেন, ব্যবহারের দিক থেকে তাও যেমন স্পষ্ট, ও স্বাভাবিক, তেমনি স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়েছে তাঁর সংখ্যাভিত্তিক নির্মাণের দিক থেকে ব্যবহৃত সমাসগুলি। তবে, অক্ষয়কুমারের ভাষায় তিন বা তদূর্ধ্বের শব্দে সংগঠিত সমাসগুলি যেমন অনেক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেছে তাঁর ভাষার গতিতে ও যতিতে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের, যদিও সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের তুলনায় অনেক কম, তবু যখন ব্যবহার করেছেন, খুব আড়ষ্টতা বোধ হয়, হয় নি। যেমন—১. অগ্নিকুণ্ড-বাষ্পাবৃত-পৃথিবী, ২. সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-ব্রহ্ম। কিন্তু সঙ্গে এ কথাও অবশ্য গ্রাহ্য যে, ভাষায় শব্দ বা সমাসবদ্ধ, সমাসভঙ্গ পদ ব্যবহারের একটি প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন সর্বত্রই থাকে। প্রসঙ্গানুসারে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারও স্বাভাবিক হতে পারে। সেদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের স্বল্প-ব্যবহৃত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের যে ব্যবহার তা প্রাসঙ্গিক, কাজেই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাভাবিক নয়। মহান্ ব্রহ্মের আনন্দরূপের বিশ্বব্যাপ্ত গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে, ব্রহ্মার কর্মকাণ্ডের বিশাল ব্যাপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-ব্রহ্ম' বা 'তরুণ-সূর্য্য-রশ্মি-বিধৌত' জাতীয় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার সম্ভবত অস্বাভাবিক হয় নি।

অক্ষয়কুমারের শব্দসম্পদের মত দেবেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদেও তৎসম শব্দের ব্যবহার যেমন বহুল, তেমনি সমাসগুলিও সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে সংগঠিত। 'অনুতাপ-অগ্নিতে দগ্ধ', 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত-বিশুদ্ধ-হৃদয়', 'তৃণ-লতা-শূন্য-দুর্গম-তুষারাবৃত-পর্ব্বত-প্রদেশ', 'ধনপূর্ণ-পোত' প্রভৃতি পদগুচ্ছাকৃতি, দীর্ঘ সমাসগুলির মধ্যেও যেমন, তেমনি 'মহোচ্চ', 'সর্ব্বদর্শী', 'নিরবয়ব', 'জ্ঞানাগ্নি', বা 'বিশ্রামাস্থান', 'বিশ্বমন্দির', 'ব্রাহ্মসমাজ', 'চিকিৎসালয়' প্রভৃতি ছোট ছোট সমাসবদ্ধ পদগুলিতেও এই তৎসম শব্দের প্রয়োগই লক্ষিত হয়। কিন্তু রচনার বিষয়ানুযায়ী এই সমাস-ব্যবহারের রীতি দেবেন্দ্রনাথের রচনায় পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর ধর্মসংক্রান্ত

উপদেশাত্মক, বক্তৃতাবিষয়ক রচনাগুলিতে সমাস, সাধারণভাবেই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, সমাসের ব্যাস-বাক্যের ব্যবহার, সবই অন্যান্য রচনার তুলনায় অধিক সংখ্যক ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে 'পত্রাবলী'তে বা 'আত্মজীবনী'র যে সকল অংশে হাল্‌কা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বর্ণনা আছে, সেই সকল অংশে সমাস বেশ অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে। সমাস ব্যবহারের দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পার্থক্য এইখানে।

অক্ষয়কুমারের সমাসবিহীন সাধারণ রচনা বা রচনাংশ প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, দেবেন্দ্রনাথের রচনায় বহু অংশে সমাস নেই বললেই চলে। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনায় শুধু সমাসবহুল নয়, বড় বড় সমাসবদ্ধ পদগুলির পর পর ব্যবহারও লক্ষিত হয়েছে।[১] কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ খুব দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ খুব বেশী ব্যবহার করেন নি। যা করেছেন, সাধারণত তা দুই, তিন বা চার শব্দের সমাসবদ্ধ পদ, এবং তাও লঘু রচনাগুলিতে ('পত্রাবলী' 'আত্মজীবনী'র কিছু অংশ) কম। তবে সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দের ব্যবহারে উভয়ের একটি বিষয়ে মিল লক্ষিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিতে তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশী করেছেন, অক্ষয়কুমারও নীতি ও সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলিতে তৎসম শব্দ-ব্যবহার ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কম করেছেন।

বাক্য বিচার

বাংলা গদ্যের বাক্যগঠন-পদ্ধতি যে দেবেন্দ্র-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর কর্তৃক একটি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিল এবং এই স্পষ্টগ্রাহ্য রূপটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করেই যে মোটামুটি স্থিতিলাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অক্ষয়কুমারের বাক্যগঠন-পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণকালে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বলাও হয়েছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির বিচার ও বিশ্লেষণও এদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা, ফোর্ট উইলিয়ম যুগের গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রামমোহন, অক্ষয়কুমারের পরে ও সমসাময়িক কালে দেবেন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য ও ভঙ্গি তাঁর ব্যবহৃত বাক্যগুলির বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া এই ক্রমানুসৃত দেবেন্দ্র-রচনায় ব্যবহৃত বাক্যের যে নিদর্শন মেলে নিয়ে তার গুটিকয়েক উদাহরণ তোলা হল। যেমন—

১. দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন।—আত্মজীবনী : পৃঃ ১।

২. এই সৌরজগৎ সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে।

—জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি : পৃঃ ২১।

৩. ইন্দ্রিয়ের অগোচর নীহারিকা প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল।—তদেব : পৃঃ ২।

কিন্তু শক্তিমান লেখকরা ভাষার স্বাভাবিক ক্রমের সীমা ভেঙ্গে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে নূতন সংগঠনের মাধ্যমে ভাবকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। লেখক হিসাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এইরূপেই সম্ভবত আসে। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন, বাক্যের সম্পূর্ণতা আছে কিন্তু ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে নি, বহু জায়গায়। যথা—

১. জড়জগতের প্রথম গুণ দুইটি—বিস্তৃতি ও বাধকতা।—জ্ঞান : পৃঃ ১৪।

২. তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য।—জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি : পৃঃ ৪।

৩. ইহার পথসকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি।

—অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৬।

৪. তিনি এই শরীরমন্দিরের দেবতা।—ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান : পৃঃ ১৩।

৫. তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার। —ব্রাহ্মধর্ম : পৃঃ ৭।

লক্ষ্য করা যায়, অক্ষয়কুমারের রচনায় ক্রিয়াবিহীন বাক্যের ব্যবহার যে পরিমাণে হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তার চেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যবহৃত হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই ক্রিয়াবিহীন বাক্যগুলির বৈচিত্র্যও বেশী। কোন কোনটিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ছোট ছোট স্বাধীন বাক্য কয়েকটি একটি বাক্যেই লিখিত হয়েছে, এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র বাক্য যদি পৃথক্ করে লিখিত হত, তাহলেও কোনটিতেই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত না হলেও চল্‌তো। অর্থাৎ ক্রিয়া-বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাক্যের দ্বারা ক্রিয়াবিহীন একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাক্য যেন রচিত হয়েছে। যেমন উপরে দেওয়া উদাহরণের ৩ সংখ্যক ও ৫ সংখ্যক বাক্য-দুটি। অক্ষয়কুমারের রচনায় এরূপ ক্রিয়াবিহীন বাক্যবৈচিত্র্য কম লক্ষিত হয়।

অক্ষয়কুমারের বাক্যবিশ্লেষণ কালে যেমন 'এবং' ব্যবহারের বৈচিত্র্য

আলোচিত হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের বাক্যগুলির বিশ্লেষণ থেকে সেরূপ কোন বৈচিত্র্য পাওয়া যায় কিনা এবার দেখা যেতে পারে। 'এবং', 'কিন্তু', 'আর' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দিয়ে বাক্যগঠন দেবেন্দ্রনাথের বাক্যবিশ্লেষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ধরা যায়। দেবেন্দ্রনাথের বাক্যে এই সকল সংযোজক অব্যয় যে ব্যবহৃত হয়েছে, লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত দুটি বাক্যের মধ্যে এই সংযোজক অব্যয়গুলি বসে বাক্য দুটি একত্র করে, একটি বাক্যের রূপ দেয়। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এই স্বাভাবিক রূপের সংযোজক অব্যয়ও ব্যবহৃত হয়েছে; আবার একটি পূর্ণচ্ছেদের পর একটি নূতন স্বতন্ত্র বাক্য যখন আরম্ভ হবে, সেই আরম্ভের মুহূর্তেও সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের যে বক্তব্যকে বক্তব্যধারার সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের বক্তব্যধারার একটি অবিচ্ছিন্নতা যেন রক্ষিত হয়েছে এইভাবে। যেমন—

১. আর, হবি দান করিয়া যজমানেরা যে যে দেবতার নিকট হইতে যে যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা অগ্নি ভাণ্ডারীর ন্যায় তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দেন। —আত্মজীবনী: পৃঃ ৯৭।

২. কিন্তু, সে-ই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে।
—আত্মজীবনী: পৃঃ ১৪৬।

৩. কিন্তু, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত বক্তৃতা আশু বা বিলম্বে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতে অবশ্য প্রকাশিত হইবেক। —পত্রাবলী, : পৃঃ ১১।

বলা বাহুল্য, বাক্যগুলির সাংগঠনিক সার্থকতা বাক্যগুলির পূর্ব-প্রাসঙ্গিকতা-নির্ভর। স্বতন্ত্র একটি বাক্য হয়েও সংযোজক অব্যয়গুলির ব্যবহারে বাক্যগুলি পূর্ব বক্তব্যের ধারার সঙ্গে একত্রে সম্পৃক্ত। অক্ষয়কুমারের রচনায় এরূপ বাক্য অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, গেলেও 'কিন্তু' 'আর'-এর প্রয়োগ বিরল-দৃষ্ট। অন্যদিকে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহারই দেবেন্দ্র-রচনায় অক্ষয়-রচনা অপেক্ষা কম, 'এবং'-এর ব্যবহার আরো কম। যখন কদাচিৎ হয়েছে তখন তা বাক্যের মধ্যেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়েছে।—

১. আমি যখন দুঃখে থাকি, তখন তোমার সুখে থাকা সংবাদ পাইলে সে

দুঃখের অনেক শান্তি হয়, ভাল, আমি এই পৃথিবীতে যাহার সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সে তো ভাল আছে। এবং সুখে আছে।

—পত্রাবলী : পৃ: ৪।

২. আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন, এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। —ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান : পৃ: ১৭।

দেবেন্দ্র-রচনায় ব্যাপকভাবে, সার্থক ব্যবহার হয়েছে, 'কিন্তু' সংযোজক অব্যয়ের। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এখানে। অক্ষয়কুমার খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন 'এবং' সংযোজক অব্যয়, 'কিন্তু' তাঁর রচনায় অতি স্বল্প ব্যবহৃত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ঠিক এর বিপরীত। 'কিন্তু' যত সহজে, সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর রচনায় 'এবং' তত ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, দেবেন্দ্র-রচনায় 'এবং' স্বল্প ব্যবহৃত হলেও তা সার্থকরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্য-সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার গদ্যের ক্ষেত্রে বক্তব্যকে যতটা বস্তুতান্ত্রিক করে ততটা কাব্য-ধর্মী, কল্পনামূলক সাধারণত করে না বলে ধারণা প্রচলিত আছে।[১০] দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এই বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। পূর্বে বাক্য-সংযোজক-সম্পর্কিত উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে লেখকের বক্তব্য নিশ্চয়ই কল্পনামূলক নয়, তবে বাক্যগুলিতে 'Poetry evaporates' করেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভাষার সুষমাসৃষ্টিতে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন তার অভাব থাকলে ভাষার কাঠিন্য আসতে পারে, আর সে সমস্ত উপাদান থাকলে ভাষা সঙ্গীতসম্পন্ন সুষমাময় হয়ে ওঠে।[১১] 'তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।' বা 'কিন্তু, সেই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে, তোমাকে পাইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে।' প্রভৃতি বাক্যগুলিতে কাব্যসুরভি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিনা তা বিচার্য বিষয়। তবে স্থূলার্থে কাব্যের কল্পনা ও কবিভাবনা এখানে নেই।

এই দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যবহৃত যখন···তখন, যেরূপ··· সেরূপ, এই···সেই, যেমন··তেমন, যাহার···তাহার প্রভৃতি সংযোজক সংগঠনের অব্যয় ও সর্বনামের বাক্যরীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে

বাক্যগুলি সংগঠনের দিক থেকে খুব সুষম (Ballanced)। একটা অনুভূতি কি করে যুক্তির পথে প্রকাশিত হতে পারে দেবেন্দ্রনাথের এই ধরনের বাক্যগুলি সেই তথ্যের সমর্থক। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টির যাথার্থ্য আলোচনা করা যেতে পারে। উদাহরণ—

১. আমি **যখন দুঃখে থাকি, তখন তোমার** সুখে থাকা সংবাদ পাইলে ···ভাল আছে, এবং সুখে আছে। —পত্রাবলী : পৃঃ ৪০।

২. তুমি **যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি** তেজেতেও আছ।
আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪২।

৩. **যে সৌন্দর্য্য** তুমি তোমার······**সে সৌন্দর্য্য** আমাদিগের······ রাখিয়াছে। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪৩।

৪. ঈশ্বরের আলোক **যাঁহার হৃদয়ে** আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, **তিনিই** সেই আলোকে সকল দর্শন করেন।
—অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৫৫।

৫. **যখন তাবৎ**···থাকে, **তখন যে** পূর্ণ······পারে না।
—অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৯।

বাক্য-সংযোজক এই শব্দগুলির দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের রচনায় বাক্যগুলির অন্য বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হয়েছে। বাক্যগুলি কি ভাবে এই সংযোজক শব্দগুলির দ্বারা পল্লবিত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে সেটিও লক্ষ্য করার মত। যেমন—

১. **কিন্তু** সে-ই পূর্ণ সুখী, **যাহার** প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত **যাহার** অশ্রু-সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া **যে** আপ্তকাম হইয়াছে। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪৪।

২. **যখন কাহারও জন্ম** হইল, **তখন অগ্নিতে** হোম করিয়া জাত কর্ম হইল, **যখন মৃত্যু** হইল, **তখন সেই** মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইল। —জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি : পৃঃ ৭৬।

৩. **যখন দেখিতে** পাই যে, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আমার উপরে প্রসন্নভাবে বিকসিত (ভু) রহিয়াছে, **যখন** তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি, **তখনই** তাঁহার সহিত আমাদের সম্মিলন হয়।
—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান : পৃঃ ২১।

লক্ষ্য করা যায় এই সকল সংযোজক দ্বারা সংগঠিত বাক্যগুলিতে দেবেন্দ্রনাথের যে বক্তব্যধারা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অর্থবহ হয়ে উঠেছে তখনি, যখনি এই যুগ্ম-বাক্যসংযোজকগুলি সঠিক ব্যবহার করা হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত যুগ্ম-বাক্যসংযোজকগুলির একটি ব্যবহৃত হওয়ার পর অন্যটি ব্যবহৃত না হচ্ছে ততক্ষণ যেন প্রথমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গ কামনা করেই চলেছে। (যেমন—যেমনি…তেমনি, যখন…তখন, যেরূপ…সেরূপ)। এদিক থেকেও দেবেন্দ্র-রচনায় কিছুটা স্বাধীনতা লক্ষিত হয়। ঠিক অভিপ্রেত, যুগ্ম-বাক্যসংযোজক ব্যবহৃত না হয়ে একটু স্বতন্ত্র, একটু নূতন রূপের বাক্যসংযোজকও ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কিন্তু অর্থবোধে কোন অস্পষ্টতা আসে নি। যেমন—

১. যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪৩।

২. কিন্তু সে-ই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার…আপ্তকাম হইয়াছে। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪৪।

'যে সকল বস্তু'র প্রত্যাশিত যুগ্ম-সংযোজক শব্দ হওয়া উচিত 'সে সকল বস্তু'। কিন্তু ১নং উদাহরণটিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে 'তাহারা' ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই নূতনত্বে অর্থবোধে কোন পার্থক্য, অস্পষ্টতা সূচিত হয় নি। একই ভাবে অর্থবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে ২নং উদাহরণটিতেও 'সেই··যেই' সংযোজক শব্দের প্রত্যাশার বদলে 'সেই…যাহার' ব্যবহৃত হয়েছে। অক্ষয়কুমারের রচনায় এই ধরনের বাক্যসংযোজকের শব্দ-সাযুজ্যগত (কলোকেশন) বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় নি, কিন্তু দেবেন্দ্র-রচনায় এগুলিকে এক শ্রেণীর নূতন শব্দ-সাযুজ্যের ব্যবহৃত উদাহরণরূপে ধরা যায়।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্যবয়ন উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্রায় সকল বাংলা গদ্যলেখকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অক্ষয়-কুমারের রচনায় বাক্যগঠনে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিপুল বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করেছি। দেবেন্দ্রনাথের রচনাতে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও তা সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের তুলনায় কম বৈচিত্র্যবহুল। অক্ষয়কুমারের রচনায় ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার তুলনায় তো আরও কম। দেবেন্দ্রনাথের

রচনায় সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের নূতন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। একই বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করেও বাক্যের দৈর্ঘ্য যে কী ভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব তার সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি লক্ষিত হয় দেবেন্দ্রনাথের রচনায়। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর রচনারীতির একটি বড় পার্থক্য এখানে। বোধ হয়, সমকালীন ও পূর্বকালীন বাংলা গদ্য-লেখকদের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের রচনার স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম সাংগঠনিক কারণও এটি। লক্ষ্য করা যাক দেবেন্দ্র-রচনায় সমাপিকা ক্রিয়ার কিরূপ বৈশিষ্ট্য আছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাক্য উদ্ধার করা হল নীচে।—

১. তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই সকলের উপরে আর কাহারও কার্য্য আছে, আর কাহারও প্রসন্নতা আবশ্যক আছে, যাহাতে আমরা ইচ্ছা সফল করিতে পারি।

২. তুমি বায়ুতেও আছ, তুমি শূন্যেতে আছ, তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ।

৩. যখন কাহারও জন্ম হইল, তখন অগ্নিতে হোম করিয়া জাতকর্ম্ম হইল, যখন মৃত্যু হইল, তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইল।

৪. ৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চির পরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র।

৫. তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না, জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে, তাঁহার করুণার পরিচয় লইব, বিদেশে, বিপদে, সংকটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।

সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ বাক্যবয়নের বিস্তৃতি ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রথমার্ধে অন্য কারো রচনায় বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। দেবেন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম স্বাতন্ত্র্য এইখানে। অবশ্য অক্ষয়কুমারের রচনায় যেমন অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে বাক্যবয়নে এক বিপুল ঐশ্বর্য সৃষ্ট

হয়েছে, দেবেন্দ্র-রচনায় অসমাপিকা ক্রিয়াঘটিত সেরূপ ঐশ্বর্য না থাকলেও অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিমিত ব্যবহারে, সঙ্গতিপূর্ণ সৌন্দর্য যে রচনায় সৃষ্ট হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারগুলি একারণে বিশেষ দ্রষ্টব্য। দেখা যাক—

১. ক. আমি ১৬ই বৈশাখের প্রাতঃকালে একটা ঝাঁপান লইয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

খ. আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম।

গ. তিন ঘণ্টা এরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম।

ঘ. পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘনপল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই।

২. ক. আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করিতে ব্যগ্র, তুমি ব্রাহ্ম উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ।

খ. বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক একজন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন, যে ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে।

গ. জ্ঞান যদি ধর্ম্ম-উপদেশে তুচ্ছ করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা হইলে যেরূপ বিষম অনিষ্ট উদ্ভূত হয়, সেরূপ ধর্ম্মও যদি জ্ঞানের সাহচর্য্য না লইয়া একাকী রাজত্ব করে, তাহা হইলে তাহা মলিন এবং হীনভাবাপন্ন হইয়া কুসংস্কার পাশে বদ্ধ হয়।

—সাম্বৎসরিক বক্তৃতা : পৃঃ ৪১।

ঘ. তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনই তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া অমনি তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে-ব্যথিত করিয়া তুলে। —পত্রাবলী : পৃঃ ১৬১।

৩. ক. মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যের অমৃতের সঙ্গে যোগ আছে।

—তদেব : পৃঃ ১০০।

খ. প্রথম অদ্যকার এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা দেখিয়া আমার মন আনন্দে প্লাবিত হইতেছে। —ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান : পৃঃ ১।

গ. পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

—ব্রাহ্মধর্ম্ম : ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ : পৃঃ ২।

ঘ. তাঁহার অভাবে আত্মা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া বিষাদসাগরে মগ্ন হয়।

—অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৪৮।

ঙ. আর্য্যেরা সেই প্রথম ঈশ্বরস্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে দেবতাসকল কল্পনা করিলেন। —তদেব : পৃঃ ৭৬।

প্রধানত এই তিন শ্রেণীর (১, ২, ৩) অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেবেন্দ্র-রচনায় লক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হল অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব ব্যবহারে কার্যের কাল (টাইম)-বিস্তৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য, একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্যের দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতি, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি একই ধাতুজ। যেমন কৃ, ক'রে, করিয়া, করিলে ('স্থলে' সহযোগে), তেমনি হইয়া, হইতে, হইলে, ঘুরে, ঘুরিতে, ঘুরিয়া প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য, একটি বাক্যে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

অক্ষয়কুমারের বাক্যবিস্তৃতির অন্যতম প্রধান উপাদানই হল অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার। বহুল সংখ্যক দীর্ঘ, কখনো অতি-দীর্ঘ বাক্যে বহুসংখ্যক ক্রিয়ার ব্যবহার তাঁর রচনায় লক্ষিত হয়েছে; কিন্তু দেবেন্দ্র-রচনায় অসমাপিকা ক্রিয়া যখনি ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণত তার দ্বারা দীর্ঘ কোন বাক্য গঠিত হয় নি। একটি বাক্যে একটি মাত্র অসমাপিকা ক্রিয়াতেও বাক্যগঠনের সুষমা-সৃষ্টি যে সম্ভব তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। দেবেন্দ্র-রচনায় অসমাপিকা ক্রিয়ার এই ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে দেবেন্দ্রনাথের বাক্যবয়নের নৈপুণ্যের সমর্থক। উনবিংশ শতকে দেবেন্দ্র-পূর্ব বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও যেমন, দেবেন্দ্রোত্তর বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও তেমনি দেবেন্দ্রনাথ এদিক থেকে সম্ভবত নিঃসঙ্গ শিল্পী।

বিশেষ্য, বিশেষণ, অসমাপিকা ক্রিয়া, বাক্যসংযোজক, প্রভৃতির দ্বারা বাক্যবয়নের যে কৌশল তার সব কটি উপাদানই দেবেন্দ্র-রচনায় লক্ষিত হয়, কিন্তু তার ব্যবহার সংযত ও সুষমিত। তাঁর যে কোন একটি রচনার যে কোন

একটি বাক্যের পূর্ণ বিশ্লেষণ থেকে এই তথ্যের সমর্থন মিলবে। নীচে একটি বাক্যের পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হল।—

আবার যখন দেখিলাম, উপনিষদে আছে যে, 'যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবী-লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি, বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়; সেই ব্রীহি যব তিল মাষাদি অন্ন যে-যে ভক্ষণ করে, সেই-সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে'—তখনি এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১২৫।

বাক্যটির ক্রম স্বাভাবিক বাংলা গদ্য-ভাষার 'কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া'—রূপের। কর্তা ('আমি' : উহ্য), কর্ম—'উপনিষদ···কল্পনা' পর্যন্ত, ক্রিয়া—'বোধ হইল।' বাক্যবিস্তৃতিতে 'কর্ম' (object) বাড়িয়ে বাড়িয়ে দীর্ঘ করার রীতি অনুসৃত হয়েছে। 'আবার যখন দেখিলাম' (যে, উহ্য)-র পরে বাক্যটি বয়ে চলেছে ক্রমাগত। সংযোজক শব্দ 'যাঁহারা···তাঁহারা', 'সে-যে', 'সেই-সেই' ও 'হইতে', 'হইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে, 'এবং' সংযোজক অব্যয় সাহায্যে, এক বিশেষ পদের পুনরাবৃত্তি করে (যেমন—কৃষ্ণপক্ষ, ধূম, রাত্রি, পিতৃলোক, চন্দ্রলোক, বায়ু, বাষ্প), কখনও পর পর পৃথক বিশেষ্য পদের ব্যবহার করে, (যেমন—ব্রীহি, যব, বনস্পতি, তিল, মাষ) বাক্যটির কর্মাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাক্যটির বয়নপদ্ধতি কোথাও এতটুকু শিথিল হয়ে পড়ে নি। দীর্ঘ বাক্যটি 'যখন দেখিলাম' দিয়ে আরম্ভ হয়ে 'তখনি···বোধ হইল'তে এসে যখন শেষ হয়েছে তখন বাক্যটির পূর্ণরূপ লক্ষিত হয়েছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে এত বড় বাক্যটিতে একটিও বিশেষণ দেবেন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এদিক থেকে অক্ষয়কুমারের লেখকস্বভাবের বড় পার্থক্য। বিশেষণবিহীন

একটি বাক্যও অক্ষয়কুমারের রচনায় বিরল-দৃষ্ট বিষয়। বাক্যমধ্যে শব্দের পুনরাবৃত্তি যেমন, ক্রিয়াপদের (সমাপিকা, অসমাপিকা উভয়ই) পুনরাবৃত্তিও তেমনি দেবেন্দ্র-রচনার বাক্যবয়ন-পদ্ধতির যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা পূর্বেই লক্ষিত হয়েছে।

'কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান', 'আলোকবর্ষণ', 'সর্ব্বলোক মহেশ্বর-অখিল বিধাতা,' 'ভোজন-পান বিধান', 'সুহৃদগণের আদি কোলাহল', 'পুত্রের মুখচন্দ্রমা', 'সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যের স্থান', 'প্রশান্ত হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব', প্রভৃতি পদগুচ্ছের (phrase) ব্যবহারেও বাক্যবয়নের বৈচিত্র্য দেবেন্দ্র-রচনায় লক্ষিত হয়। অক্ষয়কুমারের রচনায় যেমন অতি-দীর্ঘ পদগুচ্ছ দৃষ্ট হয়, দেবেন্দ্র-রচনায় কিন্তু সেরূপ দীর্ঘ, অতি-দীর্ঘ পদগুচ্ছ বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

বাক্যের দৈর্ঘ্য, দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর রচনার অন্যতম স্বাতন্ত্র্য-সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাক্যের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন, হার্বার্ট রীড্ বলেন—

> Other things being equal, a series of short sentences will convey an impression of speed, and are therefore suited to the narration of action or historical events; whilst longer sentences give an air of solemnity and deliberation to writing.[১২]

দেবেন্দ্র-রচনায় বাক্যের দৈর্ঘ্য কিন্তু সর্বদাই এরূপ একটি নিয়ম মেনে চলে নি। বর্ণনামূলক বিষয়, ঐতিহাসিক বস্তু বা উপলব্ধির নিবিড়তায় লেখা ধর্ম্মমূলক কোন বস্তু, বিষয় বা সাহিত্যমূলক রচনা, যাই হ'ক না কেন, সাধারণত দেবেন্দ্রনাথের বাক্যগুলি মাঝারি এবং ছোট।[১৩] দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার খুব কম। যেমন—

ছোট বাক্য

১. ঈশ্বর আত্মার প্রাণ। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৪৮।

২. আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৯।

৩. ভারি একটা যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছে। —তদেব : পৃঃ ৯৫।

৪. এই পৃথিবী একটা সুপ্রকাণ্ড বেলুনযন্ত্র। —জ্ঞান ও ধর্ম্ম : পৃঃ ৭।

৫. তিনি সকল দেশেতে সমানরূপে বিদ্যমান।

—ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান : পৃঃ ৭৬।

মাঝারি বাক্য

ক. যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

—আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪৩।

খ. প্রথমে দেখ, আর্য্যদের মধ্যে কেমন ঈশ্বরস্পৃহা আসিল, তাহার পরে সেই স্পৃহা কেমন স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কেমন কার্য্য করিতে লাগিল।

—জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি : পৃঃ ৭২।

গ. ধর্ম্ম জ্ঞানের সহায় হইলে জ্ঞান যেমন, ভূষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও ধর্ম্মের সহায় হইলে ধর্ম্ম উজ্জ্বল হয়। —সাম্বৎসরিক বক্তৃতা : পৃঃ ৪১।

বড় বাক্য

ক. এই উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৩৬।

খ. জ্ঞান-সূর্য্য উদয় না হইলে যেরূপ কোন জাতি মহত্ত্বের শিখরে অধিরূঢ় হইতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে অতি অল্পকালের মধ্যে জনসমাজের প্রলয় দশা উপস্থিত হয়। —সাম্বৎসরিক বক্তৃতা : পৃঃ ৪১।

গ. রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা, কিন্তু যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্ত বাক্য করিয়া না মানিবে তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই।

—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত : পৃঃ ২৬।

অক্ষয়কুমারের রচনায় অনেক স্থলে যেমন অতি-দীর্ঘ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, দেবেন্দ্র-রচনায় সেরূপ অতি-দীর্ঘ বাক্য রচিত হয় নি বললেই চলে। ২০

থেকে ৪০ বা ৪৫টি শব্দের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ বাক্যগুলি সাধারণত সমাপ্ত। আর সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ছোট বাক্য। কিন্তু বাক্যের দৈর্ঘ্য যাই হক না কেন, বাক্যগুলির গঠনক্রমে বিশেষ পার্থক্য তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ছোট বাক্য-গুলি তো সবই প্রায় ৬ষ্ঠী বিভক্তি, কর্ম ও ক্রিয়া এই সজ্জায় লিখিত হয়েছে। যেমন—

১. আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২. ……যুদ্ধের পরামর্শ।

৩. ঈশ্বর আত্মার প্রাণ।

বাক্যবিস্তৃতির কারণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন দেখতে পাওয়া যাবে, দেবেন্দ্র-রচনায় এই বিস্তৃত বাক্যগুলিতে লেখক কি কৌশলে বক্তব্যের জন্য পর্বে পর্বে কেমন কৌতূহল জমিয়ে রেখেছেন, কেমনভাবে বাক্যের বিস্তৃতিতে ভাবের সমুন্নতি ও ঘটনার পরম্পরা সৃষ্টি করেছেন, কেমন অনুজ্ঞার ব্যবহারে বাক্যের বিস্তৃতি-বিন্যাস সম্ভাবিত করেছেন, কি অপূর্ব নির্মাণকৌশলে সমাপিকা ক্রিয়া, বা প্রাণীবাচক, মধ্যম পুরুষ বা কখনো কখনো উত্তম পুরুষের ব্যবহারে বাক্যের বিস্তৃতিতে বক্তব্যের পূর্ণতা এনেছেন।

বক্তব্যকে সরাসরি প্রকাশ না করে, ক্রিয়াপদের (সমাপিকা, অসমাপিকা) ব্যবহার করে বাক্যের দৈর্ঘ্য বিস্তৃত রেখে পরিশেষে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার 'পিরিওডিক্'—নির্মাণনৈপুণ্য দেবেন্দ্র-রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

> যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করে নাই, যে তাহা হইতে চিরদিন বঞ্চিত রহিল—যে তাঁহাকে প্রীতির দ্বারা পূজা না করিয়া, ইচ্ছা পূর্বক তাঁর কার্য্য সম্পাদন করিয়া, বিষয়সেবাতেই জীবনকে ক্ষয় করিল, ধিক্ তার সেই জীবন। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৪৯।

'যে·· তার' প্যাটার্নের এই বাক্যটিতে 'করে', 'করিয়া', 'পূর্বক', 'করিয়া' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্যের বক্তব্য বিষয়কে পাঠকের চাঞ্চল্য বজায় রেখে বাক্যটির প্রায় শেষে তার শব্দের কর্ম 'সেই জীবন'কে 'ধিক্'-কার জানানোতে সে চাঞ্চল্য, সেই 'কৌতূহল' নিবৃত্তি হয়েছে। অক্ষয়কুমারের বহু বড় বড় বাক্যের তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এই ধরনের বাক্য অনেক ছোট সত্য, কিন্তু 'Periodic sense'[১৪] বাক্যটিতে কম নয় একটুও।

বাক্যটির গঠনপদ্ধতিতে আরও একটি বিষয় লক্ষিত হয় যে, অবিমিশ্র অসমাপিকা ক্রিয়ার ঘাটে ঘাটে বাক্যটির বিস্তৃতি ঘটে নি। বিস্তৃতির জন্য একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারও হয়েছে। যেমন, 'করে নাই' 'রহিল' 'ক্ষয় করিল'।

অবিমিশ্র সমাপিকা ক্রিয়াতে কিন্তু দেবেন্দ্র-রচনায় বাক্যবিস্তৃতি আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন—

১. আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। —আত্মজীবনী : পৃঃ ৫১।

২. নির্জ্জনে একাকী তাঁহার মহদ্ভাব জাজ্বল্য প্রভাব অনুভব করিতেছি; ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার গুণগান করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে সখাকে ডাকিতেছি; ইহাতে আমার সকল কামনা শেষ হইল। —আত্মজীবনী : পৃঃ ৫৫।

৩. যে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ আমাদের পূজা গ্রহণের নিমিত্ত এখনই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ৫৫।

১নং বাক্যটিতে প্রকৃতপক্ষে চারটি স্বতন্ত্র বাক্য আছে। তিনটি বাক্যের ক্রিয়া কৃ> করি। এবং একটি শুধু ভূ > হও, উহ্য। ২নং বাক্যটিতে 'ইতেছি' রূপের তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়ায়, এবং 'ইল' রূপের একটি সমাপিকা ক্রিয়ায় চারটি স্বতন্ত্র বাক্য বিন্যস্ত হয়েছে। ৩নং বাক্যটিতে 'যে…তিনি' রূপের বাক্যটিতে দ্বিতীয় অংশে সাতটি স্বতন্ত্র বাক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই সাতটির কোনটিতেই কিন্তু 'ক্রিয়া' ব্যবহৃত হয় নি, উহ্য রয়েছে। খুব স্বভাবতই এখন প্রশ্ন জাগে, এতগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য কেন একত্রে একটি বাক্যে বিন্যস্ত হল? কেন স্বতন্ত্র বাক্য নির্মিত হল না? স্বতন্ত্র বাক্য নির্মিত হলে কি হত? অনেকগুলি ছোট ছোট বাক্য লিখিত হত। কিন্তু বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বাক্য, বা দীর্ঘ বাক্য, বা যে ধরনেরই বাক্য হক্ না কেন, একসঙ্গে পর পর ব্যবহৃত হলে রচনার সুষ্ঠু রূপ, সুষমা আহত হয়। অন্যদিকে—

Other things being equal, a series of short sentences will

convey an impression of speed, and are therefore suited to the narration of action or historical events ;

—Read, Herbert, *Op. cit.*, 35.

অতএব দেবেন্দ্র-রচনায় এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্যমালায় গঠিত বাক্যগুলিতেও বক্তব্য যে স্পষ্টতর হয়েছে সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই, বলা চলে। বিশেষত 'Narration of action' প্রকাশ করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের রচনানৈপুণ্য যে সার্থকতার প্রমাণ রেখেছে তা দেবেন্দ্র-সমসাময়িক উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যধারায় অতি দুর্লভ চিহ্ন। দুটি উদাহরণই এ তথ্যের যথেষ্ট প্রমাণ। যেমন—

১, তখন সূর্য্য অস্ত গেল ; মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল ; পিনিস থামিল কিনা, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।

—আত্মজীবনী : পৃ: ৭২।

২. দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল ; সমস্ত নৌকার খোল জলে পূরিয়া গিয়া তাহার উপরে একহাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে ; সকলই বৃষ্টির জল ; আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতেও পারি নাই।

—আত্মজীবনী : পৃ: ৭৪।

বাক্যে অনুজ্ঞা ব্যবহার অক্ষয়কুমারের রচনাতেও লক্ষিত হয়েছে। দেবেন্দ্র-রচনায় সেই অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের ভাব-সমুন্নতি (ক্রিসেণ্ডো) কিভাবে গঠিত হয়েছে দেখা যেতে পারে।—

ক. তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক, দ্যুলোক, ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক, পিতা তোমার মধুময় মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করুন !

—জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি : পৃ: ১৩০।

অথবা

খ. যাঁহার নাম নাই, ধাম নাই, রূপ নাই, যিনি সকল সত্যের মূল সত্য, সকল মঙ্গলের মূলাধার, সকল সৌন্দর্য্যের মূল আকর, তাহাতে একাগ্রতা হউক, ভক্তি হউক এবং এই নাম-রূপময় সংসারের তাবৎ কার্য্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হউক। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃ: ৯৮

অথবা

এ বাড়ীর দরজা নাই, পর্দা নাই, আবরণ নাই, হিম পড়িতেছে।

—আত্মজীবনী : পৃঃ ১৭৭।

'নাই' বা 'না' অব্যয় সহযোগে বাক্যের ভাবের সমুন্নতি সৃষ্টি করাও দেবেন্দ্র-রচনার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে পিতার এই রচনা-নৈপুণ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল। দেবেন্দ্র-রচনায় 'নাই' বা 'না' অব্যয়ের ব্যবহারের উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত খ-সংখ্যক বাক্যটি, এবং নীচের বাক্যগুলি।—

ক. সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তরের ; একটি তৃণ নাই ; না ফুল আছে, না ফল আছে, কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। —আত্মজীবনী : পৃঃ ৮০।

খ. তিনি আপনি কিছুই হন নাই ; তিনি জড় জগৎও হন নাই, বৃক্ষলতাও হন নাই, পশুপক্ষীও হন নাই, মনুষ্যও হন নাই ; ইহাতে অবতারবাদ নিরস্ত হইল। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪০।

বাক্যবৈচিত্র্য দেবেন্দ্র-রচনায় যত বেশী অক্ষয়কুমারের রচনায় তত বেশী নয়। ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন-ভিন্ন কার্যপরম্পরা-সৃষ্টি দেবেন্দ্র-রচনায় বাক্যবৈচিত্র্য-সৃষ্টির কেমন সহায়ক হয়েছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন—

এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান স্রোত, ভঙ্গুর প্রাসাদ, ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান্ ধাতুর রাশি, আমাদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে ; আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি।[১৫]

বাক্যটির পৃথক পৃথক বস্তু, অর্থাৎ 'অস্থায়ী পুষ্প···ধাতুর রাশি' পৃথক পৃথক কার্যের পরম্পরা, অর্থাৎ 'প্রতীতি হয়···জ্ঞান করি', সৃষ্টি করেছে। বাক্যে 'আছ' ধাতুর ব্যবহারে মধ্যমপুরুষের সম্বন্ধনে কেমন করে বাঙ্‌নির্মিতির সুষমা সৃষ্টি সম্ভব, তার প্রমাণ—

'তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ; তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ।[১৬]

২

দেবেন্দ্র-রচনার বাক্যগঠনের সাধারণ স্বভাব ও তার বৈচিত্র্য নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে, আলোচনার ফলশ্রুতি-স্বরূপ তাঁর যে-কোন রচনার যে-কোন একটি বাক্যের পূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেবেন্দ্র-

রচনার বাক্যগুলির আলঙ্কারিক আবেদনও আলোচনা করা যেতে পারে। নীচে একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল।—

> তোমার নিকটে একাগ্রচিত্তে এই প্রার্থনা যে, তুমি আমারদিগকে যে সকল মহৎ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন আমরা মোহান্ধ হইয়া অবহেলা না করি, তুমি আমারদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তাহা যেন নিরর্থক না যায়, তাহাতে যেন তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি, আমারদের দেহ-মনের সকল শক্তি তোমারই, তাহা যেন তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি, তোমার অমৃত রস পান করিতে করিতে, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে দেখিতে যেন আমারদের জীবন অবসান হয়।[১৭]

বাক্যটি ক্রমে স্বাভাবিক (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া—রূপের), কিন্তু প্রকাশে জটিল। অর্থাৎ, কর্তা 'আমি' উহ্য শুধু নয়, কর্তার কর্ম (object) 'আমার' এখানে কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেই 'আমার' কর্তাটি উহ্য। তারপর কর্ম, অর্থাৎ 'প্রার্থনা' 'তুমি···জীবন' ঠিকই ব্যবহৃত হয়েছে। পরিশেষে, ক্রিয়া (Verb) 'অবসান হয়'ও স্বাভাবিকক্রম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অর্থাৎ, S. O. V. বা কর্তা/কর্ম/ক্রিয়ার রূপ রক্ষিতই হয়েছে। 'যে-তাহা', ও 'তাহা যেন' রূপে বাক্যটির বিস্তৃতি ঘটেছে। 'করিতে করিতে' 'দেখিতে দেখিতে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াও যেমন, 'করি' 'করিয়াছ' 'পারি' এবং 'হয়' প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারও তেমনি বাক্যবিস্তৃতিতে সাহায্য করেছে, ভাবের সমুন্নতি, ঘটনার পরম্পরা সৃষ্টি করেছে।

বাক্যটি শ্রুতিমধুরও। 'কারণ' বাক্যটির বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটিতব্য। সমালোচক, Sir W. Raleigh মন্তব্য করেছিলেন—

> The structure of the sentences is based on antithesis and alliteration or cross-alliteration, almost every sentence being balanced in two or more parisonic parts, clinging in sound, changing in sense.

মন্তব্যটির মধ্যে যথেষ্ট মূল্য আছে। বড় বেশী মূল্য দেবেন্দ্র-রচনার ক্ষেত্রে। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনায় যে শ্রুতিমাধুর্য তার অন্যতম প্রধান কারণ লেখকের ভাষণকলানির্ভর রচনা। ঊনবিংশ শতকের গদ্যলেখকদের মধ্যে

দেবেন্দ্রনাথ, এবং দেবেন্দ্র-মণ্ডলীতে বর্ধিত অন্যান্য গদ্যলেখকগণ, অর্থাৎ 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ও 'পত্রিকা'র অধিকাংশ গদ্যলেখকগণ তাঁদের রচনা পত্র-পত্রিকায়, বই-পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে প্রকাশ্য সভায় তা পাঠ করার জন্য প্রস্তুত করতেন। অধিকাংশের অধিকাংশ রচনাই এইভাবে বক্তৃতারূপে রচিত হত, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা ব্রাহ্মধর্মের কোন সভাতে, বা উৎসবে পঠিত হত। দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র 'আত্মজীবনী' (১৮৯৬) এবং তারিখ-বিহীন প্রকাশিত পত্রগুচ্ছের সংকলন 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী', গ্রন্থ দুটি ব্যতীত অন্য সমস্ত রচনাই এই বক্তৃতা বা উপদেশের উদ্দেশ্যে রচিত, এবং পঠিত। যে ভাষা কেবল লিখিতই হয়, সশব্দ উচ্চারণে পঠিত হয় না, সে ভাষার লিপিসৌন্দর্য থাকলেও তার রচনাশৈলীর সামগ্রিক রসমূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। কারণ, ভাষার শব্দ এবং অর্থ দুইই ভাষার সুষমার কারণ।—

Literature was for more largely spoken or read aloud.[১৮]

ভাষণার্থে রচিত লেখার জন্য ভাষক, তথা লেখকের যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা সাধারণ লেখকদের সতর্কতার স্বভাব থেকে স্বতন্ত্র। প্রধানত তিনটি উপায়ে দেবেন্দ্র-রচনার বাক্যগুলির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়েছে।—

১. অনুপ্রাসে, ২. শব্দনির্বাচনের নূতনত্বে, এবং ৩. শব্দজনিত ছন্দবোধ-সৃষ্টিতে।

অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারে গদ্যের শ্রুতিমাধুর্য-সৃষ্টি ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য-ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অক্ষয়কুমারের গদ্যতেও অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের রচনার কয়েকটি বাক্য নিয়ে বিষয়টির পূর্ণ বিচার করা যেতে পারে।—

১. কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৮৭।

২. অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত,··· যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত।—তদেব : পৃঃ ১৮৭।

৩. হে বিশ্ববিধাতা জগৎ-পিতা। তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে,

আবার তোমারি প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি : পৃঃ ১২৪।

উদ্ধৃত তিনটি বাক্যই অনুপ্রাসে অনুরণিত। চিত্র/বিচিত্র/দীর্ঘ/পুচ্ছ/সূর্যকিরণে/রঞ্জিত/মৃত্তিকাতে/লুটাইতে/

আফিমের/শ্বেত/পীত/লোহিত/ফুল/সকল/শিশির/জলের/অশ্রুপাত/সুমধুর/সঙ্গীত/স্বর/সঞ্চরণ,

অথবা,

বিশ্ববিধাতা/জগৎপিতা/বায়ু/বহন/প্রসাদে/বনস্পতি/ওষধি/সকল,

প্রভৃতি শব্দের এবং ধ্বনির অনুপ্রাসজনিত যে শব্দসঙ্গীত বাক্যগুলিতে সৃষ্টি করেছে তা যে কোন পাঠকই উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু কেবল অনুপ্রাসের জন্যই এই সঙ্গীতময়তার সৃষ্টি হয় নি। লেখকের বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্বাচনের জন্যও এই সঙ্গীতময়তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। যেমন—

ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল, উদ্যানভূমি, স্বয়ম্ভূ-নিরঞ্জন, লেবুফুলের গন্ধ, সুগন্ধের হিল্লোল, বাসার সংলগ্ন জলাশয়, নিঃশব্দ নিস্তব্ধ, শিশিরে সিক্ত, সর্ব্বভুক লোলুপ অগ্নি, উৎসব রজনীর অবশিষ্ট দীপালোক,

—আত্মজীবনী।

দ্যুলোক, ভূলোক, ঈশ্বরস্পৃহা, যুগযুগান্তর, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়,

—অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

শ্রীসৌন্দর্যবিধান, তিমিরাবৃত, আলোকময় পৃথিবী, বিশ্ববিধান, প্রেমময় মঙ্গলপুরুষ,

—ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সমস্ত নির্বাচিত শব্দগুলি শব্দ-সাযুজ্যে নূতন। এবং প্রায় প্রতিটি শব্দই ল. ম. ন. ণ. শ.র. স. ষ প্রভৃতি বর্ণে গঠিত। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ধ্বনিগুলির একটি সঙ্গীতময়তা আছে। এই সঙ্গীতময় ধ্বনিপুঞ্জে গঠিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছে সজ্জিত বাক্যগুলিও তাই দেবেন্দ্র-রচনার সৌন্দর্য ও শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

এবং এই অনুপ্রাসে, সঙ্গীতময়ধ্বনি-সংগঠিত শব্দের সুনিপুণ সজ্জায় বাক্যগুলির ভাষাসুষমা আরও সুষ্ঠু হয়েছে বলা চলে। আমরা অক্ষয়কুমারের ভাষার সৌন্দর্য ও তার বৈচিত্র্য আলোচনা-প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের ছন্দ সম্পর্কে যে মন্তব্য

প্রকাশ করেছি, দেবেন্দ্রনাথের রচনার ক্ষেত্রে সে মন্তব্য আরও অধিকতর সত্য। কবিতার ছন্দ-সৃষ্টি আর গদ্যের ছন্দবোধ জাগানো এক নয়।—

> Alliteration and rhyme emphasize the words the poet wants to emphasize.[১৯]

কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে ?—

> In prose the rhythmic pattern is much less marked. Rhyme and metre are not used, though alliteration frequently is, but rhythm is present to a greater or lesser degree.

গদ্যের এই ছন্দস্পন্দ গড়ে ওঠে কিভাবে ?—

> Prose rhythm does not trip along in metrical feet, as verse does, but sweeps on in longer units.[২০]

তবে,

> Prose rhythm is a matter of Emphasis; it is putting the important words where they sound important. It is a matter of coherence; it is putting the right idea in the right place.[২১]

বলা বাহুল্য, এই ছন্দোবন্ধ গদ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে প্রতিভাসিত। যদিও তার কোন পরিমাপ বা সুনিয়মিততা নেই। প্রকৃতপক্ষে তাই, অনিয়মই গদ্যের ছন্দস্পন্দ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন—

> এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যের এই 'শিল্প'ই গদ্যের ছন্দ। তা রচনার বাক্যবিন্যাসে, শব্দনির্বাচনে, যতিতে, বিরতিতেও লক্ষণীয়। বাক্যগুলির শব্দসুন্দর ছন্দস্পন্দের কারণ তাহলে এক মিশ্রিত ছন্দ-দোলা, বহু উপকরণে সজ্জিত এক সৌন্দর্যবোধ। যুগ্ম, যুক্ত ব্যঞ্জনও যেমন, স্বর ও স্বরের সঙ্গতি, ধ্বনি, ও ধ্বনির তরঙ্গও তেমনি এই ছন্দের উপকরণ। রুদ্ধ ও মুক্ত দলও যেমন, তেমনি প্রয়োজন উচ্চারণ-বিরতির চিহ্নেরও।—

> গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি মাধুর্য, অতি লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটি সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়।[২২]

একটা সামুদ্রিক তরঙ্গের মত। বাক্যগুলির শব্দ, যতি ও তাদের বিন্যাসে তার স্পন্দন। ভাষা-সুষমা সম্পর্কে এইজন্যে বলা হয়—

> Prose should not be wholly prosaic ; for that would be dry : nor metrical ; for that would be too obvious. It should contain a mixture of metrical forms, especially iambic and trochaic.[২৩]

এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত দেবেন্দ্র-রচনার বাক্যগুলির ছন্দ এই উত্থান-পতনজনিত ভাষার স্পন্দনের মধ্যে ; শব্দসজ্জায়, শব্দগুচ্ছে, সঙ্গীতবর্ণ-গঠিত শব্দেও যেমন, তেমনি এই ছন্দস্পন্দ বাক্যগুলির উচ্চারণগত ধ্বনি-প্রবাহেও। উচ্চারণের জন্য যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা চলে তা দ্রুত একটানা কতকগুলি বাক্য পাঠ করতে বা দীর্ঘ বাক্য বা বাক্যাংশের পাঠে খুব সহজেই বোঝা যায়। একটানা পড়তে হলে বহুক্ষণ শ্বাস-ধারণের প্রয়োজনও হয়, এবং এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বোঝা যায় যে, উচ্চারণ করে কোন কিছু পাঠ করতে হলে পাঠকের শ্বাস-প্রশ্বাসের তাল-লয়ের নিয়মিত একটা ওঠানামা চলতে থাকে। উচ্চারণের বিরতি তথা রচনার যতিচিহ্ন এই জন্যেই একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। 'গতি আর যতি' কবিতার ছন্দনিয়ামক, গদ্যেরও। তবে, গদ্যের একমাত্র বিবেচ্য বস্তু নয়। পূর্বে-আলোচিত ও বিশ্লেষিত বিষয়গুলি এ প্রসঙ্গে ধর্তব্য। ১নং বাক্যটিতে উচ্চারণের বিরতি ও গতি বিচার করলে নিম্নমত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়।—

১ নং বাক্যের উচ্চারণ বিশ্লেষণ

কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের

০ ● ● ০ ✓ ০ ╲ ╱ ০ ০ — ০ ০ ০ ০ — ০ — ০ — ০ —

এক তলায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্য কিরণে

╱ ০ — ০ ০ ╲ ╱ ০ ০ ╲ ╱ ০ ০ — ╱ ০ — ০ — ০ ০ ০ ০

রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।

╱ ০ ০ ╱ — ╱ — — — ০ ╱ ০ ০ ০ ╲

এই বিশ্লেষণ একটি বাক্যের ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার ক্ষেত্রেই এই বিশ্লেষণপদ্ধতিই গ্রাহ্য হতে পারে। এবং এই ভাবেই গড়ে উঠেছে, দেবেন্দ্রনাথের বাক্যের তথা তাঁর রচনার সঙ্গীত। দেবেন্দ্রনাথের রচনার উচ্চারণ-বিশ্লেষণ তাঁর রচনার পূর্ণ আস্বাদনে অপরিহার্য, কারণ তাঁর অধিকাংশ রচনাই সশব্দে উচ্চারিত হত, বক্তৃতার জন্য লিখিত হত, সেগুলি বক্তৃতা করা হত।[২৪] 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য-লেখকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের রচনা সর্বতোভাবে ভাষণাকারে সবচেয়ে বেশী লিখিত ও পঠিত হত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী'র মধ্যমণি ছিলেন। মনে রাখা দরকার, উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম নিয়ে তাঁকে বহু ভাষণ প্রস্তুত ও তার প্রচার করতে হত। বোধ হয় এই জন্যেই তাঁর রচনাগুলি প্রধানত ধর্মসংক্রান্ত হয়েও গদ্যের ছন্দে গাথা, সেগুলি ধর্মীয় সাহিত্য। এই ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গীতময়তা তাঁর অনুচ্ছেদগুলিতে, তাঁর পরিচ্ছেদগুলিতে, তাঁর সকল রচনার মধ্যে।

অনুচ্ছেদ

ভাষার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা এবং অনুচ্ছেদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বাংলা সাহিত্যে তার ব্যবহারের পূর্ণ ইতিহাস অক্ষয়কুমারের ভাষায় ব্যবহৃত অনুচ্ছেদগুলির আলোচনার সময় বিবৃত হয়েছে। দেবেন্দ্র-রচনায় অনুচ্ছেদগুলির কি বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারের দিক থেকে তাতে কোন নূতন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে এবার।

দেবেন্দ্র-রচনা যে একান্ত করেই ভাষণকলানির্ভর তা তাঁর বাক্য-বিচারের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা হয়েছে। উচ্চারণের যতি আর গতিতে তাঁর বাক্যগুলির সুষমা সৃষ্ট হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলিতেও তাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের থামা আর চলার গতিতে পঠনের যতি আর গতি নিয়ন্ত্রিত করেছে অনুচ্ছেদ। এদিক থেকে হার্বার্ট রীড ঠিকই বলেছেন যে—

> The paragraph is a device of punctuation. The indentation by which it is marked implies no more than an additional breathing space.[২৫]

এবং এই যতিচিহ্নের প্রকারভেদ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রসারিত স্থানস্বরূপ

যে অনুচ্ছেদ তা যুক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যই হক্, আর রূপগত প্রয়োজনেই হক্, অথবা একটা ছন্দদোলা জাগানোর জন্যই হক্ গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছে উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে, 'তত্ত্ববোধিনী'র (১৮৪৩) পৃষ্ঠায়। দেবেন্দ্র-রচনার অনুচ্ছেদ-বিচার এইজন্য কেবল আবশ্যক নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। কারণ দেবেন্দ্রনাথ প্রথমত বক্তা, পরে লেখক ; তাঁর লিখিত রচনাও ভাষণাকারে প্রস্তুত। এবং আমরা জানি—

> In public speaking it is customary for the orator to make a pause and indulge in various gestures of physical relaxation when he has come to a point where he expects applause. The moment, at least, is propitious for it. Or his reason may be that he wishes to give special emphasis to his next sentence by making it the first sentence of a proportion.[২৬]

বোঝা যাচ্ছে, ভাষণকলানির্ভর রচনার অনুচ্ছেদ-রচনাও অন্যতর নির্মাণ-কৌশলে পুষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের রচনার অনুচ্ছেদগুলি ভাষণকলাসম্মত। অতএব তার বিশ্লেষণও অন্য রীতির। আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ দেবেন্দ্রনাথের রচনা থেকে তুলছি।—

১. আবার, তিনি 'অনন্তরমবাহ্যং', 'নিত্য মেবাত্মসংস্থং'। তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও, আপনাতে আপনি আছেন, এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম মঙ্গলে, সকলে উন্নত হউক। তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতং'।

সাধকদিগের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে—অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন, এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।[২৭]

এই অনুচ্ছেদটির আরম্ভের পূর্বে, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটির শেষ পংক্তিটি হল—'সেই জন্ম-বিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন'।

২. যখন দেশ ছিল না, তখন অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ আপনার জ্ঞানে, প্রেমে, মঙ্গলভাবে পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই অনন্তজ্ঞানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহা তিনি আপনি নিত্যই জানিতেছিলেন।

সেই মঙ্গল ইচ্ছা কি, না, তাঁহার সৃষ্টিতে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক। ঈশ্বর তাঁহার এই মঙ্গল ইচ্ছা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক।[২৮ক]

৩. তিনি তাঁহার শক্তি এই অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিলেন। সেই শক্তি নীহারিকা (Ether)। তিনি সেই নীহারিকা বিকম্পিত করিয়া দিলেন, আর তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের অগোচর নীহারিকা প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল। তাহার জ্যোতিতে সমুদায় আকাশ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কেহ থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, যে কেমন আশ্চর্য রকমে চারিদিকে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্য জানিতেছিলেন।[২৮খ]

অনুচ্ছেদ তিনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ১ নং অনুচ্ছেদটি যেখানে আরম্ভ হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে (অর্থাৎ, 'আবার'…'শিবমদ্বৈতং') সেখানে আরম্ভ না হয়ে, ওখানে শেষ না হলেও কোন ক্ষতি হত না। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পৃথক একটি ভাবনা, বা বক্তব্য চিন্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হওয়ার যে ভাষাতাত্ত্বিক রূপের (Form) কথা বলা হয়,[২৯] এখানে সে রূপ রক্ষিত হলেও সে রূপের কারণ রক্ষিত হয় নি। অনুচ্ছেদটি যেখানে আরম্ভ হয়েছে তার পূর্বেকার অনুচ্ছেদটি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এই দুটি অনুচ্ছেদের বক্তব্যই এক এবং একই চিন্তার শৃঙ্খলে বিধৃত। উভয় ক্ষেত্রেই পরব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'অন্তরে' এবং 'বাহিরে' উভয় ক্ষেত্রে ব্রহ্মের অস্তিত্ব যদি পৃথক অনুচ্ছেদে বর্ণনা করতে হয়, তাহলে 'জ্ঞানে' ও 'ধর্ম্মে' ও ব্রহ্মের বিকাশ সম্পর্কে যে কথা এক সংখ্যক অনুচ্ছেদে 'অন্তরে' ও 'বাহিরে' ব্রহ্মের বর্ণনার সঙ্গে একত্রে বর্ণিত হয়েছে তা বর্ণনা না করে পৃথক দুটি অনুচ্ছেদ রচনার আবশ্যক হত। তা হয় নি। পরন্তু পরবর্তী নূতন যে আর একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে ('সাধকদিগের…দেখিবেন') তাতেও এই একই বক্তব্যের প্রসার লক্ষিত হয় মাত্র। কিন্তু রূপের এই অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও রচনাংশটি পাঠে কোন বাধা জন্মায় না। সহজেই পড়া চলে। পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সব রচনার সব কটি অনুচ্ছেদই এক

সংখ্যক অনুচ্ছেদের স্বভাবানুযায়ী রচিত হয় নি, বৈচিত্র্য আছে। কোথাও কোথাও সে বৈচিত্র্য বিপুল। যেমন, দুই সংখ্যক অনুচ্ছেদটি এবং তিন সংখ্যক অনুচ্ছেদটি। দু'টি অনুচ্ছেদ কেবল রূপজ অর্থে স্বতন্ত্র নয়, দু'টির বক্তব্য বিষয় এক হয়েও পৃথক, অর্থাৎ সমগ্র রচনার মূল বক্তব্য-ধারা পরম-পিতার বিশ্বভরা শক্তিমহিমা যে জ্ঞানধর্মের অতীত নয়, সেটিও যেমন প্রস্ফুটিত তেমনি দুই সংখ্যক অনুচ্ছেদের বক্তব্য ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার ব্যাপ্তি-বর্ণনা এবং জ্ঞানের সাহায্যে সেই ব্যাপ্ত ধর্মের স্বরূপ-ঘোষণাও পরিস্ফুট; কিন্তু তিন সংখ্যক অনুচ্ছেদে এই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার নাম ('নীহারিকা' বা 'Ether') ঘোষিত হয়েছে এবং সেই শক্তির দ্বারা সংগঠিত কার্যাদির বর্ণনা উদাহরণ-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে দুই সংখ্যক দুই সংখ্যকই থাকছে, তিন সংখ্যক তিন সংখ্যকই থাকছে ; দুটি অনুচ্ছেদ পৃথক, বক্তব্য-ধারায় কিন্তু ধারাছাড়া নয়—পরমপিতার বিশ্বভরা মহিমা-বিষয়ক এক মূল বক্তব্যধারার দুটি সূত্র-শৃঙ্খলা মাত্র। পড়তে কিন্তু এ দু'টি অনুচ্ছেদও ভাল লাগে। কিন্তু এক-সংখ্যক অনুচ্ছেদটি, দুই ও তিন সংখ্যক অনুচ্ছেদ অপেক্ষা আকৃতিতে ছোটও।

কিন্তু স্বভাবে ও রূপে এত পার্থক্য থাকার, তাহলে, কি কারণ থাকতে পারে ? অনুচ্ছেদের আকৃতি কত বড় হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। তবে রচনার সুষমা পাঠকের চিত্ত, মন-নির্ভর বলে লেখককে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী অনুচ্ছেদ-রচনার স্বাধীনতাও যেমন মেনে চলতে হয়, তেমনি পাঠক-মনের প্রতিও আস্থাশীল হতে হয়। এ সম্পর্কে Lucas একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। Lucas বলেন—

> Paragraphs, too, like sentences, can cause obscurity by being overloaded or overlong. But whereas a long sentence, if well built, may have a certain dignity, few readers are likely to seek or find, any particular dignity in a long paragraph. Indeed, paragraphs at least in prose, seem usually things of convenience rather than of beauty.[৩০]

শুধু তাই নয়, অনুচ্ছেদ ছোটই হক বড়ই হক যেখানে অনুচ্ছেদটি শেষ হচ্ছে সেখানে—

> ...at each paragraph-end the reader can draw breath for an

instant, and rest. The essential is that he should also feel it a rational place to rest—that the paragraph, in other words, should seem a unity. The considerate writer will not make such rests too rare.[৩১]

দেবেন্দ্রনাথের অনুচ্ছেদগুলিতে রূপ যতটা তার চেয়ে সহজভাব বেশী। Convenience যত, beauty তত নয়। কিন্তু অনুচ্ছেদের শেষে পাঠক মুহূর্তের বিরতিতে যেখানে নিশ্বাস নেয়, সেখানে প্রয়োজনের তৃপ্তিও পায়। অপ্রয়োজন অতৃপ্তিতে শেষ হয়েছে, এমন অনুচ্ছেদ দেবেন্দ্র-রচনায় বড় দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য—নেই বললেই চলে। উল্লিখিত তিনটি অনুচ্ছেদই তার প্রমাণ।

কিন্তু এই রচনা-সুষমা যে অনেক ক্ষেত্রেই অনুচ্ছেদ-রচনার ব্যাকরণ মেনে সৃষ্ট হয় নি, তারও প্রমাণ আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। তার কারণ কি? রচনার সুষমা কি ভাষার ব্যাকরণ-বিদ্রোহেই বেশী? শব্দসম্পদ প্রসঙ্গে 'বাক্যবিন্যাস' অধ্যায়ে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, শক্তিমান লেখক ভাষার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙ্গে নূতনত্ব সৃষ্টি করতে পারেন, তাতে তাঁর রচনার ঐশ্বর্য বাড়ে। অনুচ্ছেদের ব্যাকরণ-বিদ্রোহে দেবেন্দ্র-রচনাতেও সেই স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন লেখকের রচনাশক্তিই প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এই ভাষা-সজ্জায় ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ ভেঙ্গে গদ্যে যে রচনার সৌন্দর্যসৃষ্টি করা হয়, তারই প্রতি সহানুভূতি রেখে, অনুচ্ছেদ-রচনার ব্যাকরণবিধির বিরুদ্ধে হার্বার্ট রীডও মন্তব্য করেছেন—

It is nearer the truth to say that a writer seizes upon some particular aspect of his subject and holds that aspect in his mind until he has seen it in all profitable lights. This process may take two or it may take twenty paragraphs. There is no rule, and whatever unity may govern the paragraph, it is not the unity of the development of a single idea.

Each paragraph is really a separate exploration of an aspect of this general theme, but there is no single 'idea' developed in each paragraph.[৩২]

দেবেন্দ্র-রচনার স্বভাব তাঁর অনুচ্ছেদগুলিতে আরও স্পষ্টতর। গদ্য তাঁর ছন্দোময়, যদিও কবিতার সুনিরূপিত ছন্দে তার প্রকাশ নয়। শব্দে, শব্দসজ্জায়, পদগুচ্ছে, ক্রিয়ার ব্যবহারে, বাক্যের বিন্যাসে, অনুচ্ছেদের পর্বে-পর্বে, স্তরে-স্তরে এই ছন্দের সুরের প্রমাণ। গদ্যের ছন্দ মাত্রাবন্ধনে নয়, দলবিচারে নয়, আরও অনেক কিছু নিয়ে। এবং—

> The paragraph is, indeed, the first complete and independent unit of prose rhythm. The sentence has rhythm, but as we have seen, a prose all sentences, even if these are in themselves perfectly rhythmical, is not perfect prose. The sentences must be dissolved in a wider movement and this wider movement is the rhythm of the paragraph—a rhythm that begins with the first syllable of the paragraph and is not complete without the last syllable. With the last syllable the rhythm ends and there is a rest.[৩৩]

হার্বার্ট রীডের এই মন্তব্যের কেবলমাত্র শেষ বাক্যটি ব্যতীত দেবেন্দ্র-রচনার ভাষা—সুষমার ক্ষেত্রে অন্য সব কটি কথাই গ্রাহ্য। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম,' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে'র যে কোন রচনাংশের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পর পর পাঠ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, সে ভাষা একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ-অন্তে শেষ হয়ে যায় নি, ছন্দস্পন্দের দোলা বহুক্ষণ ধরেই দোল দিতে থাকে, পাঠক-চিত্তও সে দোলায় অনুভাবিত হতে থাকে—গানের সুরের অনুরণনের মত; শুধু শ্রুতি নয়, শুধু বক্তব্য নয়, দেবেন্দ্র-রচনার পূর্ণতা তাঁর রচনার দৃশ্য-সজ্জাতেও।—

> There is about good writing a visual actuality. It exactly reproduces what we should metaphorically call the counter of our thought. The metaphor is for one exact : thought has a contour or shape. The paragraph is the perception of this contour or shape.[৩৪]

দেবেন্দ্রনাথের অনুচ্ছেদগুলি, তথা বাক্যগুলি নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র। দাঁড়ি,

কমা, সেমিকোলন, কোলন-জাতীয় বিরতি-চিহ্নিত। চোখে লাগে এমন রচনাংশ বিরল-দৃষ্ট। যেমন—

আমাদের নৌকা তীরে লাগিল। এখনো সব অন্ধকার। তীরের অদূরে দেখি যে, একটা তরু ও লতাবেষ্টিত বাড়ী হইতে কতকগুলা দীপের আলো বাহির হইতেছে। আমি কৌতূহলবিশিষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞাত স্থানে, সেই অন্ধকারে-অন্ধকারে একা দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি, একটি ক্ষুদ্র কুটীর; তাহার মধ্যে গেরুয়া বসন পরা মুণ্ডিতমস্তক কতকগুলি সন্ন্যাসী মোমবাতির আলো লইয়া তাহা একবার এখানে, একবার ওখানে রাখিতেছে।[৩৫]

অনুচ্ছেদ, প্রকৃতপক্ষে এমনি করেই দেবেন্দ্র-রচনার সামগ্রিক ভাষাবেদনকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে এক একক আস্বাদনের অখণ্ডতায়, এক বক্তব্যের ধারায়।[৩৬]

১। পত্রাবলী, ১৮৫৮, ৬৪-৬৫।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান: ১ প্রকরণ, ১ ব্যাখ্যান, ১৮৬১, ১৯।

৩। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ১৮৬৪, ৫-৬।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য). ১০ সংস্করণ, ১৯১৯, ১১-১২।

৫। আত্মজীবনী ১৮৯৮, ১৫৮।

৬। তদেব ২৩৯।

৭। তু: শ্রীকান্ত (২ ভাগ)—'কাপ্তেন কইচে ছাইক্লোন হতি পারে।'

৮। দ্রষ্টব্য: অক্ষয়কুমারের শব্দ-বিশ্লেষণের আলোচনা।

৯। অক্ষয়কুমারের শব্দসম্পদের 'সমাসে'র পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০। The moment we use the copula, the moment we express subjective inclusions, poetry evaporates (Fenollosa)—Read, Herbert, *English Prose Style*: London, 1963, 35.

১১। দেবেন্দ্রনাথের ভাষার Rhetoric বা ভাষার সুষমা-প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২। Read, Herbert, *Op. cit.*, 35

১৩। সাধারণভাবে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বাক্য কত ছোট, বা কত বড় হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ১০টি শব্দের অধিক, কিন্তু ২০টি শব্দের কম, এরূপ বাক্যকে মাঝারি বাক্য; ১০টি শব্দের কম হলে ছোট বাক্য, এবং ২০টি শব্দের বেশী হলে বড় বাক্য বলে ধরছি।

১৪। A period is a complex sentence of which the meaning remains in suspense until the completion of the sentence. —Read *Op. cit.*, Herbert, 42.

১৫। আত্মজীবনী, ১৪৩।

১৬। তদেব, ১৪১।

১৭। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ৫৪।

১৮। Lucas, F. L., *Style*, London, 1955-'56, 244-'45.

১৯। Warner, Alan, *A Short Guide to English Style*, London, 1964, 24-25.

২০। Read Herbert, *Op. cit.*, 1963, 59.

২১। Wimsatt, *Johnson's Prose Style*, : *Whatley's Elements of Rhetoric*, 1828, 8.

২২। রবীন্দ্রনাথ, 'গদ্যকবিতার গতিক্রম' : দ্র: ছন্দ, : (প্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত, প. ব্. স. র. ব.) ১৩ খণ্ড, ২৮৬—২৮৭।

২৩। Lucas F. L., *Op. cit.*, 190.

২৪। ভালো বক্তার স্পষ্ট উচ্চারণ ও আবশ্যক বিরাম গ্রহণ যেমন বক্তৃতার উৎকর্ষ সৃষ্টি করে তেমনি জাত-লেখকের রচনাতেও উচ্চারণের বিরাম ও লেখায় যতি ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। ফ্লবেয়ার বলেছিলেন—

"a good style must meet the needs of the respiration"

—Lucas, *Op. cit.*, 220.

২৫। Read, *Op. cit.*, 52,

২৬। *Ibid.*, 57

২৭। আত্মজীবনী, ১১৩।

২৮ ক। জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, ১-২।

২৮ খ। তদেব,

২৯। Marder, Daniel, *The Craft of Technical Writing*, U. S. A. 1960, 45-60.

৩০। Lucas, *Op. cit.*, 58.

৩১। *Ibid.*, 58.

৩২। Read, Herbert., *Op. cit*, 54.

৩৩। *Ibid.*, 59.

৩৪। *Ibid.*, 61.

৩৫। আত্মজীবনী, ১৫৩।

৩৬। The paragraph is the mould for a complete unit of thought.

—Daniel Marder, *Op. cit.*, 45

দ্বা দ শ অ ধ্যা য়

দেবেন্দ্রনাথ : অলঙ্কার

বাংলা গদ্যের আদি যুগে গদ্যের আলঙ্কারিক মণ্ডন বা প্রসাধন স্বভাবতই দেখা দেয় নি। তখনও পর্যন্ত তা ব্যবহারিক জীবনেরও তর্কবিতর্কের প্রয়োজনের মধ্যেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। যখন গদ্য ক্রমে এসে আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন মনের বিচিত্রভাব প্রকাশের চেষ্টা ধীরে ধীরে দেখা দিল। অক্ষয়কুমারের গদ্য যদিও বিজ্ঞান, নীতি বা ধর্ম, ইতিহাসের সীমা-সংলগ্ন তবুও সেখানে ভাষার প্রসাধন লক্ষ্য করা গেছে। কারণ, অক্ষয়কুমার গদ্যে তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য, আমরা এতক্ষণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, আরও স্বচ্ছন্দ এবং সহজ। তার চেয়ে বিশেষ লক্ষণীয় যে, তাঁর গদ্যে নিজের মনের কথা অনেক বেশী। ধর্মীয় বক্তৃতা বা প্রার্থনায় ব্যক্তিগত ধর্মচিন্তা বা ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ আর 'আত্মজীবনী'র প্রধান বিষয়ই লেখকের ব্যক্তি-জীবন। বাংলা গদ্যে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এখন বিশেষ স্পষ্টভাবে আত্মমুখী চিন্তার প্রকাশ দেখা গেল। তাই তাঁর গদ্য শুধু তথ্য-পরিবেশনের জন্য নয়, শুধু বিচার-বিতর্কের জন্য নয়, ছাত্রপাঠ্যও নয়। তাই তাঁর গদ্য পূর্ববর্তী সকল লেখকদের চেয়ে অলঙ্কারমণ্ডিত। অলঙ্কার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বাংলা গদ্যে অলঙ্কার প্রয়োগের ইতিহাসে তাই দেবেন্দ্রনাথের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র-রচনার অলঙ্কারগুলিকে প্রধানত তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে, যথা—

১. চিরাচরিত অলঙ্কারের ব্যবহার, যা বাংলা প্রাচীন সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে, পরে আধুনিক সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,—'জগৎ-সংসার', 'জ্ঞানচক্ষু', 'ধর্ম্মপথ'।

২. দেবেন্দ্র-সমসাময়িক রচয়িতাগণের লেখাতেও যা ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪৩—১৮৯৮-র মধ্যেকার প্রাচীন লেখকদের লেখাতেও যে সমস্ত অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি। যেমন—'কারণহিল্লোল', 'বন-শান্তি', (টেকচাঁদ অভেদ) কলহাগ্নি (মধুসূদন) পটমণ্ডপ (ভূদেব : স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস)[১] প্রভৃতি।

৩. যে সমস্ত অলঙ্কার দেবেন্দ্রনাথের রচনায় নূতন বলে মনে হয়। যেমন—'অন্ধ-অন্ধকার', 'বিষাদ-সাগর' 'অন্তরাকাশের সূর্য্য' 'নিদ্রিত জগতের প্রহরী'। দেবেন্দ্র-রচনার এই অলঙ্করণ মূলত তুলনামূলক অলঙ্করণেরই অন্তর্গত। দেবেন্দ্র-রচনার এই অলঙ্কারের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের পূর্বে অলঙ্কার-ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত, সাধারণ একটি আলোচনা আবশ্যক।

ভারতীয় আলঙ্কারিকদের রচিত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রূপক', 'উপমা' প্রভৃতি অলঙ্কারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চিত্রকল্পের[২] কোন পরিচয় নেই। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা চিত্রকল্প বলে স্বতন্ত্র কোন অলঙ্কার স্বীকারই করেন নি, বোধ হয়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে সংস্কৃত কাব্যে চিত্রকল্প নেই। বিপরীত তার সত্য। সকল যুগের সকল কবিদের মতই সংস্কৃত কবিগণও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। কেবল চিত্রকল্প ব্যবহারই করেন নি, চিত্রকল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের সামনে এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। সংস্কৃত কাব্যের সংখ্যাধিক সুন্দর চিত্রকল্প থেকে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র একটি উদাহরণ এখানে তোলা হল।—

> সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
> নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥[৩]

সম্প্রতি একটি গবেষণা-গ্রন্থে চিত্রকল্পের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> বাসনালোকে মগ্ন, জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা যখন ছবির আকারে সাড়া দেয়, তখনই একটা ইমেজ পাওয়া যাবে।
>
> Residual of racial experiences stirred in the unconscious depths of the mind.—
>
> এক কথায় জাতি-জীবনের বিচিত্র এবং জটিল অভিজ্ঞতার ডুবুরিকেই ইমেজিস্ট বলব।[৪]

'ইমেজ'-এর এই সংজ্ঞায় 'বাসনালোকে মগ্ন', 'জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা' প্রভৃতি উক্তি 'ইমেজে'-এর স্বভাব ও রূপকে সুস্পষ্ট করে না। 'জাতি-জীবনের বিচিত্র এবং জটিল অভিজ্ঞতার ডুবুরিকে' 'ইমেজিস্ট' বলতে হলে ঔপন্যাসিক, গল্পকার প্রভৃতি সাহিত্যিকের সঙ্গে একজন 'ইমেজিস্ট'-এর পার্থক্য কোথায়?—

> রূপকল্প, বা চিত্রকল্প কেবলমাত্র একটি বক্তব্যের পরিবর্তে ইঙ্গিত নয়, কেবলমাত্র দুটি বস্তুর উপমা নয়, চিত্রকল্প অনায়াসে একটি কংক্রিট শব্দের

মত ব্যবহৃত হয়ে ভাষায় বক্তব্যধারাকে স্পষ্টতর করে তোলে, বিশেষত কোন অমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্‌ট) যুক্তিধারাকে উপস্থিত করতে হলে চিত্রকল্পের কংক্রিট স্বভাব বিশেষ প্রয়োজন মেটায়।[৫]

'ইমেজ' বা চিত্রকল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বিদেশী সমালোচকের মন্তব্য হল যে, চিত্রকল্প স্থানিক বিশেষত্বে,* ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন-সৃষ্টিতে, একটি মানসিক আস্বাদনের অবিকল উপস্থাপনায় সুন্দর, সার্থক হয়ে ওঠে।[৬] একটি উদাহরণ—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'।[৭]

চিত্রকল্পটির স্থানিক বিশেষত্ব : 'বিদিশার নিশা' 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' 'সমুদ্রের 'পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা' 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর', এবং 'পাখীর নীড়ের মত চোখ,—প্রত্যেকটির মধ্যে আছে মূর্ত ছবি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন : অত্যন্ত কাছে থেকে যেন 'বনলতা সেনে'র চুলের 'বিদিশার নিশা', মুখের 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য', আর 'পাখীর নীড়ের মতো' নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, অভিপ্রেত আশ্রয়ও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রে হাল-ভেঙে-যাওয়া, দিশাহারা নাবিকের উদ্‌ভ্রান্ত চোখের চাউনি। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে সবুজ ঘাস-ঘেরা দারুচিনি-দ্বীপ দেখতে পাওয়া সেই অসহায় নাবিকেরই দিক পাওয়ার আনন্দ। এ দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

মানসিক আস্বাদন : একটি চিত্তের অসহায় মুহূর্তে কবি এক পরম নিভৃত, নিরাপদ আশ্রয়—বনলতা সেনের পাখীর নীড়ের মত চোখের বরাভয় পেলেন। অতলান্ত সামুদ্রিক তৃষ্ণার শেষে হৃদয়ভরা শান্তির মানসিক পরিতৃপ্তি।

রূপকল্প বা চিত্রকল্প ভাষায় সেই প্রসাধনকলা, যার ব্যবহারে বক্তব্য বিষয়

অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং চিত্রকল্পটি দৃশ্যগ্রাহ্য আবেদন সৃষ্টি করে, একটি ছবি বর্ণিত হয় ভাষায়; তাতে বক্তব্য বিষয়টিও প্রতিবিম্বিত হয়ে বক্তব্য বিষয়ের প্রতিবিম্বনের মাধ্যমে চিত্রকল্পটিও হয় ছবির মত একটি স্বতন্ত্র চিত্র। যেমন—

> যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্নমূর্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়?[৮]

চিত্রকল্পের সঙ্গে রূপক, এবং উপমার পার্থক্যও এইখানে। রূপক, এবং উপমায় তুলনাটা বড় কথা।[৯] দুটি বিজাতীয় বিষয়ের সাদৃশ্য নিয়ে পরস্পরের তুলনা করা এই অলঙ্কার দু'টির স্বভাব। রূপকে এই তুলনা এত আরোপিত সাদৃশ্য নিয়ে যে, বিজাতীয় বিষয় দু'টি একত্রিত রূপে ব্যবহৃত হয়। উপমায় তুল্য এবং তুলনীয় স্বভাবধর্মে এক হয়েও পরস্পর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ব্যবহৃত হয়। (যেমন, বিষাদ-সাগর = রূপক, এবং বিষাদ তুল্য সাগর = উপমা)। চিত্র এখানে গৌণ, তুলনা এখানে মুখ্য। চিত্রকল্পে চিত্র প্রধান। যদিও বক্তব্যকে রূপক ও উপমার চেয়ে অধিকতর কংক্রিট রূপে প্রতীয়মান করায় চিত্রকল্প। এবং বক্তব্য, আর বক্তব্য স্পষ্টতর করে তোলার জন্য ব্যবহৃত চিত্রবৎ অলঙ্কারের একটি তুলনাও সেখানে আসে। তাই চিত্রকল্পও তুলনামূলক অলঙ্কার।

গদ্যসাহিত্যে এই সকল অলঙ্কারের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নিয়ে সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সমালোচনা-জগতের গুরুস্থানীয় পুরুষ অ্যারিস্টটল এই সকল অলঙ্কার গদ্যসাহিত্যেও যে ব্যবহার্য এবং এগুলির ব্যবহারে যে সাহিত্যিক সৌন্দর্যও সৃষ্ট হয় সে সম্পর্কে মন্তব্যও করেছেন। অ্যারিস্টটল লিখেছেন—

> রচনাশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ রূপকের ব্যবহারে। এই একটি মাত্র বিষয়, শিক্ষায়ত্ত নয়। এটি জন্মগত শক্তি।[১০]

অ্যারিস্টটলের বিশ্বাস—

> গদ্যে রূপকের ব্যবহার কাব্যে রূপকের ব্যবহারের চেয়ে অধিক প্রয়োজন, কারণ কাব্যের ভাবপ্রকাশের সম্পদের তুলনায় গদ্যের সম্পদ কম।[১১]

রূপকের স্বভাব-নির্ধারণে হার্বার্ট রীড্ মন্তব্য করেছেন—

> রূপক-ব্যবহারের শক্তি কবিশক্তির অভিব্যক্তি এবং রূপকের ব্যবহার প্রধানত কাব্যময়।[১২]

দেবেন্দ্রনাথের রচনায় রূপক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার সুপ্রচুর এবং তাঁর এই অলঙ্করণ তাঁর রচনার স্বভাবে স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য। উনবিংশ শতকের (১৮৫০-১৮৯৮) অন্যতম এবং, বোধ হয়, সর্বপ্রথম আত্মনিমগ্ন লেখক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। 'সাবজেকৃটিভ' রচয়িতা হওয়ায় তাঁর লেখাগুলি তাঁরই মগ্নচৈতন্যের অনুভূতি। সেই অনুভূতি-প্রধান রচনার মণ্ডনকলাও স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তর-উদ্ভূত। লেখক বিশেষ কোন প্রয়োজনের বশবর্তী বা তাগিদে ত্রস্ত হয়ে সচেতন মনে মণ্ডনকলা সৃষ্টি করেন নি। অবশ্য সাহিত্যের সকল অলঙ্কারই স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি হলে তা সুন্দর হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হোলো সাহিত্যের।[১৩]

দেবেন্দ্র-রচনার অলঙ্কারগুলি এই 'আপনি আসা' 'সাহিত্যের'। উদাহরণ নেওয়া যাক।—

রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার

ক. জ্ঞান-রহস্য, ধর্ম্ম-পিপাসা, বিষাদ-ঘন (ধূলি), বিষাদ-অন্ধকার, জ্ঞান-পথ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, বাষ্প-সমুদ্র, আনন্দ-প্রবাহ। —আত্মজীবনী।

খ. অমৃত-সেতু, অমৃত-নিকেতন, ধর্ম্ম-পথ, জগৎ-সংসার, জ্ঞান-জ্যোতি, অমৃত-বারি, প্রেম-বারি-বর্ষণ, জ্ঞান-চক্ষু। —ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান।

গ. জরায়ু-শয্যা, বিষাদ-সাগর, বিষয়-সেবা, আনন্দ-কোলাহল। —অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

উপমা অলঙ্কার

ক. এই পৃথিবী একটা সুপ্রকাণ্ড বেলুন-যন্ত্র।— জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি : পৃঃ ৭।
বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর শোভার আগার এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—তিনেরই স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। —তদেব : পৃঃ ৫।

খ. উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায়, নক্ষত্রবেগে, শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদয় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ অন্ধকার সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল।

—পত্রাবলী : সংখ্যা ৫০, পৃঃ ৭০।

গ. পশুপক্ষীরা জল-বুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে।

—সাম্বৎসরিক বক্তৃতা : পৃঃ ১০০।

ঘ. সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষের আলোক, পরমাত্মা সেইরূপ আমাদের অন্তরাকাশের সূর্য্য। —তদেব : পৃঃ ১০৫।

চিত্রকল্প

ক. দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল—আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল।

—তদেব, সংখ্যা ১৩৪, ২০৬।

খ. শরৎকালের শিশিরসিক্ত শেফালিকা পুষ্পের ন্যায় সেদিনকার প্রাতঃকালে তোমার হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সহজেই প্রভুর চরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। —পত্রাবলী : পৃঃ ৯৭, ১০৭।

গ. ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল।

—আত্মজীবনী : পৃঃ ১৮৮।

ঘ. আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি বন কানন, সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়্ খড়্ করিতেছে। —তদেব : পৃঃ ২২৯।

দেবেন্দ্র-রচনার এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য আরও বৈচিত্র্যবহুল হয়ে উঠেছে

যেখানে ভাবপ্রকাশের কিছুমাত্র অন্তরায় না হয়ে রূপক, উপমা, এবং চিত্রকল্পের মিশ্রণরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।[১৪] যেমন—

কিন্তু, কত দিন পরে, কত অন্বেষণের পরে, আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি, ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি। —আত্মজীবনী : পৃঃ ২।

চিত্রকল্পটি হয়তো খুব কাব্যময় নয়, কিন্তু খুবই তাৎপর্যময়। নাতি ও দিদিমার সম্পর্কের রূপকে ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক সম্বন্ধ কল্পনা, এবং দিদিমার কোলে নাতির খেলা করার ছবি অঙ্কনের যে সূক্ষ্ম প্রয়াস তা যেমনি আত্মমুখী, তেমনি অভিনব। আবার, উপমা ও চিত্রকল্পের মিশ্রণ—

এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে ; নীচে নীল যমুনা ; মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে। —তদেব : পৃঃ ১৭৯।

তাজ যেন চাঁদের আলো, এই কাব্যময় উপমাটি যেন ছবির মত রঙে রেখায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে এখানে। পাঠক যেন চোখে দেখতে পায়। অস্তোন্মুখ সূর্যের গোলাপি আলোয়, নীল জলভরা যমুনার স্বচ্ছতায় শুভ্র তাজমহলের ছায়া স্থির হয়ে আছে। নীল আকাশের বুকে যেমন নম্র সুন্দর চাঁদ।

সাহিত্যে অলঙ্কার সৃষ্টিরও একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। নতুবা অলঙ্কার সেখানে ভার হয়ে ওঠে। দক্ষ লেখকের রচনাতে এই প্রাসঙ্গিকতা রক্ষিত হয়। রচনার বিষয়বস্তু এবং পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এই প্রাসঙ্গিকতা। দেবেন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ চিত্রকল্প প্রাসঙ্গিক। আর প্রাসঙ্গিক বলেই সেগুলি সার্থক, সুন্দর। চিত্রকল্প সম্পর্কে লুকাসের যে উক্তি তা দেবেন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। লুকাস বলেছেন—

চিত্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রচনারীতিকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুদৃঢ় করে তোলা, এবং সেক্ষেত্রে চিত্রকল্পগুলিকেও সবিশেষ এবং সুসংগঠিত হতে হয়।[১৫]

অর্থাৎ, বক্তব্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে তাকে আরও প্রত্যক্ষবৎ করে তোলাও যেমন চিত্রকল্পের গুণ, তেমনি তাকে প্রাথমিকভাবে একটি ‘কংক্রিট’ ছবিও হতে হবে, এটিও তার গুণ। দেবেন্দ্র-রচনায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির

এই উভয়বিধ গুণই প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, দাবানল প্রত্যক্ষ করে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসব রজনীর প্রভাতকালের অবিশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

—আত্মজীবনী : পৃঃ ২১৪।

বলা বাহুল্য, চিত্রের এই 'আগুন' দৃশ্যগ্রাহ্য আবেদনে প্রত্যক্ষবৎ। চিত্রকল্পের ব্যবহারে 'অ্যাবৃস্ট্রাক্ট্' বক্তব্যকে 'কংক্রিট'রূপে উপস্থিত করার যে রচনা-নৈপুণ্যের কথা সেস্ বলেছেন,[১৬] তারও পরিচয় দেবেন্দ্র-রচনায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

তিনি যদি আমারদের হৃদয়েতেই না থাকিতেন, তবে কেন আমরা গোপনে, নির্জ্জনে, গহনে, মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ করিলে আমারদের হৃদয় বাণ-বিদ্ধ হইতে থাকে? যখন আমরা সেই অসহ্য গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকি, তখন আমাদের সম্মুখে উদ্যত বজ্রের ন্যায় কাহার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পায়? কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বরের স্নেহ কি আমরা অনুভব করিতে পারি না?

—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান : পৃঃ ১২৯।

এখানে পাপাচরণের আত্মগ্লানিতে, অস্থির চিত্তের সঙ্গে বাণবিদ্ধ হরিণের যন্ত্রণার যে উপমা করা হয়েছে সেটি প্রত্যক্ষবৎ, চিত্রকল্প। আত্মগ্লানি-বোধ অমূর্ত উপলব্ধি। তাকে মূর্ত করার জন্য বাণবিদ্ধ হরিণের অস্থিরতার চিত্র কল্পিত হয়েছে এখানে। মূর্ত বক্তব্যকেও অমূর্ত চিত্রকল্পের দ্বারা উপস্থিত করার প্রয়াসও দেবেন্দ্রনাথ করেছেন। যেমন, উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের আলোচনায় উদ্ধৃত তাজের উদাহরণটি। মূর্ত তাজমহলের রূপবর্ণনাকে চন্দ্র-মণ্ডলের সৌন্দর্যছটার মত অমূর্ত চিত্রকলার দ্বারা উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন।

দেবেন্দ্র-রচনার এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য আরও লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে সমাসোক্তির আশ্রয়ে—রূপক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারগুলি যখন একটি কাব্যময় আবেদন সৃষ্টি করেছে। যেমন—

আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম।[১৭]

সমাসোক্তির আশ্রয়ে রূপক ও উপমার ব্যবহার

ক. সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।
—আত্মজীবনী : পৃঃ ৫।

খ. স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণশরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। —পত্রাবলী সংখ্যা : পৃঃ ৬৪-৬৫।

গ. প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। —আত্মজীবনী : পৃঃ ২১০-১১।

ঘ. অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। —তদেব : পৃঃ ২১৪।

ঙ. প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে, 'এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য-সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না ; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।' —তদেব : পৃঃ ২৩৩।

দেবেন্দ্র-রচনার এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য, সৌন্দর্য। তার কারণ রূপক, উপমা, বা চিত্রকল্প যেগুলি দেবেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির বহুল ব্যবহারজনিত কাব্যাবেদন, তথা দৃশ্যগ্রাহ্য রূপাবেদন পুরাতন বলে মনে হয় না। এগুলির ব্যবহারে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে, বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশোজ্জ্বলতায় বক্তব্য শুধু ছবির মত প্রত্যক্ষবৎ হয় নি, বহু ক্ষেত্রেই সুরসঙ্গতিতে সুষমিত হয়েও উঠেছে। কাজেই রূপক ব্যবহার সম্পর্কে লুকাসের যে আশঙ্কা এবং মূল্যবিচার—

> নূতন রূপক সৃষ্টি কঠিন, এবং বহুল ব্যবহারে পুরাতন রূপকের পুনর্ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবের পরিপন্থী, রচনার সৌন্দর্য্যের অন্তরায়।

এবং

> রূপক, মোটের উপর, রচনাকে জোরালো, স্পষ্ট, এবং গতিময় করে তুলতে পারে, উইট্ এবং হিউমার সৃষ্টি করে, লেখকের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে, রূপকের ব্যবহারে রচনায় কাব্যাবেদনও সৃষ্টি হতে পারে।[১৮]

তা দেবেন্দ্র-রচনার ক্ষেত্রে আশঙ্কামুক্ত এবং সঠিক মূল্যে নির্ধারিত। প্রমাণ

আলোচিত এবং বিশ্লেষিত দেবেন্দ্র-রচনার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য। তাঁর প্রতিটি চিত্রকল্প যেন রঙে রেখায় রূপময়, সুরে শব্দে বাঙ্ময়, তার আবেদনে যে আলোক ঠিক্‌রে পড়ে তাতে পাঠকচিত্ত ও -চক্ষু রসালোকিত হয়ে ওঠে। তার মিশ্রিত-অলঙ্কারগুলিও রূপে, রঙে সুন্দর ও সার্থক। হার্বার্ট রীড্ যথার্থই বলেছেন যে—

> Two images, or an idea and image, stand equal and opposite, clash together and respond significantly, surprising the reader with a sudden light.[১৯]

বক্তব্যকে অপ্রত্যাশিত স্পষ্টতার আলোকে এমনভাবে উপস্থিত করেন লেখক যে চিত্রবৎ প্রত্যক্ষতার পুলকে পাঠকচিত্ত কেবল সৌন্দর্যবিমুগ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন—

> বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়; শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি।
>
> আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই; যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল!
>
> —আত্মজীবনী : পৃঃ ১৪।

বিষয়বোধের সঙ্গে বিষয়ীর সত্তারও যে সম্পর্ক আছে, একই সঙ্গে তাও জানার যে তৃপ্তি ও পুলক তার বর্ণনায় মহর্ষি কত সহজে, অথচ অপ্রত্যাশিতের চমকে একটি প্রতক্ষ্যবৎ চিত্রকল্প সৃষ্টি করলেন, অজ্ঞানতাকে 'অন্ধকারাবৃত স্থান' এবং জ্ঞানকে 'সূর্য্যকিরণের একটি রেখা' মনে করে। বক্তব্যই শুধু এতে স্পষ্টতর হয় নি, একটি স্নিগ্ধ কাব্যময় আবেদনও এতে সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু দেবেন্দ্র-রচনায় বিশ্লেষিত এক প্রকার অলঙ্কার আছে যেগুলিকে খণ্ড-চিত্রকল্প বলা অধিক সঙ্গত। চিত্রকল্প হিসাবে স্পষ্ট নয়, পূর্ণ নয়, অথচ এগুলি চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে সম্পৃক্ত। অনেকটা চিত্রকল্পের মত। যেমন—

> আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।

খণ্ড-চিত্রকল্পের আলোচনায় লুইস্ মন্তব্য করেছেন—

> A poetry which excludes the searching of reason and

> the prompting of the moral sense is by so much the less impassioned, the less various and human, the less a product of the whole man at his full imaginative height. The images of such poetry will best be forced images, springing from the artificially fertilized soil of sensibility, luxuriant, but short-lived and freakish. If the poem has no thread of that poetic reason which is an 'emanation of the intellectual part of our nature', its images will be broken, anarchic, hard to comprehend in their relationship without another.[২০]

অঙ্গরাগ, অলঙ্কার-প্রসাধনও অন্তর্মুখীন। চিত্রকল্পসৃষ্টি দেবেন্দ্র-রচনার এই অন্তর্মুখীন অলঙ্কার-প্রসাধনেরই অন্তর্গত একটি বৈচিত্র্য মাত্র। ফলে চিত্রকল্পটির ছবিটি সেক্ষেত্রে যতটা অনুভব্য, তত বেশী রূপক নয়। কিন্তু ছবি অবশ্যই। কেবল ছবি নয়, সে ছবিরও একটি আবেদন আছে। যেমন—

> একবার নিমীলিত নয়নে আত্মার নিভৃত নিলয়ে, সুরম্য নিকেতনে, প্রিয়তমের দর্শন পাইতেছি, আবার পরক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া এই জগতীতলে তাঁহার মঙ্গল-কিরণ বিকীর্ণ দেখিতেছি।[২১]

ঈশ্বর-উপলব্ধির এই যে প্রকাশরূপ, এতে চিত্র আছে ঠিকই, কিন্তু অনুভব্য বেশী। কিন্তু এই অন্তর্মুখীন নিবিড়তা থাকার জন্যই চিত্রকল্পটি অনেক বেশী কাব্যময় হতে পেরেছে যেন। রূপকের মত চিত্রকল্পও যদি নূতন সৃষ্টি করা যায় তবে তা কবিপ্রতিভারই চিহ্ন বহন করে।[২২] দেবেন্দ্র-গদ্যে এই কাব্যের সুষমা-রচয়িতার স্টাইলের স্বাতন্ত্র্যকেই সমর্থন করে এবং গদ্যসাহিত্যে উদ্ধৃত খণ্ড-চিত্রকল্পের উদাহরণটিতে পূর্ণ চিত্রকল্পের অখণ্ডতার অভাব এখানে আছে। 'চিত্রকল্প মূলত দুটি তুলনাবাচক প্রকাশভঙ্গি'।[২৩] একটি মূল বক্তব্য-বিষয়ক, অন্যটি বক্তব্য প্রকাশোজ্জ্বল করার জন্য বর্ণিত ছবি। উভয়ের মধ্যে প্রয়োজন সামঞ্জস্যের। কিন্তু এখানে 'শ্বেত পুষ্পগুলি'র দৃশ্যের সঙ্গে 'অখিল মাতার হস্তে'র একটি সামঞ্জস্যমূলক তুলনা কল্পিত হয় নি। যদি 'শ্বেত পুষ্পগুলি' অখিল মাতার সন্তানরূপে কল্পিত হত, এবং তারপর তাদের রূপসজ্জায় অখিল মাতার সস্নেহ হস্ত রয়েছে বর্ণনা করা হত, তাতে চিত্রকল্পটি পূর্ণতা পেত।

স্বতন্ত্র রূপে ছবিটির একটি আস্বাদন সম্ভব হত। অথচ, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি পূর্ণ চিত্রকল্প এটি হতে পারে নি।

চিত্রকল্পের একটি চিত্রের দিক আছে, সেটি মূর্ত, প্রত্যক্ষবৎ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলির মধ্যে এমন এক-একটি খণ্ড-চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেগুলিতে এই মূর্ত, চিত্রাঙ্কনের প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্তি নিতান্তই অমূর্ত, কল্পনার। যেমন—উপমা ও চিত্রকল্পের মিশ্রণ ব্যবহারের উদাহরণ যেটি দেওয়া হয়েছে, সেটিতে তাজকে চন্দ্রমণ্ডলের খ'সে-পড়া সৌন্দর্যছটার সঙ্গে যে তুলনা করা হয়েছে সেটি একান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। প্রকাশিত সৌন্দর্য ছবির মত প্রত্যক্ষবৎ নয়। 'সৌন্দর্যের ছটা, চন্দ্রমণ্ডল থেকে খসে পড়া' এই অপূর্ণতার কারণ সৃষ্টি করেছে। অথচ, মনে হচ্ছে যেন তারকা-স্বল্প আকাশের বুকের চন্দ্রকান্তমণি বা অসীম সন্ধ্যা-আকাশের বুকের নম্র সুন্দর চাঁদ যেন, বর্ণিত হলে ছবিটিও হত প্রত্যক্ষবৎ, দৃশ্যগ্রাহ্য অবেদনও সৃষ্টি হত এবং বক্তব্যধারাও হত স্পষ্টতর। সম্ভাবনা সত্ত্বেও এটিও তাই পূর্ণ চিত্রকল্প হতে পারল না। এগুলিকে তাই খণ্ড-চিত্রকল্প বলা ভাল।

সম্ভবত আত্মমগ্ন সাধক লেখক বলেই দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এই পূর্ণতার অভাব। একজন সচেতন শিল্পীর তুলিতে যা স্বাভাবিক, একজন আপনভোলা, ঈশ্বরানুভূতিতে বিমুগ্ধ পুরুষের রচনায় তা প্রত্যাশা করা যায় না। বিশ্লেষিত দুটি খণ্ড-চিত্রকল্পেই রূপকের আরোপ বেশী। রূপক ভেদাভেদ মানে না। একত্র রূপে স্বতন্ত্র সে। দেবেন্দ্র-চিত্তের ঈশ্বরানুভূতির নিবিড়তায়ও সেই এক ব্রহ্মের সাধনার কথাটাই বড়। ব্যক্তিমানস অনেক ক্ষেত্রেই যে শিল্প-মানসিকতায় প্রতিবিম্বিত, তার অন্যতম পরিচয় এই খণ্ড-চিত্রকল্পগুলি। স্মরণ রাখা কর্তব্য, খণ্ড হলেও এই চিত্রকল্পগুলি একান্ত করেই অসঙ্গত অপ্রয়োজন নয়, বরং ছোট ছোট মণিমুক্তার মত দেবেন্দ্র-রচনার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য-শোভা। এগুলি প্রাসঙ্গিক। রূপকে, উপমায়, অনেক সময় চিত্রকল্পোপম।

দেবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি আত্মমগ্ন লেখক। অন্তর্মুখীন নিবিড় উপলব্ধির প্রকাশেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, তাঁর রচনার এই নিবিড়তা তাঁর ধর্মচিন্তাশ্রিত। মূলত ধর্মবোধাশ্রিত রচনা হওয়ায় অলঙ্কারের ব্যবহারপ্রসঙ্গে হার্বাট রীড্ যে মন্তব্য করেছেন তা দেবেন্দ্র-

রচনার ক্ষেত্রে তথা অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার ক্ষেত্রেও ঠিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। হার্বার্ট রীড্ মন্তব্য করেছেন—

> The precision sought for is one of equivalence, not of analytical description. And as prose is essentially the art of analytical description, it would seem that metaphor is of no particular relevance to it; for poetry it is perhaps a more necessary mode of expression.[২৪]

গদ্য মাত্রেই বিশ্লেষণমূলক যে হয় না, তার প্রমাণ দেবেন্দ্র-গদ্যের আলোচনা। তার প্রমাণ অক্ষয়কুমারের বহু রচনাংশ।[২৫] যে কথা রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে খাটে সে কথা অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে খাটে না। খাটে না তার কারণ রামমোহনের গদ্য হল চূড়ান্ত পর্যায়ে 'লজিক্যাল'। যুক্তির স্থাপত্য-গঠিত সে গদ্যে আলঙ্কারিক আবেদন স্বভাবতই কম।[২৬] তাঁর এ গদ্যের স্বভাব আরও প্রসারিত রূপ নিয়েছিল অক্ষয়কুমারের সাধনায়। কেবল 'লজিক' নয়, ভাষণকলার উপাদানও এসেছিল অক্ষয়কুমারের গদ্যে। যদিও অলঙ্কারের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার সংযমী ছিলেন যথেষ্ট। কাজেই তাঁর গদ্যতে ছিল 'পাহাড়ী ঝর্ণার রূপ এবং প্রাণ'।[২৭] আর সাধক শিল্পী দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এল আত্মমগ্ন চিত্তের উপলব্ধি, আর তার প্রকাশরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা। শব্দের শিল্প-ব্যবহারে যে ভাবের প্রকাশে আভিজাত্য সৃষ্টি হতে পারে তার অফুরন্ত দৃষ্টান্তস্থল দেবেন্দ্র-গদ্য। তাঁর ভাষার যে সঙ্গীত তা তাঁরই চিত্তবীণার সুরে সমৃদ্ধ। তাঁর গদ্য কবিত্বে ভরা, অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে সুরময়, রূপময়। তাঁর প্রতিটি রূপক, প্রতিটি উপমা, প্রতিটি চিত্রকল্প তাঁর ভাষার সম্পদের কারণ। লুকাস্ যথার্থই বলেছেন—

> ...those who have no gift for metaphor and imagery are doubtless wise to keep clear of it, but that those who have it, whether in writing or in speech, will find few qualities that better reply cultivation.[২৮]

যথার্থ উক্তি—

> Debendranath's greatest single contribution to Bengali prose as literature, namely the quality of music.[২৯]

দেবেন্দ্রনাথের ভাষার এই সঙ্গীতময়তাই পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপ হয়েছে। অক্ষয়কুমারের যুক্তিনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক রচনার ধারা যেমন রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় রক্ষিত হয়েছে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের এই আত্মমুখীন সঙ্গীতময় রচনার ধারা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় রক্ষিত হয়েছে। অলঙ্করণ-সৌন্দর্যও এঁদের রচনায় পুষ্পিত, সুরভিত। কিন্তু তার উৎস ও প্রেরণাস্থল দেবেন্দ্র-গদ্য তাতে সন্দেহ নেই।

১। সুকুমার সেন, পূর্বে উল্লিখিত, ১৯৩৪, ৬২, ৭০, ৭৪।

২। 'ইমেজ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'চিত্রকল্প' শব্দটি দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত, সুতরাং 'উপমালোক' (দ্রঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী, 'বাংলা কাব্যে উপমালোক' : ১৯৬৫), বা 'বাক্‌প্রতিমা' (অমলেন্দু বসু, রবীন্দ্রায়ণ, সম্পাদক : পুলিনবিহারী সেন, ১৯৬১) জাতীয় অর্থদ্যোতক পরিভাষা হলেও তা নূতন, অপ্রচলিত বলে, আলোচনার সুবিধার জন্য 'চিত্রকল্প' শব্দটিই ব্যবহার করা হল।

৩। রঘুবংশ : ৬।৬৭।

৪। শিবচন্দ্র লাহিড়ী, পূর্বে উল্লিখিত, উপক্রমণ : ৩২।

৫। Sayce, R.A., *Style in French Prose*, London, 1953, 57, 80.

৬। Tuve, Posemond, *Elizabethan and Metaphysicai Imagery*, U.S A., 1947, 17.

৭। জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন'

৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ৭।

৯। "The simple, in which a comparison is made directly between two objects, belongs to an earlier stage of literary expression : it is the deliberate elaboration of a correspondence, often pursued for its own sake. But a metaphor is the swift illumination of an equivalence. Two images, or an idea and an image, stand equal and opposite ; clash together and respond significantly, surprising the reader with a sudden light,"

Read, *Op. cit*, 25.

১০। Aristotle's '*Poetics*', xxii. i.e. "But for the greatest thing is a gift for metaphor. For this alone cannot be learnt from others and is a sign of inborn power." ('*Poetics*', XXII).

১১। *Aristotle's Rhetoric*, III/2.

১২। Read Herbert, *Op. cit*, 23.

১৩। সাহিত্যের পথে, ১৯৩৬, ৬৩।

১৪। "An accumulation of figures also, usually produces a powerful effect : when two or three, blending as it were, their united contributions, Confer on each other vigour, persuasion, elegance"—Thomsen Lester.

Selected Readings in Rhetoric and Public Speaking.. New York, 1942, 160.

১৫। Lucas, F. L., *Style*, London, 1955, 169.

১৬। "An image is not necessarily a substitution of one thing for another or a comparison between them, it may be any concrete word which evokes a response of the senses, especially when it is used to enliven or illustrate abstract argument." Sayce, R. A.. *Op. cit*.. 57, 80.

১৭। দাবানলের বর্ণনায় যে চিত্রকল্পটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি, চিত্রকল্পের প্রথম উদাহরণটি, চিত্রকল্পের চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণটিও সমাসোক্তি অলঙ্কারের আশ্রয়ে রচিত।

১৮। Lucas, F. L., *Style*, 166

১৯। Read, *Op, cit*,, 25,

২০। Lewis C. Day. *The Poetic Image*, London, (1st edn. 1947) 8th edn. 1955, 133.

২১। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ১৪২।

২২। Read, Op. cit,. 23,

২৩। Ulmann Stephen, *Style in the French Novel*, London, 1957, 211.

২৪। Read, Herbert, *Op. cit*. 24

২৫। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' গ্রন্থে রামমোহন রায় প্রসঙ্গে যে উপমা, রূপক ও চিত্রকল্প-সমন্বিত প্রশংসাসূচক মন্তব্য অক্ষয়কুমার প্রকাশ করেছেন, সেটি আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যাংশরূপে বিবেচিত হতে পারে।

২৬। 'The presentation of his material is logical and its expression simple. His sentences flow one from the other in logical sequence. Each point is expounded with the utmost economy of words. No word is redundant. Much of his writing is therefore, devoid of ornament and literary quality."

Das, S, K., *Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar*, 156.

২৭। Dutta, R. C., *Literature of Bengal*, 163-164.

২৮। Lucas, F. L,, *Style*, 188.

২৯। Das, S. K., *Op. cit*., 199.

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য সম্মান যে কারণেই হোক এতদিন পর্যন্ত ঠিক দেওয়া হয় নি। অতি স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সঠিক মূল্য বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেঙ্গলি প্রোজ স্টাইল' (১৯২১) এবং শিশিরকুমার দাশের 'আর্‌লি বেঙ্গলি প্রোজ : কেরী টু বিদ্যাসাগর' (১৯৬৬) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, উভয়ের ভাষাও বিশ্লেষণ করেছেন এবং অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হয়ে উভয়ের প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণে নিরপেক্ষ বিশ্লেষকের দৃষ্টি গ্রহণ করেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাগণের এজন্য উভয়ের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু তথাপি অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার পূর্ণতর বিচারে, বিশদ বিশ্লেষণে, স্বতন্ত্র মূল্যায়নে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে অবদান, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের অবকাশ রয়ে গেছে। কারণ উক্ত গ্রন্থ-দুটিতেও বিষয়টি গ্রন্থ-পরিকল্পনার বহির্ভূত বলে মূল বক্তব্যরূপে আলোচিত হয় নি। স্বভাবতই তাই উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পীর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিচয়সূত্রে নিতান্ত অপরিহার্য বিষয় বলে অনুভূত হয়েছে।

১

বিষয়বৈচিত্র্যে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে তোলাতেও যেমন, তেমনি সে সম্পদ-ভাণ্ডারের অন্তর্নিহিত মূল্যকে বাড়িয়ে তুলতে এবং বাংলা গদ্যের অঙ্গরাগ সৃষ্টিতেও সফল হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফোর্ট উইলিয়ম যুগের নবসৃষ্ট বাংলা গদ্যের অস্থিরতায় রামমোহন অনেকখানি স্থিতি দিতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ নয়, বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বভাবানুযায়ী স্বতন্ত্র ব্যাকরণই বাংলা গদ্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠা আনতে পারে, এরূপ ভাবনা প্রথম রামমোহন রায়ই এনেছিলেন ; কিন্তু

সে ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ অক্ষয়কুমার করেছিলেন। বানান সম্পর্কে সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত ধনী, মানী প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল বাংলায় কর্তৃকারকের একবচনে ব্যবহৃত হবার রীতি ভেঙ্গে সকল বিভক্তিতে, সকল বচনে তার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত করেন। বাক্যবয়ন-বিধিতে, বাক্যসংযোজক অব্যয় ব্যবহারে তিনি বাঙলা ভাষায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতেঁ চেয়েছেন। বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টিতে অক্ষয়কুমারের অবদান অনস্বীকার্য, অত্যাধুনিক বাংলা পরিভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর সৃষ্ট পরিভাষা স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, এবং নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক যে বিপুল বৈচিত্র্যময় গদ্য অক্ষয়কুমার সৃষ্টি করেছেন তা কেবল তাঁর মনীষার চিহ্ন নয়, তা ঊনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী বাঙ্গালীর সাহিত্যসেবা মাত্রও নয়, তা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। 'পপুলার সায়েন্স' রচনায় প্রথম সফল বাংলা ভাষার লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ঠিকই, কিন্তু তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) থেকে আরম্ভ করে 'চারুপাঠে'র (১ ভাগ: ১৮৫৩, ২য়: ১৮৫৪, ৩য়: ১৮৫৯) প্রত্যেকটি ভাগের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলির ভাষাবৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাধনার যে ধারা পরবর্তীকালে প্রবাহিত হয়েছে তারই আদর্শ ভাষারূপও দান করেছে বলা চলে। ভারতীয় ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি নিয়ে এখনও কাজকর্মের চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে চলছে ঠিকই, কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১ম ভাগ; ১৮৮৩, ২য় ভাগ) ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ। এরূপ গবেষণামূলক বৃহৎ গ্রন্থ সে যুগে তো বটেই, এখনও বিরলদৃষ্ট। ভারতীয় ধর্মের এত বিস্তৃত পরিচয় বোধ হয় এরূপ ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে আর লেখা হয় নি। বাংলাসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের এ সকল অবদান শাশ্বত। বিজ্ঞান-সাহিত্য সৃষ্টির, ধর্মীয় ইতিহাস রচনার, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের অব্যাহত ধারা এখনও বাংলা সাহিত্যকে নিত্য ঐশ্বর্যে ভরে তুলছে, কিন্তু এ ধারার উৎস-সন্ধানে চুপী গ্রামের সেই দরিদ্র পরিবারের কৃশ, পড়ুয়া বালকটির নাম চিরস্মর্তব্য। একই সঙ্গে বিজড়িত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নাম। অক্ষয়কুমারকে সাধারণ্যে তুলে ধরতে অন্তরাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যতটুকু দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার চেয়ে বেশী সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার দায়িত্ব (১৮৪৩-১৮৫৫) অক্ষয়কুমারকে

দেবেন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই বার বৎসরে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের নির্বাচনের নির্ভুলতা প্রমাণ করতে যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন, বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসেই তা কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও অক্ষয়কুমারের এ একটি বড় অবদান। 'তত্ত্ববোধিনী' ঊনবিংশ শতকের বিষয়বৈচিত্র্যে ভরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্ররূপে যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার মূলে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনার দক্ষতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ঐ সাময়িক পত্রের অন্তরাল থেকে যে মধুর, সুললিত গদ্যরচনার পরিচয় পাওয়া যেত তার মূলে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন। অক্ষয়কুমারের ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম প্রকাশস্থল 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা। আবার দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মে'র সংখ্যাতীত বক্তৃতা, উপদেশ, যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তা প্রথমে বেনামীতে, বা নাম গোপন রেখে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই প্রকাশিত হত। ধর্মসাহিত্য বাংলাভাষায় সাহিত্যের সৌন্দর্যে প্রথম দেবেন্দ্র-রচনাতেই দেখা দিয়েছিল। রামমোহন ধর্মের সংস্কারক ছিলেন ; সমাজের, তথা মানুষের সার্বিক কল্যাণ-কামনায় সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অনিবার্যভাবে তাই তাঁর ভাষানির্মাণের স্থাপত্যে দার্ঢ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কেবল ধর্মসংস্কারক ছিলেন না, ধর্মসাধক ছিলেন ও মরমী ধার্মিক ছিলেন। তা' ছাড়া তাঁর পূর্বে রামমোহন ছিলেন, পাশে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। তাই স্বভাবতই তাঁর গদ্য সঙ্গীতসুন্দর, তন্ময় ভাবনার, তদ্গত চিত্তোৎসারিত। এ ভাষাসৌন্দর্য দেবেন্দ্রপূর্ব যুগে ছিল না। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ কেবল রচনার 'বিষয়বৈচিত্র্যই' সৃষ্টি করেন নি, 'রচনার রসসম্ভোগে'র যোগ্য সাহিত্য রচনাও করেছিলেন। অক্ষয় আনলেন বিজ্ঞানসাধনার সাহিত্যিক রূপ এবং দেবেন্দ্রনাথ আনলেন ধর্মসাধনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উভয়ের অবদান বড় কম নয়।

দেবেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে আরও দুটি বিষয় দিয়েছেন। পত্রসাহিত্য, এবং আত্মজীবনী-সাহিত্য। পত্র যে কিভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে তার উদাহরণ দেবেন্দ্রনাথের পত্রের সঙ্কলনে মেলে। পত্র যে পত্রলেখক ও পত্রপ্রাপক এ দুই সত্তার মানসিক সাযুজ্যবোধ সৃষ্টি করা ছাড়াও একটি

সর্বজনমনের আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে, একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবেদন জাগাতে পারে তার বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ দেবেন্দ্র-পত্রতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অন্য কোনো গদ্যলেখকের পত্রে পাওয়া যায় না। দেবেন্দ্রনাথের অতি সহজ, সরল ভাষায় যে অসাধারণ সাহিত্যিক আবেদন জাগায়, তা দেবেন্দ্রনাথের পত্রগুলিতেও অনুভব্য। একাধিক রূপকল্প, বহু প্রকাশোজ্জ্বল শব্দ-সাযুজ্য, ভাষার সঙ্গীতও যেমন, তেমনিভাবের স্পষ্টতর প্রকাশশীলতা দেবেন্দ্র পত্র-সাহিত্যকে বাংলা ভাষা, ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক শাশ্বত মর্যাদা দান করেছে। উত্তরকালে যার বিপুল ঐশ্বর্য, পুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে সম্ভাবিত হতে দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের এ দান চিরস্মরণীয়।

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-সাহিত্যের ধারা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র এবং জগদানন্দ প্রভৃতির রচনার মধ্যে পুষ্পিত, পল্লবিত হয়েছে। আর দেবেন্দ্রনাথের প্রায় অননুকরণীয় ধর্মসাহিত্যের ধারা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের রচনার আস্বাদন, পুত্র রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে রসায়ন হয়েছে।

২

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যলেখকদের মধ্যে তিনজনের নাম প্রায় একত্রে উচ্চারিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর সেই ত্রয়ী। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্র (১৮১৭), অক্ষয়কুমার (১৮২০) ও বিদ্যাসাগর সমবয়স্ক। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই তিনজনের বিকাশ। স্বভাবতই তাই একজনের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করতে গিয়ে অন্যজনের সাহিত্যকর্মের আলোচনাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। অক্ষয়কুমারের সাহিত্যরীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরীতির তুলনাপ্রসঙ্গে তাই রমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্যও করেছেন—

> The great merit of Akṣay Kumār's style is its earnestness, its surpassing vigour and force. Vidyāsāgar's style appears to us to be more finished and refined. Akṣay Kumār's is more forcible and earnest. In Vidyāsāgar's style we admire the placid stillness and soft beauty of a quiet lake, reflecting

on its bosom the gorgeous tints of the sky and the surrounding objects. In Akṣay Kumār's style we admire the vehemence and force of the mountain torrent in its wild and rugged beauty. Vidyāsāgar is the more accomplished master of style, Akṣay Kumār is the more forcible preacher. Modern Bengali prose, as we understand it, has been shaped there twin workers whose memory will be long preserved in Bengal.[১]

অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

পার্বত্য সৌন্দর্যে সুন্দর হল অক্ষয়কুমারের রচনা। তাঁর ভাষা অমসৃণ বন্ধুর। কিন্তু সে ভাষায় আছে শক্তি। তৎসম ও তদ্ভব শব্দে সংগঠিত, সমাসবদ্ধ, ছোট-বড়-দীর্ঘ পদগুচ্ছের যে ব্যবহার তাঁর ভাষায় লক্ষিত হয়েছে তাতে উদ্ঘাটিত ভাষাবৈশিষ্ট্যটি প্রাণময়, সশক্তি। অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ তৎসম শব্দসম্পদে ভরা অক্ষয়কুমারের ভাষায় প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্নের স্থান তাঁর ভাষার চলৎ-শক্তিটি রেখেছে স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের সেই নির্মাণলগ্নে অক্ষয়কুমারের এ ভাষা বিশেষ মূল্যের। বাংলা সাহিত্যে 'চারুপাঠে'র স্থান চিরকালীন। লেখকের যুগ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের যুগ পেরিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনেও প্রবেশাধিকার ছিল তার। দীনেশচন্দ্র সেনও মন্তব্য করেছেন—

With Charupath, pt. II. I presume most of my readers are irresistibly of the free use of cane on my back received daily from my Quondam Guru, Bishwambhar Sāha, lame of one leg, for my neglecting the lessons. So Akṣay Datta's scientific primer bears to me many painful associations of early days having been at one time a source of my constant tears in a far truer sense than any work of fiction has ever been to me in my after life."[২]

'চারুপাঠ' দীনেশচন্দ্র সেনের বাল্যকালের স্মৃতির সঙ্গে যে কারণেই বিজড়িত থাকুক না কেন, এ কথা দীনেশচন্দ্র সেন নিজেও স্বীকার করেছেন যে অক্ষয়-

কুমারের বিজ্ঞানসাধনা বাংলা ভাষায় গদ্যের একটি বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এবং দীনেশচন্দ্র সেন অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে প্রকৃত অবদান সে সম্পর্কেও সশ্রদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছেন—

> Akṣay Dutta shows a remarkable hand in another sort of style also. It is that in which he has successfully imitated the style of simple English scientific treatise. In the field of classical Bengali, Vidyāsāgar beat him as he did every other Bengali writer. In the sphere of animated and anglicised romantic style Bankim excelled him and revolutionised our literature in a later age. But in the field of a pure scientific style his was the model which remained almost unrivalled till only lately Rāmendra Sundar Trivedi and his colleague Jagadānanda improved upon it by coining Bengali technical words from classical sources, so needed for the development of our scientific literature. Akṣay Kumār Dutta in the field did the pioneer's spade-work which must be gratefully acknowledged by all.[৩]

৩

প্রকৃতপক্ষে তিনটি প্রত্যক্ষ কারণে অন্তত অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে চির-নমস্য। প্রথমত, বাংলা গদ্যের নির্মাণলগ্নে ভাষা ব্যবহারোপযোগী করে তা ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত স্থাপন অক্ষয়কুমার করেছেন। সুপ্রচুর তৎসম শব্দের বাংলা ব্যবহার করে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য অনাহত রেখেছেন এবং বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা থেকে স্বভাবে স্বতন্ত্র, সেটি উপলব্ধি করে তার স্বতন্ত্র ব্যবহারের রূপ নিয়ে ভাষা-চর্চা করেছেন।[৪] দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান-সাহিত্যধারার প্রথম সার্থক রচয়িতারূপে বাংলা 'পপুলার সায়েন্স'-এর জন্ম দিয়েছেন এবং বিজ্ঞানের ও সাধারণ জ্ঞানের প্রতি বাঙালী পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছেন। সহজ কথায় বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব

ধরে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাধনার প্রথম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার। তৃতীয়ত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বর্ণনা করার জন্যে তাঁকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণ করতে হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার রচয়িতা হিসাবে অক্ষয়কুমারের স্থান বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর, শতাধিক পরিভাষা আছে যেগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়। তিনি তাঁর এই অক্ষয়কীর্তির জন্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বেঁচে আছেন। বাংলাসাহিত্যে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আশ্রয়ে আরও একটি বড় দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। বাংলা গদ্যে প্রথম সুষ্ঠু যতিচিহ্নের ব্যবহার করেন অক্ষয়কুমার। দেবেন্দ্রনাথের নিজ স্বাক্ষর না থাকা 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত রচনাগুলিতেও যতিচিহ্নের সুষ্ঠু প্রয়োগরীতি লক্ষিত হয়।[৫]

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিদ্যাসাগরই প্রথম সুষ্ঠু যতিচিহ্নের ব্যবহারে 'তালমূলক' বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করেন।[৬] বিদ্যাসাগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, ইংরেজী যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে বিদ্যাসাগর ব্যবহার করেন।[৭] কিন্তু বাংলা গদ্যের যতিচিহ্ন নিয়ে সম্প্রতি বিশ্বভারতী পত্রিকায়[৮] ডঃ শিশিরকুমার দাশ, এবং ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে নূতন আলোচনার সূত্রপাত করেন। সুকুমার সেন লিখেছেন—

> অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছেদ চিহ্নের ব্যবহার দীর্ঘ বাক্যের 'সিন্ট্যাক্স'-এর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন।[৯]

কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যেও দীর্ঘবাক্য-সংগঠনপদ্ধতিতে সুষম যতিচিহ্নের ব্যবহারে 'সমতাল' সৃষ্টির অসদ্ভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে বাক্যবয়নের সুষমাসৃষ্টিতে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার উভয়েই কৃতী শিল্পী ছিলেন। অক্ষয়কুমারের যে কোন একটি দীর্ঘ বাক্যই এ মন্তব্যের সমর্থন। যেমন—

> নদীর স্রোতে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষীর নাম

ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ী করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেব।[১০]

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) প্রকাশের পূর্বে ১৮৪৫-এর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যার গদ্যরূপও এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হল।—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই পূর্ণানন্দে সমাধান করি।[১১]

লক্ষ্য করা যাচ্ছে উভয়ের রচনাতেই সুষম যতিচিহ্নের ব্যবহারে ভাষার গতিটিও যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি ভাষার প্রকাশশীলতায় একটি ছন্দস্পন্দও একটি সঙ্গীতময়তার সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য, বাংলা গদ্যকে এই যতিচিহ্নের সুষম ব্যবহারের জন্য বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। সুতরাং এ প্রমাণ থেকে ডঃ দাশের মন্তব্যকে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করে বলা যেতে পারে—

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারে সর্বপ্রথম সচেনতা অবলম্বন করেন।

অসতর্ক, অনিয়মিত যতিচিহ্নের ব্যবহার বাংলা ভাষায় অবশ্য খুবই প্রাচীন। ১৭৪৩-এ রোমান হরফে লিখিত, 'ক্রে পার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'[১২] তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট'-এ (১৮০৩)—

এক বিশিষ্ট গৃহস্থও দেখিলেক যে এক সর্প এক বেড়ার তলায় শীতে জরা হইয়া প্রায় মৃত্যুবৎ হইয়াছে, ইহাতে তাহার দয়া হইল, এবং তাহাকে

ঘরে আনিয়া অগ্নির নিকট রাখিলেক আর টাটকা দুগ্ধ খাওয়াইলেক।[১৩] তত্ত্ববোধিনীকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের সুষ্ঠু প্রয়োগ যে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। অক্ষয়কুমারেরও বহু রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সুতরাং যতিচিহ্নের সার্থক ব্যবহার অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের হাতে হয়েছিল, এরূপ সিদ্ধান্তে আসায় কোন বাধা নেই। ১৮৪১-এ অক্ষয়কুমারের 'ভূগোলে'ও যতিচিহ্নের সুষম ব্যবহার লক্ষিত হয়। সুকুমার সেন উদাহরণও দিয়েছেন—

> পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্ত ব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করতঃ যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ-সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না, অতএব চিত্ত মধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।[১৪]

৪

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নামের সঙ্গে অক্ষয়কুমারেরও নাম চিরকালীন। 'Style is the man' বাক্যের যদি কোন সার্থকতা থেকে থাকে তবে অক্ষয়কুমারের রচনারও একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। একটু তৎসম শব্দ-সমৃদ্ধ, একটু পল্লবিত, কোথাও কোথাও অত্যন্ত বেশী যুক্তিগ্রাহ্য, কোথাও বা, তা একটু অনুপ্রাস, বা রূপক অলঙ্করণে পূর্ণ। বহুদীর্ঘ বাক্যের ব্যবহারও দুর্লভ নয়, তাঁর রচনায় বিরামচিহ্নের মিতব্যবহারে উচ্চারণের স্বাচ্ছন্দ্য, কোমল বা সঙ্গীত-বর্ণের (ল, ম, ন, ণ, শ, ষ, স, প্রভৃতি) ব্যবহারে শব্দের সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ শব্দ, ও শব্দ-সাযুজ্যের নির্বাচনে অক্ষয়কুমারের ভাষা সাধারণ্যে হারিয়ে যায় না। তা ভাষার স্বাতন্ত্র্যে পৃথক। তা চেনা যায়। যেমন নীচের রচনাংশটি।—

> যেদিকে নেত্রপাত করি সেইদিকেই পরমেশ্বরের কার্য্য নয়নের সম্মুখে বর্ত্তমান হয়, সে কার্য্যের প্রত্যেক অংশকে জ্ঞানি (ভু) ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান এবং অপরিমিত দয়াতে পরিপূরিত দেখিতেছেন।

জগতে এমত বস্তুর স্থিতি নাই যাহাতে কোন বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়, এবং কোন বিশেষ উপকার না জন্মে। পৃথিবী, যাহা আমারদিগের গৃহস্বরূপ, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলে মনুষ্যের বসতিযোগ্য হইত না, অথবা আর কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে কৃষিকার্য্যাদি কোন কর্ম্মের উপযুক্ত হইত না। জল, যাহা আমারদিগের জীবনস্বরূপ, কিঞ্চিৎ লঘুতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আমারদিগের গ্রাহ্য হইত না, অথবা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হইলে মনুষ্যাদির পানযোগ্য, মৎস্যাদির স্থিতিযোগ্য, এবং নৌকা চালনাদির উপযোগ্য হইত না। সূর্য্য যিনি সকলের মূলাধার কিঞ্চিৎ নিকটতর হইলে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইত, এবং কিঞ্চিৎ দূরতর হইলে শীত দ্বারা সমুদয় ধ্বংস পাইত। অতএব যিনি পৃথিবীকে যোগ্য, জলকে মৎস্যের যোগ্য এবং মৎস্যকে জলের যোগ্য, চক্ষুকে আলোকের যোগ্য, কর্ণকে শব্দের যোগ্য, নষ্ট হইতে পারে এই বিবেচনায় কোন পুরুষ মনুষ্যকে দুই নেত্রের সহিত ভূষিত করিয়াছেন। নানাদিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন এ নিমিত্তে কোন পুরুষ চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন যে, তাহাকে ইচ্ছামাত্র সকলদিকে চালনা করা যায়? কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্যে কোন পুরুষ তাহার এরূপ কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে?[১৫]

রচনাংশটি যে মূল রচনা থেকে উদ্ধৃত সে রচনাটিতে অক্ষয়কুমারের নাম ছিল না। অথচ রচনাটিতে এমন সমস্ত ভাষাবৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলি একান্ত করেই অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রচনাভঙ্গি। যেমন, তৎসম শব্দের সুপ্রচুর ব্যবহার (নেত্রপাত, নয়ন, স্থিতি, মৎস্য, কর্ম্ম, ভস্মরাশি, চক্ষু, আলোক, নিমিত্ত প্রভৃতি); অবশ্যম্ভাবী তৎসম শব্দের সার্থক ব্যবহার (জল, সূর্য্য, বসতি, পৃথিবী, প্রভৃতি); যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার (নেত্রপাত করি, বর্ত্তমান হয়, দৃষ্ট না হয়, ধ্বংস পাইত, প্রভৃতি); বিশেষণের বহুল ব্যবহার (অখণ্ড জ্ঞান, অপরিমিত দয়া, তেজোহীন নয়ন, সিক্ত নয়ন); শব্দ-সাযুজ্যের নূতনত্ব সৃষ্টি (লঘুজল, কোমল পৃথিবী, গাঢ়তর জল, প্রভৃতি); 'না' অব্যয়ের ব্যবহার (জগতে এমত বস্তুর স্থিতি নাই যাহাতে·········দৃষ্ট না হয়, এবং······না জন্মে); বাক্যবিস্তারে তিন প্রকার রীতির অনুসৃতি;

যথা—১. অসমাপিকা ক্রিয়া, ২. বিশেষ্য, বিশেষণ, এবং সর্বনামের ব্যবহার, এবং ৩. বাক্য-সংযোজক শব্দের দ্বারা (যথা—জল, যাহা আমারদিগের জীবনস্বরূপ, কিঞ্চিৎ লঘুতর হইলে, বায়ুবৎ হইয়া আমারদিগের গ্রাহ্য হইত না, অথবা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হইলে মনুষ্যাদির পানযোগ্য, মৎস্যাদির স্থিতিযোগ্য, এবং নৌকা চালনাদির উপযোগ্য হইত না) ; অনুপ্রাস (আমারদিগের গৃহ-স্বরূপ, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলে কৃষিকার্য্যাদির কোন কর্ম্মের উপযুক্ত হইত না) এবং অন্যান্য অলঙ্কারের ব্যবহার (পরমেশ্বর, ভস্মরাশি, কৃষিকার্য্যাদি প্রভৃতি) ; বাক্যবয়নের ক্রম সাধারণত, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া।

অক্ষয়কুমারের অন্যান্য রচনার বাক্যদৈর্ঘ্যের সঙ্গে বক্ষ্যমাণ রচনা-অংশটিতে ব্যবহৃত বাক্যের দৈর্ঘ্যেরও একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।[১৬] যেমন, উদ্ধৃত রচনাংশে মোট বাক্যসংখ্যা আছে আটটি। প্রতিটি বাক্যে যথাক্রমে ২৮, ১৮, ২৪, ২৯, ২০, ২৯, ২৬, ও ২৮ করে শব্দ আছে। রচনাংশের মোট শব্দসংখ্যা তা হলে ২০২ হয়। অর্থাৎ রচনাংশটির বাক্য-প্রতি গড় শব্দসংখ্যা ২৫.২৫টি। বলা চলে শব্দ সংখ্যানুযায়ী উদ্ধৃত রচনাংশের বাক্যগুলির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ২৫.২৫। এবার অক্ষয়কুমার-রচিত কোন গ্রন্থের যে কোন অংশ থেকে আটটি বাক্য (ধরা যাক, 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগের প্রথম রচনাটিরই 'তথাকার সুস্নিগ্ধ···লাগিলাম', ১, ২ পর্যন্ত আটটি বাক্য) নিয়ে তার দৈর্ঘ্যও স্থির করা যেতে পারে। ধরা যাক, ঐ বাক্য কটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে, ২৫, ২৭, ১৩, ৩৭, ২৭, ২৭, ২২, এবং ২৬, অর্থাৎ বাক্যপ্রতি গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা ২০৪ ÷ ৮ = ২৫.৫। এক্ষেত্রে ২৫কে আমরা অক্ষয়কুমারের বাক্যের সাধারণ দৈর্ঘ্য-মাপ বলে গ্রহণ করতে পারি। এবং পূর্বে উদ্ধৃত রচনাংশটিও যে অক্ষয়কুমারের রচিত সে বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ হতে পারার জন্য আমরা একটি রেখাচিত্রে তার প্রমাণও পেতে পারি। পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ক-খ সরলরেখায় রচনাংশের বাক্যসংখ্যা থাকছে। এবং ক-ক সরল রেখায় বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা, এবং বাক্যপ্রতি গড় শব্দসংখ্যার মান, অর্থাৎ ২৫.৫ বা ২৫ নির্দেশিত অঙ্ক থাকছে। সরলরেখা শব্দসংখ্যানুযায়ী যদি গড়পড়তা শব্দসংখ্যার বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক মানজ্ঞাপক সরল রেখার সমান্তরাল হয়, তা হলে বোঝা যাবে রচনাংশের বাক্যবয়ন একই দৈর্ঘ্যের। যদি বাক্যের দৈর্ঘ্যসূচক মানজ্ঞাপক সরলরেখার ঊর্ধ্বে বাঁক নেয়, তা হলে রচনাংশের

বাক্যের দৈর্ঘ্য সাধারণ মান অপেক্ষা বড়, যদি নীচে বাঁক নেয় তবে সাধারণ মানের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র বাক্য। সাধারণত জাত-লেখকদের রচনার বাক্যগুলির মোটামুটি দৈর্ঘ্যের একটি মান নিরূপিত হয়ে যায়। কারো ১৮টি শব্দের, কারো ২৫টি শব্দের, কারো ৩০, বা ৩৫টি শব্দের দৈর্ঘ্যের বাক্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের রচনায় বাক্যের দৈর্ঘ্য ২৫টি শব্দে নিরূপিত বলে গ্রহণ করা যায়।

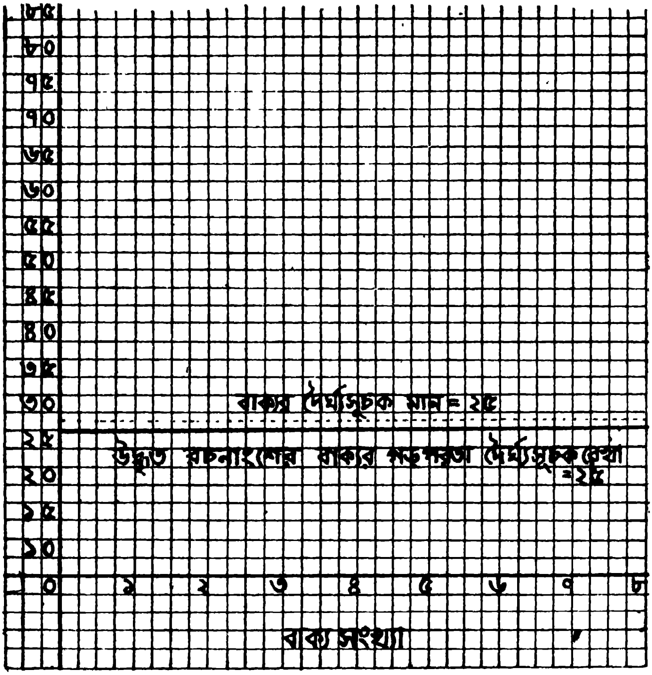

রেখাচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, অক্ষয়কুমারের রচনাংশের যে সাধারণ বাক্য-দৈর্ঘ্য, উদ্ধৃত রচনাংশেরও সেই একই বাক্যদৈর্ঘ্য, কারণ উভয় রেখাই সমান্তরাল হয়েছে বাক্য-সংখ্যাসূচক ভূমির সঙ্গে। অতএব বাক্যের দৈর্ঘ্যের দিক থেকেও উদ্ধৃত রচনাংশটি অক্ষয়কুমারের রচনার চিহ্নই বহন করছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের ব্যক্তিগত রচনার স্বভাবসমৃদ্ধ লেখক উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে খুব কমই ছিলেন। অক্ষয়কুমার সেই স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিত্বপূর্ণ গদ্য-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচনার

স্বকীয়তাই তাঁকে চিনিয়ে দেয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের স্থান চিরকালীন। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে যে প্রচলিত কবিতা আছে তাতে কবিত্ব থাক বা না থাক, অক্ষয়কুমারের অবদানের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অন্তত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কবিতাটি হল—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার ॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায় ॥[১৭]

অক্ষয়কুমারের এই 'অক্ষয় যশের মালা'র জন্য পরোক্ষে দায়ী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫

> সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজ মধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এক কালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্য্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।
>
> —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'চরিতকথা' ১৯১৩,৪৫।

বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও অক্ষয়কুমারের ন্যায় নূতন রস সৃষ্টি করেছেন। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজরূপে সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছিলেন। বুদ্ধিমণ্ডিত জ্ঞানগরিমাপুষ্ট অক্ষয়কুমারের সে দান বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ যেমন, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অক্ষয়প্রতিভা-উন্মেষের সহায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মসাহিত্য-সৃষ্টির অননুকরণীয় ক্ষমতার কাছেও চিরঋণী। হৃদয়-উদ্ভূত বীণার ঝঙ্কারের মত দেবেন্দ্রনাথ তাঁর চিত্ত-উদ্গত অধ্যাত্মচিন্তাকে সাধারণের সামনে প্রকাশ

করেছেন। একটি বিশেষ ধর্মের স্বভাব, তার আচরণবিধি, ভবিষ্যৎ, প্রভৃতির জন্যে যদিও তিনি এই সকল চিন্তাধারার বাণীমূর্তি দিয়েছিলেন, তবুও সেই প্রকাশিত বাণীমূর্তি উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশেষ ধর্মীয় সীমা ছেড়ে নির্বিশেষ এক ধর্মীয় সাহিত্যের রসাস্বাদনের উৎস হয়ে উঠেছে। উপদেশ এবং বক্তৃতাকারে প্রথম রচিত তাঁহার রচনাগুলি সাধারণত পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাসাহিত্যে 'উপদেশ-সাহিত্য' বা 'সারমন্-লিটারেচার' বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা দেবেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি। ধর্মতত্ত্ব, ধর্মকথাও যে সাহিত্যের স্বভাবে বর্ণিত হতে পারে দেবেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এ বিষয় সম্পূর্ণ নূতন। দেবেন্দ্রনাথের অবদান এ ক্ষেত্রে শাশ্বত সম্পদ সৃষ্টি করেছে, বলা চলে। অজিতকুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, এই দুজনেই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া গিয়াছেন। গদ্য রচনারীতির ইঁহারাই প্রথম প্রবর্ত্তক। এই ধারণার মূল আমাদের মনে যতই গভীর হোক না কেন, ধারণাটি যে ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রামমোহন রায় সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্য লিখিবার বেলায় এ ভাষার গঠন যে সংস্কৃতের মত নয়, তাহা মানিয়া গিয়াছেন। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ)। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত সচেতন ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃতের অলঙ্কারের বোঝা বাংলার গায়ে চাপাইলেন, সংস্কৃত রচনারীতির পোষাক বাংলা ভাষাকে পরাইলেন।······
>
> বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতিক্রিয়াতেই এই আলালী ভাষা দাঁড়ায়, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আলালী ভাষার সৃষ্টির পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল।······ তিনি সংস্কৃত রীতি বা গ্রাম্য রীতি কোনটাই অবলম্বন না করিয়া দুই রীতিকে মিশাইয়া দিলেন।
>
> কিন্তু বঙ্কিম এই নূতন রচনারীতির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, তাঁহাকে ইহার প্রবর্ত্তক বলা যায় না।······বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-

> বহুল ভাষা ও আলালী ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা ও রচনাপদ্ধতি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের বাংলা সাহিত্যে অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও ছিল, পরেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মধ্যবর্ত্তী ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।[১৮]

অজিতকুমারের এই অভিমত অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়। বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান চলিত ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহারের জন্য চিরকালীন নয়। কেরীর কথোপকথনের ভাষাতে একাধিক রচনাংশের ভাষায় মৌখিক ভাষার সংলাপ লক্ষিত হয়, কিন্তু তার জন্য কেউ কেরীর কথোপকথনের ভাষাকে চলিত ভাষার সম্মান দেন না। দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে কদাচিৎ কথ্য ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হলেও সেই ব্যবহারকে সচেতন লেখকের ব্যবহার-রীতি বলে মনে করার কোন হেতু নেই। মনে রাখতে হবে দেবেন্দ্রনাথ সচেতন গদ্যলেখক ছিলেন না, স্বতঃস্ফূর্ত ব্রাহ্ম সাধক ছিলেন। সাধকের চিন্তানুভূতিকে তিনি ভাষায় প্রকাশ করতেন উপদেশের জন্য, অথবা ধর্মীয় বক্তৃতার জন্য। কাজেই ভাষা তার শিল্পকলা নয়, ভাব-প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম। চলিত ভাষাই হক, আর সাধু ভাষাই হক, তার ব্যবহার তাঁর রচনায় গৌণ বস্তু। একই কারণে 'বাংলাগদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ' নন। আর অক্ষয়কুমারের ভাষা যে মোটেই সংস্কৃতবহুল নয়, তার প্রমাণ অক্ষয়কুমারের ভাষা-বিশ্লেষণ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তবু তাঁর ভাষা 'চোখে ভাল লাগে, কানে ভাল লাগে'। তাঁর 'ব্যবহৃত শব্দ ও পদগুলি যেমন স্বচ্ছ তেমনি সংক্ষিপ্ত—ঠিক যতটুকুতে পরিষ্কার রূপে ভাব প্রকাশ করা যায় ততটুকু—তার বেশী নয়'।[১৯] তার কারণ তাঁর ভাষার স্টাইল। দেবেন্দ্র-রচনার স্টাইল দেবেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করে। একদিকে তাঁর জীবনে যেমন কোমল নির্লিপ্ততা ছিল, অন্য দিকে যেমন কঠোর অনমনীয়তাও ছিল[২০], তেমনি তার ভাষার মধ্যেও যেন দুটি সুর পাশাপাশি বেজেছে। একটি সঙ্গীতের সুর, অন্যটি চিন্তার সুর। একটিতে সঙ্গীতের 'বেদনা ও বেগ' অন্যটিতে অধ্যাত্ম-রসানুসন্ধানের প্রকাশ। তবে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ধর্মসাহিত্যের নূতন প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ভাষাতেও বহু সুন্দর সুন্দর নূতন শব্দ-সাযুজ্যের, সমাসোক্তি অলঙ্কারের, এবং অনুপ্রাসের সার্থক ব্যবহারও বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ভাষার নব অধ্যায়

সৃষ্টি করল। ভাষার রূপ ও শব্দ, অর্থ ও আবেদন দেবেন্দ্র-রচনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রে সন্নিবেশিত করল।—

সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল।[২১]

দেবেন্দ্রনাথের এই যে ভাষা, এর কোন পূর্ব-ইতিহাস নেই। 'লেবু ফুলের গন্ধ' 'সুগন্ধের হিল্লোল' প্রভৃতি পদগুচ্ছের যে শাব্দিক সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা গদ্যসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্বকীয়তারই সমর্থন। তাঁর সমকালীন যুগে বাংলা গদ্যের জগতে এ আস্বাদ অনাস্বাদিত ছিল। 'নিবিড় অন্ধকার', 'দীপ্তিমান কোটি কোটি সূর্য্যের উদয়' 'অনন্ত আকাশ', 'বিকম্পিত নীহারিকা', 'ইন্দ্রিয়ের অগোচর', 'আকাশ জ্যোতিষ্মান', 'ঈশ্বর স্পৃহা', 'দ্যুলোক ভূলোক', 'রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ', 'সর্ব্বলোক-মহেশ্বর', 'বিষাদ সাগর', 'আত্মার প্রাণ', 'তিমিরাবৃত', 'লোক লোকান্তর', 'আলোকময়', 'অনির্ব্বচনীয়', 'অমৃত' প্রভৃতি বহুসংখ্যক নূতন শব্দ-সাযুজ্য ও পদগুচ্ছের ব্যবহার দেবেন্দ্র-রচনার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। বিরতিচিহ্নের সুষম ব্যবহারে, বাক্যবিন্যাসের সরলতায় দেবেন্দ্র-রচনার ছন্দসৌন্দর্য সৃষ্ট হয়েছে অনস্বীকার্যভাবে।

তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অমরতার কারণ, তাঁর প্রায় অননুকরণীয় রচনাদর্শের পুষ্পিত অনুবৃত্তি পুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে সম্ভাবিত হয়েছিল।

একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সামান্য আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

তাঁহার অসামান্য ক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই।[২২]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এই অবিচ্ছিন্নধারা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পিতাপুত্রের রচনার ভাষায় ও ভাবে কী গভীর মিল তা উভয়ের রচনাংশ পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যেতে পারে। নীচে কয়েকটি রচনাংশ তোলা হল।—

হে বিশ্ববিধাতা জগৎ-পিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে, আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক,

উষা মধু হউক, দ্যুলোক ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক, পিতা তোমার মধুময় মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করুন।[২৩] —দেবেন্দ্রনাথ

হে বিশ্ববিধাতা, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও— মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দাও। ·· ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধবী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু-হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য মধুমান হউক, এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক।[২৪] —রবীন্দ্রনাথ

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে পিতা ও পুত্রের ঈশ্বরবোধেরও মিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ঈশ্বর হইতে যে বিচ্যুত রহিয়াছে, সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে আর হৃদয়ে অনুভব করিতে পায় না। সে অমৃতের অভাবে এই জগৎ সংসারকে শ্মশানতুল্য বোধ করে। মৃত্যুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অমৃতের ভাব উদয় হয় না। সে শরীরের অস্থি চর্ম্ম মাংসই দেখে,—অন্তরের আত্মাকে দেখে না। তাহার নিকটে পরলোক প্রকাশ পায় না। সে মোহান্ধ হইয়া মনে করে, পৃথিবী পর্য্যন্তই জীবন, মৃত্যু হইল তো শেষ হইল।[২৫]

আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের উপরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধ'রেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।[২৬]

রবীন্দ্রনাথও তাই বিশ্বাস করেছেন—

এই-যে দ্বন্দ্ব, মৃত্যু' এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ—এই-যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি।[২৭]

আবার পিতা লিখেছেন—

> ঈশ্বর অমৃতের পরম সেতু, কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল অমৃত-সেতু বলিলেই তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ পায় না, তিনি অমৃত-নিকেতন। তিনি নিজেই অমৃত। এই সমাজ হইতে যেরূপ ঈশ্বরের বিমলস্তুতিবাদ ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার তিনিও এই সমাজ-মন্দিরে চতুর্দ্দিক হইতে অমৃত-ধারা বর্ষণ করেন।[২৮]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ......, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।[২৯]

দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান', 'ব্রাহ্মধর্ম্ম', এবং রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৯১৬) ভাবে, ভাষায় একই গোত্রের বলা চলে। দেবেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষার পাশে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি-নিকেতনে'র ভাষাদর্শ রেখে বিচার করলেই মন্তব্যের যাথার্থ্য পাওয়া যেতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে' লিখেছেন—

> ভূলোকে, দ্যুলোকে, আকাশে-অন্তরীক্ষে, উষাকালে, সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ বীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণীদিগকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তুসকলকে রূপবান করে, তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান স্মরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। তিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমারদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরমুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমারদের নিকট প্রকাশিত হন। আমারদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমারদের উপর স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্বত্রই রহিয়াছে।[৩০]

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনে' লিখেছেন—

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্য্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহ-তারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্রতো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে। যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্য্যেরও গতি।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদ সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে আমার সমস্ত আনন্দই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব—একেই বলে পার হওয়া।[৩১]

পিতা ও পুত্রের রচনার এই সাদৃশ্য উভয়ের লিখিত পত্রসাহিত্যের মধ্যেও লক্ষিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা পাশাপাশি রেখে দেখলেই এই মিল নজরে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছেন—

মেদিনীপুরে রৌদ্রের সময় তো বড় উত্তাপ হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে মেদিনীপুর বোধহয় শরীরের পক্ষে সুখদায়ক নহে, তবে সেখানে সুস্থতা থাকিলেও থাকিতে পারে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এবার কলিকাতায় বৃষ্টি হয় নাই, রৌদ্রের উত্তাপ দিন দিন বাড়িতেছে। হিমালয়ে যেমন আমার মস্তিষ্ক জমিয়া গিয়াছিল, এখানে সেইরূপ গলিয়া যাইতেছে।[৩২]

এই হাস্য-পরিহাসের সুরেই রবীন্দ্রনাথও চিঠি লিখেছেন, যেমন—

······ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধ'রে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্ফড়্ করে ওঠে। অনেকক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম—হাওয়াটা কিছু বেশী খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল 'এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব—তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।' আমরা কিনা প্রকৃতির নাতিসম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাসা করে থাকেন।[৩৩]

প্রকৃতি-বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথের চিঠি—

> সম্প্রতি এখানে বর্ষাকাল বিরাজমান, পর্ব্বত হইতে বাষ্পসকল অনবরত নির্গত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদায় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। …অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে…। প্রতি পর্ব্বতই মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই।[৩৪]

পিতার এই প্রাকৃতিক বর্ণনার পাশে পুত্রের প্রাকৃতিক বর্ণনার পরিচিতিটি এবার লক্ষ্য করা যেতে পারে—

> কাল বিকালের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্য্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধী ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই—কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেবতাকেও ধরা উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল বেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই, এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে আছে সেগুলি ঝক্ঝক্ করছে।[৩৫]

শব্দচয়নে, শব্দ-সাযুজ্যে, বিশেষণ-নির্বাচনে, অব্যয়-প্রয়োগে পিতা ও পুত্রের ভাষাগত এত সৌসাদৃশ্য যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের রচনা অন্যতম বড় প্রেরণাস্থল এরূপ মনে করার যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশেষণ এবং শব্দ-সাযুজ্যের ব্যবহার, 'জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত ও গলিত বৃদ্ধ দেহখানি', 'অকর্মণ্য—আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত—আকাশপূর্ণ

মনের ভাব', বা 'বহুদূর পর্যন্ত সাদাবালি ধূ ধূ করছে', 'নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতি' বা অব্যয়-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, 'দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধূ ধূ করছে, তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু—সেবারকার চরে মাঝে মাঝে বন ঝাউ ছিল, এবার তাও নেই।'

আবার দেবেন্দ্রনাথের রচনায়, 'অতি প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল', 'সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তরের, একটি তৃণ নাই, না ফুল আছে, না ফল আছে, কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।' ('আত্মজীবনী', ৮০)। বা 'অমর, অশোক, অভয়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর', বা 'অন্ধ অন্ধকার', 'লেবুফুলের গন্ধ।'

এজন্যেই মহর্ষির সাধক চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর পুত্র, জগৎখ্যাত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাষাদর্শ থেকে বহু দূরের নয়, খুবই নিকটের, অন্যতম প্রেরণাস্থল, আদর্শরূপ এরূপ মনে করতে বাধা নেই। অন্তত ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উভয়ের ভাষাগত সাদৃশ্য যা ধরা পড়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীতে তাঁর পিতৃদেবের রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থগুলির এবং লিখিত পত্রগুলির যথেষ্ট প্রভাব যে আছে তা প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান এই কারণে শাশ্বত। পত্রসাহিত্য-স্রষ্টা, আত্মজীবনীকার, এবং ধর্মীয় সাহিত্যস্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ, উত্তরকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূর্যকান্ত-মণি, পুত্র রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আদর্শস্থল রূপে কালান্তর লেখক, নবদিগন্তের উদ্ভাসক। অক্ষয়কুমার এই পুরুষের ছত্রছায়ায়, তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় একই সঙ্গে বড় হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম লক্ষ্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, উপলক্ষ সাহিত্য-সাধনা যুগক্ষয়ে লক্ষ্যবস্তুরূপে প্রতিভাসিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী 'হিউম্যানিস্ট' ছিলেন। বিশেষ কোন ধর্মসীমায় তিনি সংলগ্ন থাকতে পারেন নি। মন্ত্র পড়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেও প্রার্থনার প্রয়োজন যে নেই, তা প্রমাণ করতে বীজগণিতের সমীকরণের উদ্ভাবনও করেছিলেন। হাত তুলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ধারণে অগ্রণী হয়েছিলেন। শেষ বয়সে মনুষ্যত্ববোধে দেহমন সঁপেছিলেন। অতএব তাঁর কর্ম ও সাধনার মধ্যে

এই মানবপ্রীতিবোধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি মানবকল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিলেন। অনিবার্যভাবে তাই অক্ষয়কুমারের রচনাগুলির মধ্যেও একটি সর্বজনীন মানবজীবনের প্রয়োজনের দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। বিশেষ কোন ধর্মীয় সংস্কারের সীমায় তা সীমিত ছিল না। অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের অত বড় হোতা দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাগুলিই প্রায় ধর্মবিষয়ক উপদেশ, বা বক্তৃতাকারে রচিত হলেও গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাব এরূপ যে সেগুলি সর্বজনীন সাহিত্যরসগন্ধী, চিরকালের সম্পদ। বাংলা গদ্যসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির ভাষার সঙ্গীত, রূপকল্প, আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য এত বেশী যে, যে কোন ধর্ম-অবিশ্বাসী, নাস্তিক ব্যক্তিও এই রচনাগুলির আস্বাদনে সাহিত্যরসপুষ্ট হতে পারেন। একটি নির্লিপ্ত পুরুষের চিত্ত-উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্যসাহিত্যের সম্পদ। অক্ষয়কুমার যেমন বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিজ্ঞানসাহিত্যের স্রষ্টারূপে সম্মানের অধিকারী, তেমনি ধর্মসাহিত্যের স্রষ্টারূপে দেবেন্দ্রনাথও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর লেখক। বিজ্ঞানসাহিত্য রচনায়, নীতি রচনায়, বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনায়, তথা ভারতের ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনায় অক্ষয়কুমার যেমন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, তেমন দেবেন্দ্রনাথ পত্রসাহিত্যের সৃষ্টিতে, আত্মজীবনী রচনায় এবং ধর্মসাহিত্য সৃষ্টিতে ঊনবিংশ শতকের (প্রথমার্ধের) শ্রেষ্ঠ মরমী গদ্য-রচয়িতারূপে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, তেমনি উভয়েই বাংলা গদ্যের রূপজ সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে, ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিসম্পদ-সৃষ্টিতেও সার্থক শিল্পী ছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের বাক্যবয়নের অস্থিরতা, শব্দ-সম্পদের অপটু ব্যবহার (যা তখন অনিবার্য ছিল), ভাষার প্রকাশশীলতার দৈন্য, সমস্তই অক্ষয়-দেবেন্দ্র-সৃষ্ট বাংলা গদ্যে অপসৃত হয়ে ভাষার সহজ সৌন্দর্য ও শক্তিতে, ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভাষার সংগীত-সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। নূতন শব্দসম্ভার রচিত হয়েছে। তার সার্থক ব্যবহারও হয়েছে। বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়ও যেমন, তেমনি ভাষার স্বচ্ছন্দগতি সৃষ্টিতে, ছন্দসম্পদ সৃষ্টিতে, সুষ্ঠু সুষম যতি-বিন্যাসের মাধ্যমেও এই অক্ষয়-দেবেন্দ্র বাংলা গদ্যের স্বাতন্ত্র্য, এবং সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে

অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যের দুজন লেখকের নাম মাত্র নয়, সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য অধ্যায়ও। বাংলা গদ্যের দুই সার্থক শিল্পী।

১। Dutt. R. C., *Literature of Bengal*; 1895, 167-68.

২। Sen D. C., *Bengali Prose Style*, Calcutta, 1921, 141.

৩। *Ibid.*

৪। " 'ধনী', 'মানী', 'জ্ঞানী' প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দগুলি বাঙ্গালায় কেবল কর্তৃকারকের এক বচনে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র হ্রস্ব ইকারান্ত হইত। ইনি সে প্রয়োগ রহিত করিয়া সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত নিয়ম করেন।"

—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, ৩৪। দ্রঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৫৩ ফাল্গুন।

৫। রচনাগুলি দেবেন্দ্রনাথের, তার প্রমাণ, প্রথমত দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলিতে পরে (যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম : বঙ্গানুবাদসহ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান) ঐ একই রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যেও দেখা যায় ঐ রচনাগুলি এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির রচনা মূলত একই রীতির।

৬। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৯৩৪, ৪২।

৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর (১ প্রকাশ ১৮৯৫), কলিকাতা, ৭ম সংস্করণ (১৯২৯), ১৮০।

৮। ২০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অক্টোবর—ডিসেম্বর ১৯৬৩, এবং ২০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪।

৯। সুকুমার সেন, 'ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন' : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা (১৯৬৪), ২৮৯।

১০। অক্ষয়কুমার দত্ত, ডেভিড্ সাহেবের বক্তৃতা (১৮৪৫), ৫-৬।

১১। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ৩০ সংখ্যা ১ মাঘ, ১৮৪৫ (১৭৬৭ শক), ২৫৭।

১২। মূল রোমান হরফে, *Crepar Xastrer Orth, Bhed* (1743),
দ্রঃ সুকুমার সেন, 'ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন' : বিশ্বভারতী পত্রিকা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪, ২৮৯।

১৩। তদেব, ২৯১।

১৪। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ৫৩ 'ভূগোল' ভূমিকা। ('ভূগোল' ১৮৪১। বইটি সাধারণ বা জাতীয় পাঠাগারে এখন দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থখানি চোখে দেখবার সুযোগ হয় নি)।

১৫। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১ অগ্রহায়ণ, সংখ্যা, ১৮৪৩, ২৫-২৬।

১৬। Morton, A. Q., *Graphs to detect the identity of classical authors*.

১৭। হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা-পরিচয়, ১৯৫২, ৩২৬।

তুঃ— অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্টভাষা করেছে সংহতি॥
বাহ্যবস্তু ধর্ম্মনীতি চারুপাঠ-চয়।
এডিসন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয়॥
—দীনবন্ধু মিত্র,—সুরধুনী কাব্য (১৮৭৬), দশম সর্গ।

১৮। অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬, ৭২৪-২৬।

১৯। তদেব, ৭৩০।

২০। '...আমার যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, জমিদারীর খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয় পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌর-পরিবারের সূর্য—স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (র. র. শ. সং), ৫৮০।

২১। আত্মজীবনী, ১৮৮।

২২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পূর্বে উল্লিখিত. ৪৬।

২৩। অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ১২৪।

২৪। রবীন্দ্রনাথ, পূর্বে উল্লিখিত, ৩৭২-৭৩।

২৫। অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ৫০-৫১।

২৬। আত্মপরিচয়, (র. র. শ. সং), ২০১।

২৭। তদেব।

২৮। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ১৮৬১, ১২৪।

২৯। রবীন্দ্রনাথ, পথের সঞ্চয়. (র. র. শ. সং) ৯৪১।

৩০। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ১৮৬১, ৬।

৩১। শান্তিনিকেতন, (র. র. ১৩), ৫০৭।

৩২। পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ২০, ২৪ চৈত্র ১৮৫৯।

৩৩। ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২১, কলকাতা, ১৮৯১।

৩৪। পত্রাবলী ৫০/১ শ্রাবণ, ১৮৫৮।

৩৫। ছিন্নপত্রাবলী ৯৬/১১মে ১৮৯৩।

DIRECTIONS
for
A RAILWAY-TRAVELLER.

বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ

অর্থাৎ

যাঁহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন ক-রেন, তাঁহাদের তৎ-সংক্রান্ত বিঘ্ন নিবারণের উপায় প্রদর্শন

শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত

১৭৭৬ শকাব্দ মাঘ মাস

চিত্র ৭ নমুনা: অক্ষয়কুমারের 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' ১৮৫৫
গ্রন্থের টাইটেল পেজের প্রতিলিপি

পরিশিষ্ট

অক্ষয়-রচনায় ব্যবহৃত পরিভাষার একটি বিস্তৃত তালিকা

Adhesiveness আসঙ্গলিপ্সা
Aeroplane ব্যোমযান
Agricultural Institution কৃষি-বিদ্যালয়
Agricultural Science কৃষিবিজ্ঞান
Air বায়ু
Air Bladder বায়ুকোষ
Air Pressure বায়ুভার
Air Line শূন্যমার্গ
All Common People সর্বসাধারণ লোক
Amendment সংশোধন
Analysis ব্যবচ্ছেদ
Animalcule কীটাণু
Animate সজীব
Annular Eclipse আংশিক গ্রাস
Anniversary সাম্বৎসরিক
Appetite for Food বুভুক্ষা
Art Gallery চিত্রশালা
Astar গ্রহ
Astrology জ্যোতির্বিদ্যা
Astronomy জ্যোতির্বিদ্যা
Astronomist জ্যোতির্বেত্তা
Atmosphere বায়ুমণ্ডল
Atom পরমাণু
Atomic পরমাণুবৎ
Attraction আকর্ষণ
Attribute গুণ
Author গ্রন্থকর্তা

Balloon বেলুন যন্ত্র
Beak চঞ্চু
Bed Cover শয্যার আস্তরণ
Bee Hive মধুক্রম
Belly উদর
Benevolence উপচিকীর্ষা
Bicuspid দ্বিশিরা
Bill চঞ্চু
Binocluar দৃষ্টিযন্ত্র
Biography জীবনচরিত
Blood purification শোণিত-সংস্কার
Body শরীর
Botany উদ্ভিদবিষয়ক বিদ্যা
Brain মস্তিষ্ক
Branches শাখা
Breast বক্ষঃস্থল
Bridge সেতু
Bubble বুদবুদ
Burial ground সমাধিস্থান

Capital রাজধানী
Carbon অঙ্গার
Carnivorous মাংসাশী
Casual দৈবাৎ
Causation কার্যকারণভাব
Cautiousness সাবধানতা
Centre কেন্দ্র
Centrifugal কেন্দ্রবিমুখী
Centripetal কেন্দ্রাভিমুখী
Characterisation চরিত্রবর্ণন
Chemistry রসায়নবিদ্যা
Chest বক্ষ
City নগর
Civilization সভ্যতা
Climb আরোহণ
Cloud মেঘ
Cloud formation মেঘোৎপত্তি
Coldproof শীতনিবারক
Combativeness প্রতিবিধিৎসা
Combustible দাহ্য পদার্থ
Community জনসমাজ
Coral প্রবাল
Coral Island প্রবাল দ্বীপ
Congested সঙ্কীর্ণ
Contamination দূষিত
Conscienceness ন্যায়পরতা
Consumer's Goods ভোগ্য বস্তু
Craftsmanship শিল্পনৈপুণ্য
Cultivation চাষ
Current স্রোত

Dam সেতুবন্ধন
Days বার
Day & Night দিবারাত্র
Dependent পরাধীন
Destruction জিঘাংসা
Dew-drop শিশিরবিন্দু
Diameter ব্যাস, পরিধি
Digestion জীর্ণ, পরিপাক
Drainage পয়ঃপ্রণালী
Eclipse গ্রহণ
Economical suffering ধনকষ্ট
Economics ধনবিদ্যা
Elastic স্থিতিস্থাপক
Electricity তড়িৎ
Electric Contraction তাড়িতাকর্ষণ
Electric Conductor তাড়িত-পরিচালক
Electric Current তাড়িত-প্রবাহ
Electric Repulsion তাড়িত-বিয়োজন
Elements রূঢ় পদার্থ
Embryo ভ্রূণ
Epicurianism সুখসম্ভোগ
Equal status সমতাবস্থা
Equilibrium সমসংস্থান
Eventuality ঘটনাভাবকতা
Export Import গমনাগমন

Faculty জ্ঞাত
Faculty of Colouring বর্ণনাভাবকতা
Faculty of Comparison উপমিতি
Faculty of Form আকারানুভাবকতা
Faculty of Language ভাষাশক্তি
Faculty of Number সংখ্যা
Faculty of Size পরিমিতি
Faculty of Time কালানুভাবকতা
Faculty of Tune স্বরানুভাবকতা
Faculty of Weight গুরুত্বানুভাবকতা
Faculty of Wonder আশ্চর্য
Fairy Tale অত্যদ্ভুত উপাখ্যান
Family maintain পরিবার-প্রতিপালন
Fat চর্বি, মেদ
Fauna প্রাণীপুঞ্জ
Figure আকার
Fin পক্ষ
Firm বাণিজ্য
Firmness অধ্যবসায়
Fog কুজ্ঝটিকা
Forehead ললাট
Freedom of Trade বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা
Friction ঘর্ষণ
Full Moon পূর্ণিমা

Galaxy ছায়াপথ
Gallery সোপানাসন
Gas বাষ্প
Geography ভূগোল
Geology ভূতত্ত্ব
Glass কাঁচ
Gravitation মাধ্যাকর্ষণ

Habituated স্বভাবসিদ্ধ
Hail শিলাবৃষ্টি
Headline শিখর দেশ
Healthy Talk সদালাপ
Hereditary Distinction বংশমর্যাদা
High Land উচ্চভূমি
Historian ইতিহাসবেত্তা
Hotel পান্থশালা
House Building গৃহনির্মাণ
Hotspell উষ্ণবায়ু
Hotspring উষ্ণপ্রস্রবণ
Human Life মানবজন্ম

Ice বরফ
Ideality শোভনভাবকতা
Idiot জড়ময়
Inanimate নির্জীব
Income ধনোপার্জন
Industry শিল্পকার্য
Inhabitiveness জিগীষা
Intellectual বুদ্ধিজীবী

Intestine অন্ত্র
Interdependent পরাধীন
Island দ্বীপ

Kindergarten শিশুশিক্ষালয়

Labourer শ্রমোপজীবী
Labour pain প্রসববেদনা
Language study ভাষাশিক্ষা
Length দৈর্ঘ্য
Lightning বিদ্যুৎ
Literature সাহিত্য
Love of approbation লোকরাগপ্রিয়তা
Love of life জিজীবিষা
Low land নিম্নভূমি
Lying in hospital সাধারণ সূতিকাগার

Machine শিল্পযন্ত্র
Mechanism শিল্পবিদ্যা
Medicine ঔষধ
Memory স্মৃতিশক্তি, স্মরণশক্তি
Mental labour মানসিক পরিশ্রম
Mental philosophy মনোবিজ্ঞান
Mesmerism মৈস্মরতত্ত্ব
Microscope অনুবীক্ষণ
Muscle মাংসপেশী
Mythology পুরাবৃত্ত

Natural নৈসর্গিক
Natural History প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত
Natural Constitution প্রকৃতি
Nerve ধমনী
Newspaper সংবাদপত্র

Oasis মরূদ্যান
Ocean সমুদ্র
Organic শারীরিক
Origin উৎসেধ
Orphan Asylum অনাথনিবাস
Over-eating অতিভোজন
Ovary বীজকোষ

Parasite পরতন্ত্রী
Patriotism দেশহিতৈষণা
Petal পাপড়ি
Phrenology হৃত্তত্ত্ববিবেক
Physical ভৌতিক, শারীরিক
Physical labour শারীরিক শ্রম
Physical law শারীরিক বিধান
Physical structure শারীরিক গঠন
Physicist পদার্থবিদ্যা-বিশারদ
Physiology শারীরিক বিধানবিদ্যা
Picturesque চিত্রময়
Pillar স্তম্ভ
Point বিন্দু
Polestar ধ্রুবতারা
Politics রাজনীতি

polygamy অধিবেদন
Polytechnique শিল্পবিদ্যালয়
Prejudice কুসংস্কার
Proboscious শুণ্ডশালী
Promotion পদবৃদ্ধি
Province প্রদেশ
Public law রাজনিয়ম
Published মুদ্রিত

Quadruped animal চতুষ্পদ জন্তু

Rail বাষ্পীয় পোত
Rainbow রামধনু
Recognised অনুমোদিত
Republic সাধারণতন্ত্র
River নদী
Round shape গোলাকৃতি
Sandy soil বালুকাভূমি
Science বিজ্ঞান
Science of morals আত্মপ্রসাদ
Semantics শব্দবিদ্যা
Sensuousness রিপুপরতন্ত্রতা
Size আয়তন
Skeleton অস্থি
Social System সামাজিক ব্যবস্থা
Society সমাজ
Solar System সৌরজগৎ
Solar rainbow সৌর রামধনু
Soldier সৈনিক
Solid কঠিন
Star নক্ষত্র
State রাজ্য
Stomach পাকস্থলী
Sulphur গন্ধক
Sun Eclipse সূর্যগ্রহণ
Sunset সূর্যাস্ত

Tail পুচ্ছ
Thunder বজ্র
Thunderstroke বজ্রাঘাত
Tide জোয়ার
Timid nature মৃদুস্বভাব
Torch মশাল
Trade বাণিজ্য
Tropical Country উষ্ণদেশ
Tropics উষ্ণস্থান
Tunnel সুড়ঙ্গ

Vapour বাষ্প
Vegetarian Diet নিরামিষ ভোজন
Village গ্রাম
Volcano আগ্নেয়গিরি

Water current জলস্রোত
Waterfalls জলপ্রপাত
Water Particle জলকণা
Whirlwind ঘূর্ণিবায়ু
Widow marriage বিধবাবিবাহ
Witness সাক্ষ্যদান
Women Education স্ত্রীশিক্ষা
Word Order শব্দবিন্যাস অবয়ব-সংস্থাপন

নির্ঘণ্ট

'অক্ষয়চরিত', ১৪, ৪০ পা, ৩২১ পা
'অচলায়তন', ২১১ পা
অজিতকুমার চক্রবর্তী, ২৬, ৪৩ পা,
১৩০ পা, ১৯৪, ২০২ পা, ৩১২,
৩২২ পা,
অর্ধতৎসম, ১৫৫ পা
'অনঙ্গমোহন', ৭
অন্নদাশঙ্কর রায় ২০১ পা
অনাথনাথ বসু ৮০ পা
অনুচ্ছেদ ১২০, ১৫২-২৪১,
২৭৬-৮২
অনুপ্রাস ১৫৪, ২৭৬-২৮১, ৩১৩
'অনুষ্ঠান পদ্ধতি' ২০২ পা, ২৫৬, ২৫৯,
২৬৩, ৩২২ পা,
অভয়াচরণ চক্রবর্তী ৯৯ পা
'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' ১১৪
'অমরকোষ' ১০৯
অমলেন্দু বসু, ২৯৭ পা
অলকাসুন্দরী দেবী ১১, ২৪০ পা
অলঙ্কার ২৮৪—২৮৮—২৯৭
অসীরিস্ ১৫১

আইনষ্টাইন ১৮৮
আইসিস ১৪১
'আত্মকথা' ৬৬ পা
'আত্মচরিত' ১৯২, ২১৫, ২১৭, ২১৮
'আত্মজীবনী' ৩৬ পা, ১৬, ৪০ পা,
৪৩ পা, ৮১ পা, ২১২-২৪০,
২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৫৬, ২৬৮,
২৭০, ২৮৯-২৯৩, ৩২২ পা
'আত্মপরিচয়' ৩২২ পা,
'আত্মীয়সভা' ৪৫, ২২, ২৩, ২৫, ৩১,
৩৫, ৩৭
আদিব্রাহ্মসমাজ ৩৭,
'আধুনিক বাংলাছন্দ' ১৫৫ পা,
আনন্দচন্দ্র বসু ২৪; ৪৩,
আনন্দমোহন বসু ৩৩, ৩৬
আঁদ্রে মরিস্, ২১৩
আমহার্স্ট (লর্ড) ১, ২, ৬৯
'আমার জীবন' ২১৫-১৬, ২৩৫
আমিউদ্দীন ১
আলালী ভাষা ৩১২-৩১৩
আলেকজাণ্ডার ডাফ ৫, ২১, ২৯,
৩০, ২১৯

ইএটস্ ৮৩
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০, ১৮, ২৯
'ইজিপ্টেপুরাবৃত্ত' ১০১,
'ইতিহাস সমুচ্চয়' ১০১
'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' ৩২
ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ১৯২
ইয়ং বেঙ্গল ৩, ৪০ পা, ৮৬

ইয়েটস্ ১০, ৭০, ১৩৮
'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' ১০১,

'ঈশপ্স্ ফেবল্স্' ৮২, ১৫৪
ঈশানচন্দ্র বসু ২২
ঈশ্বর (চন্দ্র) গুপ্ত ৭-৯, ২১, ৭৬, ৩০০
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৪, ২৪

উইলসন (এইচ,এইচ,) ১০৮, ১১০, ১১২ ১১৮ পা,
উইলিয়ম ৫৩
উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮
উইলিয়ম ইয়েটস্ ৫১, ৬৫ পা, ৭০
উইলিয়ম হপ্কিন্স্ ৬৯
'উপদেশ কথা' ৮২
'উপবেদ' ৬৮,
উপমা ১৬৪, ২৮৮, ২৯২-৯৭, ২৯৮ পা।
উপহার ১৯২
উমেশচন্দ্র দত্ত ৩৩
উমেশচন্দ্র সরকার ২১, ২৭, ৩৪

এইচ্, এইচ, উইলসন, ৫২, ১১১, ১১২, ১০৮, ১১৮ পা।
'এক্ষণ' ৬৬ পা, ৮৮ পা।
'এডিসন্ অফ্ জাষ্টিস্' ৫৫
এসিয়াটিক রিসার্চ ৫২, ১০৫
এসিয়াটিক সোসাইটি ১৪

এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন্ ৩
এ্যাডাম ১৯, ৮১ পা।
এ্যাডিসন ৫৫
এ্যাংলো হিন্দুস্কুল ১০, ১৩
এ্যালফ্রেড্ ২১৩

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' ৮২, ১৫৪, ৩০৬
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ৬
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ২২২

'ঔষধসার' ৭০

'কঠোপনিষদ' ১২, ৪১ পা।
'কথাকলা' ১৫৫
'কথোপকথন' ৩১৩
'কবিতামৃত কূপ' ৮৩
কমললোচন বসু ৫, ২২
কার-ঠাকুর কোম্পানী ১০, ১৮, ২৯
কালিদাস ১১৪
কিজো ইনাজু ১৯৩
'কিমিয়বিদ্যাসার' ৫০, ৭০, ১৬৮, ১৭২
কিশোরীচাঁদ মিত্র ৬৪, ২১৯,
কুম ৭৭
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' ৩০৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১, ২১২
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ২১৫, ২৩৮ পা।
কেন্দুবিল্ব ১১৩

কেরি ২৫, ৬৯, ১৭৫, ১৭৯-৮১,
১৮৩, ৩১৩
কেশবচন্দ্র সেন ৪, ২৩, ৩২, ৩৭, ৩৮
কৌটিল্য ৬৮, ৮৮
'খ্রীষ্ট মাহাত্ম্য' ১০১

গদ্যছন্দ ২৭০-৭৬
'গল্পগুচ্ছ' ১ ৫ পা
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩০
গিলক্রিষ্ট ৮২
'গীতাঞ্জলি' ২৪০ পা
গুরুচরণ সরকার ১
গোপাল ১০৮
গোপীচন্দ্র সেন ১০১
গোপীনাথ তর্কালঙ্কার ১
গোলকনাথ শর্মা ৮৯
গৌরমোহন আঢ্য ৬
'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৬৫ পা, ১৬৮
'গ্যালিলিও চরিত্র' ১০১, ২১২
গ্যেটে ২১২, ২১৮
গ্রাণ্ট (ডঃ) ৭০

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৫, ৩২১ পা
'চর্যা' ৬৮, ১৬৭
'চরিতকথা' ৩০১
'চরিত্র সংগ্রহ' ২১৩-১৪, ২৩৮ পা
চলিত বাংলা ১৩৪, ৩৬৭
চসার ১০৮
'চারিত্রপূজা' ৩২২ পা
'চারুপাঠ' ১৫ ১৬,৩৩,৪৪ পা, ৪৮,৪৯,
৫২,৫৪,৫৫,৫৯,৬৪-৬৭,৭২,৭৩,৭৯,
৮৩,৯৭,১২২,১৩৬,১৪১,১৫৭,১৬১-
১৬৩,১৬৫,৩০০,৩০৩
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১ পা
চিত্রকল্প ২৮৯-২৯৫,২৯৭ পা-২৯৮ পা
'চোখের বালি' ৬৫ পা
চৈতন্যচরিতামৃত' ২১২
চৈতন্যদেব ২১২
চৈতন্যভাগবত' ২১২

'ছিন্নপত্রাবলী' ২১০ পা,-২১১ পা,
৩২২ পা,

জগদানন্দ—৩০২,
জগদীশচন্দ্র—২৯৭,৩০২,৩০৪
জীবনানন্দ দাশ—২৯৭ (পা)

টার্ণার ৮২

ঠগীদমন আইন ১৯

ডাফ্ (আলেক্সণ্ডার) ২৬,২৭
ডিরোজিও ৩,৪,১০,১৮,৩৯ পা, ৮৬,
৮৯,১৬৮
ডিয়ালট্রি ৮৬,
'ডেভিড্ বক্তৃতা' ১৬,৪৫-৪৭,৫৪,৫৫,
৬৩-৬৫,৬৭ পা, ৭২,৮৬
ডেভিড্ হেয়ার ২, ৩০৬, ৩২১ পা,

'তত্ত্বকৌমুদি' ৪২ পা, ২০২ পা
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ৯,১৩,১৬,২১, ২৫-২৭,৩০,৩২,৩৭,৩৮,৪১ পা, ৪৫,৪৭,৮১,৮৩,৮৪ পা, ৮৮,৯৮ পা, ৯৯ পা, ১৪৯,১৫৫,২১০,২১৮ ২৫৭,৩০০,৩০১,৩০৫-৩০৭, ৩২১ পা,
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৬,৭১,৮৩
তত্ত্ববোধিনী সভা ৯,১০,১২,১৩,১৫, ১৮,২২,৩১,৩৭,৪৬,৪৭,৭৭,৮৩, ১৪৯,১৫৫,২১৯
তত্ত্বরঞ্জিনী সভা ১২,২৩০,২৩৭
তদ্ভব শব্দ ১৮৮
তৎসম শব্দ ১২৪,১৮৮,৩০০,৩০৪
তারাচাঁদ দত্ত ৮৩
তারিণীচরণ মিত্র ৮২-৮৪,৩০৬
তুলসীদাস ১১২,১১৫
ত্রি-ঈশ্বরবাদ ১৯

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩, ১৬
'দত্তা' ৮৯
দল ১৫৭,১৬৭
দয়াময়ী ১
'দানিয়েল চরিত্র' ২১২,২৩৮ পা
দিগ্‌দর্শন' ৭০,৮৩
দীনবন্ধু মিত্র ৭
দীনেশচন্দ্র সেন ২৯৯,৩০৩-৩০৪
দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ১
দেবানন্দ ৩,১১
দেবীপদ ভট্টাচার্য ২৩৮ পা
'দেশ' ৮১ পা
দেশহিতার্থী সভা ২১৮

'ধর্ম্মনীতি' ৩২, ৪৫, ৫১-৫৩, ৬৮পা, ৯২, ৮৩, ৯৫
'ধর্মসভা' ৫, ২৮
'ধর্ম্মোন্নতি সংশোধন-বিষয়ক প্রস্তাব' ১৬, ৪৫, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৫৬ পা, ৮৩, ৯০, ১৩৯, ১৪৮
ধ্বনি ১৪৮, ২৭৪

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, ১৪, ৩৫ পা, ৪০ পা, ৩২১ পা,
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩০,
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৭, ৩৯ পা ৪২ পা
নবকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩
'নববিধান' ৩৩
নবেন্দু সেন ৩২৫ পা,
নবীন চন্দ্র সেন ২১৫, ২৭৫, ২১৮, ২৩৫
'নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি' ২৩৮
নর্মাল স্কুল ৩৭, ৩৮, ৪৬
নরনারায়ণ দত্ত ৭, ৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬১
নিউটন ৮০, ১৮৮
নিত্যানন্দ গোস্বামী ৮০ পা
'নীতিকথা' ৮০, ১৮৮

'নীতিগর্ভ ইতিহাস' ১০১
'নীতিতরঙ্গিণী' ৮৩
'নীতি দর্শন' ৮২
'নীতিমালা' ৮৩
'নীতিরঞ্জিনী সভা' ৮
নীলরতন সেন ৮৩

'পঞ্চতন্ত্র' ৪৯
'পত্রাবলী' ১৯২; ২০৩, ২১০ পা, ২১১ পা, ২৫৭-২৬২, ২৮৯, ২৯২ ৩২২ পা
পদ (পদগুচ্ছ) ১৬৪
'পদার্থবিদ্যা' ৩২, ৪৫, ৫১-৫৪, ৩৬ পা, ৭২, ৭৮, ৮৯, ৯৯ পা, ১৬৫ পা, ১৬৮, ৩০০,
'পদার্থবিদ্যার সার' ৫১, ৬৫পা,
'পরলোক ও মুক্তি' ১৯২
'পল মুরের জীবনী' ১০১
'পশ্বাবলী' ৭০
'পাল কাপ্য' ৬৮
পিটার বৃটন ১৬৮, ১৭১, ১৭২
পিয়ার্স ৬৯
পিয়ার্সন ৫৯, ১৪১, ১৬৭-১৭১, ১৭৩, ১৮২
পীতাম্বর দত্ত ৬, ১
পুলিনবিহারী সেন ২৯৭ পা
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ২০৩
'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১০০, ২১২, ২৩৮
'প্রতিনিধি সভা' ৩২
'প্রতিভা' ৪০ পা
'প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা' ৩২, ১৪
'প্রবাসী' ৬৫ পা, ৬৬ পা, ১৯০ পা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৪, ২০১ পাতা
প্রসন্নকুমার ঘোষ ৪১ পা
'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' ৩২২ পা
'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' ৫৪, ৬৫ পা, ১৯৮ পা
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ২০৩
প্লুটার্ক ২১৯, ২২০
প্লেটো ২১৩

ফস্টার ১৫৩
ফার্গুসন ৭০, ১৫৮
ফেলিক্স কেরী ৬৫ পা, ৭০, ১০১, ১৬৭, ১৭২, ১৮৩
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১০২
ফ্রেস (Pharse) ২৪০
ফ্রয়েয়ার ১৫৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭, ৩৮, ১৮৫, ১৮৬, ২৩২, ২৯৭, ৩০২, ৩০৭, ৩১২
'বঙ্গদর্শন' ৪৩
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১১৮ পা
'বরাহ মিহির' ১২৯
'বাংলা চরিতসাহিত্য' ২৫৮

'বাংলা ভাষানুশীলন' ৭
'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা' ৮১
'বাংলার ইতিহাস' ১০১
'বাংলার জনশিক্ষা' ৪১ পা
'বাংলার প্রাচীন গৌরব' ৮০
'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', ৩২১
বাঁশবেড়িয়া
বাক্য (গঠন, দৈর্ঘ্য, আকৃতি, বিন্যাস, সংযোজক) ১২০, ১৩৮-১৫২, ২৪১-২৭৬, ২৬৩, ২৮০, ৩০৯, ৩১০
'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ৪৮
বাণেশ্বর (বিদ্যালঙ্কার) ৪৬ পা, ৫০
'বাণিজ্যবিস্তার' ১০০
'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' ১৫, ৩২, ৪৫, ৪৯, ৪০, ৫৪, ৬৬ পা, ১০০, ১০২, ১১৮ পা, ১৩৯, ১৬৬ পা
'বাহ্যবস্তু' ৯, ১৬, ৩৩, ৩৬, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৪, ৬৫ পা, ৬৬ পা, ১০৭, ১০২, ১১৮ পা, ১৬৫
বায়রণ ২০৩
বিক্রমাদিত্য ২১৩
'বিদ্যাদর্শন' ৪১ পা ৪৬, ৪৭, ৬৫ পা, ৭৭
'বিদ্যাসাগর' ২১, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৪৮, ৭৩, ৭৪, ৮৮, ৮৯, ১০১, ১৪১, ১৫৫, ২৯৩, ২৯৭, ৩০১, ৩০২, ৩০৫, ৩০৭, ৩১২, ৩১৩, ৩২১ পা
'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ' ৬৫ পা
'বিদ্যাসুন্দর' ১১৮ পা
'বিদ্যাহারাবলী' ৭০, ১৩৭-৩৯, ১৬৮-৭০, ১৯০ পা
'বিধবা-বিবাহ' ১৪
বিনয় ঘোষ ৪০ পা, ৬৫ পা, ৬৬ পা, ৮১ পা
বিবেকানন্দ ৩৮
বিজনবিহারী মজুমদার ২৩৮
'বিশ্বপরিবার' ১৩৮, ১৯০ পা
'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ৩০৫, ৩২১ পা,
বুদ্ধদেব (বসু) ১১৪, ১৮৩, ১৯০ পা
বুটন ১৮২
বৃন্দাবন দাস ২১২
বেকন ১৬০
'বেতালপঞ্চবিংশতি' ৪৫, ১৪১, ৩০৫, ৩০৬
'বেদ' ৩১, ৬৮
'বেদান্তগ্রন্থ' ১৬৬ পা
বেন্টিঙ্ক (লর্ড) ৫, ১৭, ১৮, ১০১, ১১৭
বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ৮
'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' ৭০
'ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত' ২২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯পা, ৬৪পা, ৬৬পা, ১৬৫পা
'ব্রহ্মসভা' ২২
'ব্রাহ্মণ সেবধি' ৪২পা, ৮৬, ৯৮
'ব্রাহ্মধর্ম' ১৬, ২২, ২৩, ২৯, ৩৪, ৩৭, ৮৮, ২০২পা, ২৫৬, ২৬৩, ৩১৬

'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' ১৬, ২২, ১৯২, ১৯৫, ৩০১
ব্রাহ্মধর্ম সভা ২২,
ব্রাহ্মধর্ম সমাজ ৫, ১২, ১৭, ১৮, ২২, ২৪, ২৮, ৩৩, ৫০
'ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট' ১৯২,
'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' ১৯২
'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ১৯২, ২০২পা, ২৫৮-২৬০, ১৬৩, ২৬৬, ২৬৮-৬৯, ২৭৩, ২৯১, ২৯৭ (পা) ২৯৮পা ; ৩০৫, ৩১৬, ৩২২পা
'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' ১৯৯
'ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' ৬৫পা, ১৬৮

'ভক্তমাল' ৫৩, ১১১
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, ২০, ৯১
ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১৯২
'ভা. উ. স.' ৪৫, ৫০-৫৪, ৬৬পা, ৭২, ১০০, ১০৫-১০৯, ১১৯পা, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪১, ১৫১, ১৬০, ১৬৫পা, ২১৮পা, ৩০০
ভারতচন্দ্র রায় ১০৪
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১০১
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (সভা) ৫৫, ২১৮
'ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ১৬৫পা
'ভাষার ইতিবৃত্ত' ১৫৪পা
'ভূগোল' ১৬, ৪৫-৪৭, ৫৪, ৬৬পা, ৭২, ৭৭, ৮১পা, ১৪১, ১৬৮, ৩০৭, ৩২১পা
'ভূগোল এবং জ্যোতিষবিষয়ক কথোপকথন' ৫, ৬৫পা, ৬৯পা, ৭২
'ভূগোল বৃত্তান্ত' ৬৫, ৬৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২১
'ভিসন অফ মির্জা' ৫৫

মর্টন, টি, ক্রস্ ২৩৮পা
মথুরানাথ ৫২
মনোমোহন ৭
'মনোরঞ্জন ইতিহাস' ৮৩, ৯৮
মম—২০৩
'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ৩২২পা,
'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ১০০, ২১২
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৩৯,
মহেশচন্দ্র ঘোষ ৮৬
মাইকেল (মধুসূদন দত্ত) ২০
মাধবচন্দ্র মল্লিক ৪, ৮৭
মার্শম্যান ৬৯
'মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ' ১৯২
মুর ১৮৮, ২০৩
ম্যাক্ ৭০, ১৮২, ১৮৩
ম্যাক্স্ মূলার ১৯৩
ম্যাথু আরনল্ড্ ৮৯
'মৃচ্ছকটিক' ১১৪
মৃত্যুঞ্জয় ১০০, ১৪০

মেডিক্যাল কলেজ ১৯

যুক্ত ব্যঞ্জন ১৬৪, ২৭৪
যুগ্ম ব্যঞ্জন ১৬৪, ২৮৪
যুধিষ্ঠির ২১৩
'যোগাযোগ' ১৬৫পা
যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৯
যোগেশচন্দ্র রায় ১৮৩, ১৯১পা
যোগেশচন্দ্র বাগল ৪১পা

'রক্তকরবী' ২১০পা
রঘুবংশ ২৯৭পা
রজনীকান্ত গুপ্ত ৪০পা
রজনীনাথ দত্ত ৬৫
রবার্ট ফ্রস্ট ২০০
রবার্ট মে ৬৯
রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুর) ৩৮, ৪৯, ৬৫পা, ৮৯, ১৬৫পা, ১৮২-১৮৬, ১৮৮-১৯০, ১০৪-১০, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২৩২, ২৩৯, ২৪০, ২৯৭ ৩০৩, ৩১৪-৩১৯, ৩২২পা,
রমানাথ ৪৩পা
রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩০
রমেশচন্দ্র দত্ত ৮, ১৪, ৩০১
রসিক মল্লিক ৩, ৮৩
রিলিজিয়াস্ সেক্টস্ ৫২
রঁলা ২০৩
রাঘবানন্দ ১১৩
রাজকুমার চক্রবর্তী ৪০পা
রাজকিশোর ৮৩
রাজনারায়ণ বসু ২, ৯, ১৪-২৬, ৩০, ৩২, ৩৫পা, ৯১পা, ১৬৮, ২০৩, ২১৫, ২১৬, ১১৮ ৩১৭
রাজবল্লভ দত্ত ১
রাজসিংহ ১৫১পা
রাজশেখর বসু ১৮৬, ১৮৭
রাজা কালিকৃষ্ণ ৮২
'রাজাবলি ১০০
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ৩৯পা
রাজেন্দ্রনাথ সরকার ২১, ২২, ২৭
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১০০, ২১২
রাধাকান্ত দেব ২০, ২৮, ৮৩
রাধাপ্রসাদ রায় ২২
রামকমল সেন ৪, ১০
রামকৃষ্ণ (দেব) ৩৮
রামগতি ন্যায়রত্ন ৪৯
রামগোপাল ঘোষ ১৫, ২৮
রামচন্দ্র দাস ২৩৮ পা
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১২, ২৩, ৮২
রামচন্দ্র মিত্র ১০
রামতনু লাহিড়ী ৩, ১৫
রামধন বসু ৬, ৭
রামমোহন ঘোষ ৭
রামমোহন রায় ১, ২, ৪, ৫, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২১-২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৮৪, ৮৮, ১১৪, ১৩৪, ১৫, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৬ পা, ১৮২,

১৯৪, ১৯৬, ২০১, ২৯৮ পা, ২৯৯, ৩০১
রামরাম বসু ১০০,১৪০,২১২,২৩৮ পা, ২৯৭
রামানন্দ ১১৩
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৮১ পা, ১৭৩, ৩০২,৩০৪,৩১৩,৩১৪,৩২২ পা,
'রাস-র ইতিবৃত্ত' ২১৫
রাসসুন্দরী ২১৫
র‍্যালে ১৫২
রুদ্রদল ১৪৮
রূপক ২৮৮,২৯২-২৯৫
রোজেনবর্গ ২০৩

'ললিত ও মানস' ৭
লুকাস ১৬৩
লেওনার্ড ২৬

শব্দ (গঠন,-সজ্জা,-গুচ্ছ,-সাযুজ্য, সামীপ্য, তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী) ১৫৪,২৪১-২৫৬,২৬০,৩০২,৩০৭-৮, ৩১৩-৩১৮
'শব্দকথা' ১৮৪
'শব্দচয়ন' ১৮৩,১৯০ পা, ১৯১ পা
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৮,৬৫ পা, ৮৯, ১৮২,৩০৩
শরৎ বোস ৮২
শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধাবলী) ৩১৬ ৩১৭,৩২২ পা
শিবচন্দ্র লাহিড়ী ২৯৭ পা
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৯ পা
শিশিরকুমার দাস ৮১ পা, ৩০৫
শীতল সিংহ ৫২
শূদ্রক ১৪৪
শ্যামমণি ৭
শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ১৭

'সংবাদ চন্দ্রিকা' ৫
'সংবাদ প্রভাকর' ৭,৮,৯
'সংস্কৃত ব্যাকরণ' ১০
'সংস্কৃত সাহিত্যের কথা' ৮০
স্কুলবুক সোসাইটি ৬৯,৭০,৮২,৮৩, ১০২,১৬৭,১৬৮,১৮৯
স্টুয়ার্ট ৮২
সজনীকান্ত দাস ১৬৮
সতীদাহ প্রথা রোধ ২২
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ২০১ পা, ২৩৯ পা
'সত্য ইতিহাস' ১০১
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১,৩৯,১৯২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬,১৫,৩৯,৪০ পা, ৪৯, ৭৩, ৮১ পা
'সদ্বীর্ক গুণ' ১০১
'সদ্ভাব-শতক' ৪৮
'স্বর্ণলতা' ৮৯
'স্বপ্নদর্শন' ৫২, ৫৫,৬৬ পা, ৬৭ পা, ৮৯
স্বর (-সঙ্গতি, অনুপ্রাস) ২৭৪

'সমকালীন' ৩২২ পা
সমাস ৮৯
সমীরকান্ত গুপ্ত ১৩০,১৩৮,১৬৪,১৮৩,
১৯১ পা
'সরল রসায়ন......১৯০ পা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩৩
'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'
৪০ পা, ৮৯ পা
'সাম্বৎসরিক বক্তৃতা' ২৬২,২৮৯
'সারসংগ্রহ' ৭০
'সাহিত্য' ৬৬ পা, ১০৮
'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ৩৬ পা
সীতার বনবাস ৪৮
সুকুমার সেন ৬৫পা, ১৬৪ পা ১৬৬ পা,
২৯৭ পা, ৩০৫,৩০৭,৩২১ পা,
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১৮ পা,
২১৭,২১৫,২৪৮ পা
সুবোধচন্দ্র রায় ২৩৯ পা
'সুরধুনী কাব্য'
'সেকাল আর একাল' ৩৯ পা, ৯৯ পা
'স্পেক্টেটর' ৫৫
সৌদামিনী দেবী ২০৩

হরপ্রসাদ রচনাবলী ১১৯ পা
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮০ পা
হরমোহন দত্ত ৫-৭,২০,২৯
হরিনন্দ ১৯৩
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৩৮ পা
হরিহর মুখোপাধ্যায় ৬
২২
হরিহর শেঠ ৩২২ পা,
হাইড্ ইস্ট ২
হাজারিলাল ২৪,২৫
হাড্‌সন্ ২৯৫
হাফিজ্ ২১৯,২২০
হিতকথা ৮৩
হিতোপদেশ ৮২,৮৩
হিতৈষী ৬৫ পা
হিন্দুকলেজ ৩,২,১৬-১৯ পা, ৭০
হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ২১

A Biographical Sketch of
David Hare 65 (F), 67 (F)
Abraham Cawley 238 (F)
Addison 56, 567, 58-59—63
Adjective 128, 250
A History of the
Brahmo Samaj 26
Alexander, Duff 25, 85
Alliteration 274
An Autobiography of Maharsi
D. N. Tagore 202 (F)
An easy introduction to the
Astronomy 70
An introduction to the study
of literature 118 (F),
210 (F), 238 (F)
Appeal to Chris ian public 19
Aristotle 153, 297 (F)

A short guide to English prose style 202 (F)
Asiatic papers 114, 105
Asiatic Society 119 (F)
Athenium 4, 87
A treasury of the world's great letters 210 (F)
A vocabulary...etc. 168
Aspects of Biography 238 (F)

Baron, P, Heinrich, 239 (F)
Bengal Harkara 65 (F)
Bengali prose style 299, 321 (F)
Bengal's Response to Christianity 98 (F)
Bible 101
Biography of a new faith 42 (F)
Boden Sanskrit chair 119 (F)
Brahminical Magazine 19
Brahmo Samaj 30
British museum 65 (F)
Brooks and Wrenn 166 (F)

Carpenter's Sermon 117
Chatterjee, S. K., 164 (F)
Children's Britannica 118 (F)
Clause 140
Cleanth, Brooks 156
Closed Syllables 148
Collet, Sophia 98 (F), 248
Colligation 125
Collocation 125-29, 248
Composition 161
Connexion 150
Council of educational Report 18
Copula 282 (F)
Cousion 32
Craft of technical writing 166 (F)
Crepar Xastrer ortho, Bhed 32 (F)
Crescendo 143, 147, 150
Cultural Heritage of Bengal 40 (F)

Daniel, M., 166 (F)
Das, S. K., 98 (F). 165, 198 (F)
David, Hare 65 (F)
David, Thomas 99 (F)
Derozio 4140 (F)
Duff, A., 86
Dutt, R. C., 40 (F) 49, 198 (F), 231 (F)
Donne's Sermon 202 (F)
Dietung and Warheit 238 (F)
David Hume 239 (F)

Early Bengali Prose, 298 (F), 299
Earnest, weekly and Scott, Anne 117 (F)
England in the 19th Century 99 (F)
Englishmen 8, 29
English Prose Style
Enquiry concerning human understanding 239 (F)
Essay on the constitution of man 73, 76, 92, 98
Evolution of thought 150

Fichte 32
Figure of speech 164
Fitz-Gerald 184
Form 153, 154
Form of language 149
Fox's Sermon 117
Francis, Newman 32
Francis, Bacon 203

George Combe 48
Great Sermons of the world 202 (F)
Goethe 238 (F)

Herodotus 118 (F)
H. H , Wilson 46, 65 (F), 66 (F), 118 (F), 168
History of ancient India 85 (F)
History of England 118 (F)
History of India 101
Hodson, 96, 97, 99 (F), 118 (F)
Hudson, W. H., 202 (F), 238 (F), 240 (F)

Image 284-288, 297 (F), 298 (F)
India and Indian mission 26, 85
Inquirer 86

J. D. Pearson 168
Jesus Christ : Europe and India 32
J. Gilchrist 154
Johonson (Dr.) 204
Johonson, Samuel 98 (F)
J., Long 40

Kent 32
Key sentence 160, 162

Lawson's history 189 (F)
Legonis Emili 98 (F)
Lewis, C., Day 298 (F), 293

Life and letter of Raja Rammohun Roy 98
Literature of Bengal, 298 (F), 321 (F)
London Missionary Society 85
Lucas, F. L., 165 (F), 166 (F), 279-283 (F), 296, 298 (F)

Macarthey, Edward, C, 202 (F)
Map of the world 189 (F)
May's Arithmetic 189 (F)
Max Muller 188, 201 (F)
Middleton, Murry 210 (F)
Mittra, R. C., 189 (F)
M. K.. Gandhi 240 (F)
M., Lincolon, Schuster 210 (F)
Modern Rhetoric 165
Moral Tales of History 82,101
Morton, A. Q., (F) 321
Mouris, Andrey 288 (F)

Narration 160, 167
Noun 127, 249
Nehru, J. L. 238 (F)

O. D. B. L, 164 (F)
Oratory 155

Paper Committee 14
Paragraph 153, 158, 160, 276, 281,-83
P. C. Roy 80 (F)
Pearce, 189 (F)
Periodic Sentence 188
Phelps, W, Lyon 240 (F)
Phrase 140, 256
Poetry and Truth 238 (F)
Positive science of the ancient Hindu 80
Prabhakar 8
Prose music 153

Rabindranath Tagore, life and work 239 (F)
Raleigh, W., 271
Rammohun to Ramkrishna 210 (F)
Rassalas 82, 98 (F)
Read, Herbert 156, 163, 65 (F) 166, (F) 265, 269, 276, 282, 283 (F) 293, 296, 297 (F), 298 (F)
Religious sects 105, 111, 112
Religious thought and life in India 119 (F)
Rhetoric 155, 156, 161-63, 297 (F)
Rhythm 153

Rost., R., 119 (F)
Rugby 88

Samuel 97
Sampson, Ashlay 202 (F)
Sayce, R. A., 297 (F), 298 (F)
School Book Society 189 (F)
Selected reading in Rhetoric of public speaking 298 (F)
Self-help 97
Sen, D. C. 321 (F)
Sen, P. K., 42 (F)
Sen, T. N., 81 (F)
Septimus (Rev.) 95
Sermon on the present state 202 (F)
Sharp, H., 80
Sital Sinha 110
Society for translating European Sc. 168
Sophia, Dobson, Collet 98 (F)
Sound 163
Stanza 153
Style 298 (F)
Style in the French novel 298 (F)
Syllable 147, 149, 164, 165 (F)

Tagore, S. N. 43 (F), 202 (F),
The constitution of man 48, 9
The craft of technical writing 283 (F)
The English work of Raja Rammohun Roy 81
The Discovery of India 34 (F), 236 (F)
The Hindu religious sects 46
The poetic image 297 (F), 298 (F)
The problem of style 210 (F)
The lit. of Bengal 41 (F)
The London Pharmacopeia 168
The sketch of the religious sects 106
The story of a man 238 (F)
The vision of Mirzah 59, 60-63.
Thomas Arnold 150
Thomas De Quiency 150
Thompson Edward 238 (F)
Thomsor Lester 298 (F)
Topic sentence 160-162
Tuve, Posemond 297 (F)

Ulmann, Stephen 298 (F)
Unitarianism 25
Upanishadas 31
Underhill, Evelin 239 (F)

Vedantic Doctrines
vindicated 26
Vedic doctrines 85
Verb 128, 250, 271
Victor 32

Warner, Allan 283 (F)
Western influence 81
William, Geddie 117 (F)
William, W. E., 239 (F)
Wilson, H. H., 106, 109-113, 114, 161
Wimsatt, 283 (F)
Wordsworth 232 (F)

Yeats 189 (F)

গ্রন্থপঞ্জী

ক. অক্ষয়কুমার দত্ত

চারুপাঠ ১ম ভাগ	কলিকাতা	১৮৫৩
২য় ভাগ	"	১৮৫৪
৩য় ভাগ	"	১৮৫৯
ধর্ম্মনীতি	"	১৮৫৫
ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনবিষয়ক প্রস্তাব	"	১৮৫৬
পদার্থবিদ্যা	"	১৮৫৬
প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার	"	১৯০৯
বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার ১ ভাগ	"	১৮৫১
২ ভাগ	"	১৮৫৩
বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ	"	১৮৫৫
ভূগোল	"	১৮৪১
শ্রীযুক্ত ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে সাংবাৎসরিক বক্তৃতা	"	১৮৪৫

খ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুষ্ঠান পদ্ধতি	কলিকাতা	১৮৬৫
আত্মজীবনী	"	১৮৯৮
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	"	১৮৫২
উপহার	"	১৮৮৭
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	"	১৮৬২
জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি	"	১৮৯৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ	"	১৮৫০
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবাহপ্রণালী	"	১৮৬৪
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	"	১৮৬০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত		১৮৬৪

পত্রাবলী (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত)	কলিকাতা	১৮৬৫
পরলোক ও মুক্তি	”	১৮৯৫
পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	”	১৮৬১
ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	”	১৮৬৫-'৬৬
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	”	১৮৬৫

গ. জীবনী, সমালোচনা—সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি

অজিতকুমার চক্রবর্তী	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	কলিকাতা	১৯১৬
	ব্রহ্ম-বিদ্যালয়	”	১৯১১
অধীরকুমার দে	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা	”	১৯৬১
অনাথনাথ বসু	আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা	”	১৯৪৫
অন্নদাশঙ্কর রায়	জাপানে	”	১৯৬২
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রানী চন্দ কর্তৃক অনুলিখিত)	ঘরোয়া	”	১৯৪১
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য	”	১৯৫৬
ঈশানচন্দ্র বসু	ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি	”	১৮৯৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ)	”	
কেদারনাথ মজুমদার	বাংলা সাময়িক সাহিত্য	ময়মনসিংহ	১৯১৭
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (দ্রঃ দেশঃ সাহিত্য-সংখ্যা)	কলিকাতা	১৯৬৪
জনৈক খৃষ্টাশ্রিত	ডফ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী	”	১৮৯০
জহরলাল বসু	বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস	”	১৯৩৬
জীবনানন্দ দাস	বনলতা সেন	”	
দীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গসাহিত্য পরিচয় : ২ খণ্ড	”	১৯১৪
দীনবন্ধু মিত্র	সুরধুনী কাব্য : ১০ সর্গ	”	১৮৭৬

দেবীপদ ভট্টাচার্য	বাংলা চরিতসাহিত্য	কলিকাতা ১৯৬৪
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	কলিকাতা ও ময়মনসিংহ ১৯১৮
ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ	কলিকাতা ১৯১০
নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	অক্ষয়চরিত	„ ১৮৮৭
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (৫ সংস্করণ)	„ ১৯২৮
নগেন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বকোষ (২ সংস্করণ)	„ ১৯৩৫
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী	সংস্কৃত সাহিত্যের কথা	„ ১৯৪৫
বিনয় ঘোষ	বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (৩ খণ্ড)	„ ১৯৫৯
	সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২ খণ্ড)	„ ১৯৬৩
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	বঙ্গসাহিত্যের বিজ্ঞান	„ ১৯৬০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্যসাধক-চরিতমালা (১, ৩ খণ্ড)	„ ১৯৪৬
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত)	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী	„ ১৯০৫
ভবসিন্ধু দত্ত	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত	„ ১৯১৪
ভারতকোষ	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ	„ ১৯৬৪
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২ পর্যায়, ৩ সংস্করণ)	„ ১৯৬৪
মহেন্দ্র বিদ্যানিধি	শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত	„ ১৮৮৬
যোগেশচন্দ্র বাগল	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সা. স. চ.)	„ ১৯৫৬
যোগেশচন্দ্র রায়	সরল রসায়ন	„ ১৮৯৮
রজনীকান্ত গুপ্ত	প্রতিভা	„ ১৮৯৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি	„ ১৯০৩
	চারিত্রপূজা	„ ১৯০৭
	জীবনস্মৃতি	„ ১৯১২